# নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের জীবনী

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

# নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের জীবনী

## শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের জীবনী

**প্রথম সংস্করণ। 31 আগস্ট, 2023।**



ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

# সুচিপত্র

# স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

# কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে।

# ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটিতে ইসলামের চার সঠিক পথনির্দেশিত খলিফা ব্যতীত নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাহাবীদের জীবনী থেকে কিছু পাঠ আলোচনা করা হয়েছে: আবু বক্কর সিদ্দিক, উমর ইবনে খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান এবং আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন, যাদের জীবনী পৃথক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

*"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"*

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

# নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের জীবনী

## আমর বিন আবাসা সুলামী (রাঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, আমর বিন আবাসা, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, কখনো মূর্তি পূজা করেননি কারণ তিনি এর ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন। তারপর তিনি শুনতে পেলেন যে একজন ব্যক্তি মক্কায় নিজেকে নবী বলে দাবি করছে যার অর্থ হল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। মক্কাবাসীরা তার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করায় তিনি গোপনে তার সাথে দেখা করার জন্য মক্কায় যান। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাতের পর এবং ইসলামের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করার পর, যার মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল, মহান আমর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। , ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসতে বলা হয়েছিল, যখন তিনি শুনেছিলেন যে সবকিছু তার পক্ষে পরিণত হয়েছে। কয়েক বছর পর, আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুনতে পেলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করেছেন এবং তাই তিনিও সেখানে হিজরত করেছেন। এটি সহীহ মুসলিমের 1930 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

আমর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন এবং নিষ্প্রাণ মূর্তির উপাসনায় তাঁর চারপাশের লোকদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি।

একজনের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ একটি প্রধান কারণ কেন লোকেরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, যেমন বিচার দিবস। একজন ব্যক্তির উচিত তাদের সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো এবং প্রমাণ এবং স্পষ্ট লক্ষণের উপর ভিত্তি করে জীবনযাপনের পথ বেছে নেওয়া এবং গবাদি পশুর মতো অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা উচিত নয়। এই পদ্ধতিতে আচরণ বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের উচিত নয় অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অনুসরণ করবে। এই দিনে এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলমান অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অমুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে শুধুমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পালন করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণে অমুসলিমরাও তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চা অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে তত কম

তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে।

ইসলামে অন্ধ অনুকরণও অপছন্দনীয়।

সুনানে ইবনে মাজায় পাওয়া একটি হাদিস, 4049 নম্বর, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন একজনের পরিবার, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ না করে যাতে কেউ অন্ধ অনুকরণকে ছাড়িয়ে যায় এবং মহান আল্লাহকে মান্য করে, যদিও সত্যই। তার প্রভুত্ব এবং তাদের নিজস্ব দাসত্ব স্বীকৃতি . এটি আসলে মানবজাতির উদ্দেশ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

*"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"*

কীভাবে একজন সত্যিকারের উপাসনা করতে পারে যাকে তারা চিনতে পারে না? শিশুদের জন্য অন্ধ অনুকরণ গ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে অনুধাবন করে ধার্মিক পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অজ্ঞতাই কারণ যে মুসলমানরা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা এখনও মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এই স্বীকৃতি একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় নয়, সারা দিন আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে আচরণ করতে সাহায্য

করে। এর মাধ্যমেই মুসলমানরা মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব পূর্ণ করবে। এবং এটি সেই অস্ত্র যা একজন মুসলিম তাদের জীবনের সমস্ত অসুবিধাকে জয় করে। যদি তাদের কাছে এটি না থাকে তবে তারা পুরস্কার অর্জন ছাড়াই অসুবিধার সম্মুখীন হবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল উভয় জগতেই আরও অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারে কিন্তু উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এটি প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে পথ দেখাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্ধ অনুকরণ একজনকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এই মুসলিম কেবল অসুবিধার সময় তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে বা বিপরীতে।

# আমর বিন আবাসা সুলামী (রাঃ) – ২

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, আমর বিন আবাসা, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, কখনো মূর্তি পূজা করেননি কারণ তিনি এর ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন। তারপর তিনি শুনতে পেলেন যে একজন ব্যক্তি মক্কায় নিজেকে নবী বলে দাবি করছে যার অর্থ হল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। মক্কাবাসীরা তার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করায় তিনি গোপনে তার সাথে দেখা করার জন্য মক্কায় যান। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাতের পর এবং ইসলামের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করার পর, যার মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল, মহান আমর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। , ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসতে বলা হয়েছিল, যখন তিনি শুনেছিলেন যে সবকিছু তার পক্ষে পরিণত হয়েছে । কয়েক বছর পর, আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুনতে পেলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করেছেন এবং তাই তিনিও সেখানে হিজরত করেছেন। এটি সহীহ মুসলিমের 1930 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

আরেকটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর একত্বের কথা উল্লেখ করার আগেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে বিশ্বাস কর্ম ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না, যেমন আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা।

কুফরী হতে পারে ইসলামকে আক্ষরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা কর্মের মাধ্যমে, যার মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করা জড়িত, যদিও কেউ তাকে বিশ্বাস করে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি একজন অসচেতন ব্যক্তিকে অন্য একটি সিংহের কাছ থেকে সতর্ক করা হয় এবং অসচেতন ব্যক্তি নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেয় তবে তারা এমন একজন বলে বিবেচিত হবে যিনি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করেছিলেন কারণ তারা সতর্কতার ভিত্তিতে তাদের আচরণকে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, যদি অসচেতন ব্যক্তি সতর্ক করার পরে কার্যত তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে, তবে লোকেরা সন্দেহ করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সতর্কীকরণে বিশ্বাস করে না এমনকি যদি অসচেতন ব্যক্তিটি তাদের প্রদত্ত সতর্কতায় মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করে।

কিছু লোক দাবি করে যে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য তাদের অন্তরে রয়েছে এবং তাই তাদের বাস্তবিকভাবে এটি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূর্খ মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের অধিকারী যদিও তারা ইসলামের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো অন্তর পবিত্র হয় তখন তার শরীর পবিত্র হয় যার অর্থ তার কর্ম সঠিক হয়। কিন্তু কারো হৃদয় কলুষিত হলে শরীর কলুষিত হয় যার অর্থ তাদের কাজ হবে কলুষিত ও ভুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে সে কখনো বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা বাস্তবিকভাবে তাদের প্রমাণ ও প্রমাণ যা বিচার দিবসে জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকাটা একজন ছাত্রের মতোই নির্বোধ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা

পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে তাদের জ্ঞান তাদের মনে আছে তাই তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এটি লিখতে হবে না। নিঃসন্দেহে এই ছাত্রটিও একইভাবে ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে বিচার দিবসে উপনীত হবে, তাঁর আদেশ- নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, যদিও তাদের বিশ্বাস থাকে। তাদের হৃদয়

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক যা সফলতা চাইলে পরিত্যাগ করা যায় না। উভয় জগতে। কারো ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন হল সারাদিন মসজিদে মহান আল্লাহর ইবাদত করে কাটানো নয় বরং তা হলো মহান আল্লাহর হক আদায় করা এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। ইসলামের পোশাক পরে কেউ ধার্মিকতার জাহির করতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারে না। যখন একজন মোড় নেয় ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহর ধার্মিক বান্দাগণ তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এমনকি যখন তাদের আত্মীয়রা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল তখনও তারা সদয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

*"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"*

সহীহ মুসলিম, 6525 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাকে সাহায্য করবেন যে তাদের

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করে এমনকি যদি তাদের আত্মীয়রা কিছু কঠিন করে দেয়। তাদের জন্য।

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, যেখানে ভালোকে মন্দের জবাব দেওয়াই একজন আন্তরিক বিশ্বাসীর লক্ষণ। প্রাক্তন আচরণ এমনকি প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই , যখন কেউ একটি প্রাণীর সাথে সদয় আচরণ করে তখন এটি আবার স্নেহ প্রদর্শন করবে। সহীহ বুখারী, 5991 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়স্বজন ছিন্ন করলেও সম্পর্ক বজায় রাখে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত ছিলেন তার আত্মীয়দের অধিকাংশ দ্বারা কিন্তু তিনি সবসময় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন.

এটা সাধারণভাবে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া কেউ সফলতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু সহীহ বুখারীর ৫৯৮৭ নম্বর হাদিসে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তিনি তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করবেন। মনে রাখবেন, এটি নির্বিশেষে সত্য ফরজ নামাজের মতো ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর হক আদায়ের জন্য কতটা সংগ্রাম করে। মহান আল্লাহ যদি একজন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে তারা কিভাবে তার নৈকট্য ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করবে?

উপরন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ শাস্তি বিলম্বিত করেন মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাপের অনুতাপ করা। কিন্তু পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন

করলে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আজ বিশ্বে সম্পর্ক ছিন্ন করা সাধারণত দেখা যায়। তুচ্ছ পার্থিব কারণে মানুষ সহজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। তারা যে কোন ক্ষতি চিনতে ব্যর্থ বস্তুজগতে যা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উভয় জগতেই তারা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার একটি কারণ যা সাধারণত ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যখন কেউ তাদের পেশার মাধ্যমে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছায়। এটি তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সাথে আর যোগাযোগ করার যোগ্য নয়। তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের ভালবাসা তাদের বিভ্রান্তির দরজায় ঠেলে দেয় যা তাদের বিশ্বাস করে যে তাদের আত্মীয়রা তাদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত করে যে এই বন্ধনগুলি কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 1:

*"...আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে এবং গর্ভকে চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদাই তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"*

এই আয়াতটিও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় না রেখে তাকওয়া অর্জন করা যায় না। তাই যারা ঈমান এনেছে অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে তারা তা অর্জন করতে পারে এবং উপবাস ভুল প্রমাণিত হয় এবং তাই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করার মাধ্যমে সব ধরনের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে শেখায় যেগুলো যখনই এবং যেখানেই সম্ভব ভালো। তাদের একটি গঠনমূলক মানসিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা সমাজের স্বার্থে আত্মীয়দের একত্রিত করে না একটি ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে বিভাজন ঘটায়। সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে পবিত্র কোরআনে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 22-23:

*"সুতরাং, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন..."*

এই দুনিয়াতে বা পরকালে কেউ কিভাবে তাদের বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে পারে যখন তারা মহান আল্লাহর অভিশাপে পরিবেষ্টিত এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত?

তাদের আত্মীয়স্বজনদের সমর্থনে তাদের সাধ্যের বাইরে যাওয়ার আদেশ দেয় না এবং তাদের আত্মীয়দের জন্য মহান আল্লাহর সীমাকে ত্যাগ করতে বলে না কারণ এর অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা। এটি সুনান আবু দাউদ, 2625 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কেউ কখনই তাদের আত্মীয়দের সাথে খারাপ কাজের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সৎকাজের আদেশ দিন এবং তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে মন্দ কাজ থেকে মৃদুভাবে নিষেধ করুন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

*" এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."*

অগণিত সুবিধা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী দ্বারা প্রাপ্ত হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি সম্পর্ক বজায় রাখে সে তাদের রিযিকে এবং তাদের জীবনে অতিরিক্ত অনুগ্রহে ধন্য হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1693 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল তাদের রিযিক যত কমই হোক না কেন তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এটি তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করবে। এবং শরীর। জীবনে অনুগ্রহ মানে তারা তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য

সময় পাবে। এ দুটি দোয়া মুসলমানরা তাদের সারা জীবন এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যয় করে কিন্তু অনেকে বুঝতে পারে না যে মহান আল্লাহ তাদের উভয়কেই স্থান দিয়েছেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায়

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তাদের অ - মুসলিম আত্মীয়দের সাথেও এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা। সহীহ মুসলিম, 2324 নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া একটি হাদিস পাওয়া যায়।

শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হ'ল সে আত্মীয়দের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্য রাখে যা ভেঙে পরিবারকে নিয়ে যায়। এবং সামাজিক বিভাগ। ইসলামকে জাতি হিসেবে দুর্বল করাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ক্ষোভ পোষণ করার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে যা কয়েক দশক ধরে চলে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে যায়। একজন ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে একজন আত্মীয়ের সাথে ভাল আচরণ করবে কিন্তু একটি ভুল এবং তর্কের জন্য সে পরবর্তীতে তাদের সাথে আর কথা বলবে না বলে শপথ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন সহীহ মুসলিম, 6526 নম্বরে পাওয়া যায় যে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। অ-আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ যদি এই হয় তাহলে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? এই প্রশ্ন সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে পার্থিব কারণে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আয়াত ও হাদিসগুলোর প্রতি আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, কয়েক দশকের পাপের পরও যদি মহান আল্লাহ তার দরজা বন্ধ না করেন বা মানুষের সাথে সার্ভারের সংযোগ বন্ধ না করেন, তাহলে মানুষ কেন এত সহজে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ছোট ছোট পার্থিব বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়? সমস্যা? এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে যদি কেউ মহান আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগ অটুট রাখতে চায়।

# খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আল আস (রা.)- ১

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খালিদ ইবনে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে তিনি বিশাল আগুনের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার পিতা তাকে আগুনে ঠেলে দিচ্ছিলেন যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আটকে রেখেছিলেন যাতে তিনি ভিতরে পড়ে যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন। তিনি তার স্বপ্ন আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, যিনি তাকে উৎসাহিত করেছিলেন। তাকে ইসলাম কবুল করা। এরপর তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং ইসলামের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার বাবা জানতে পেরে তাকে বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। মক্কার অমুসলিমদের প্রতি তাঁর এবং তাঁর সহকর্মী সাহাবীদের সহিংস আচরণের কারণে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তিনি মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরামর্শে ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 89-90- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল

এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

# দিমাদ (রহঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, দিমাদ , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একজন জাদুকরী ডাক্তার হিসাবে বিবেচিত হত যিনি কালো জাদু দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিরাময় করতে পারেন। তিনি যখন শুনলেন মক্কার অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো যাদু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ করছেন, তখন তিনি তাকে সুস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর সেবা প্রদান করলেন, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি; আর আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যে পথভ্রষ্ট হয় তাকে পথপ্রদর্শন করার কেউ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। তিনি এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল।" দিমাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতে বললেন এবং তিনবার তা করার পর, দিমাদ , আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, জবাব দিলেন যে এগুলি কোনও গীতিকার, যাদুকর বা কবির কথা নয়। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 2008 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

দিমাদ জটিল বা গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি যা তাকে বিস্মিত করেছিল এবং তাকে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে বোঝানোর জন্য কোন অলৌকিক ঘটনাও দেখানো হয়নি, তবুও তিনি সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে তার বিশ্বাস, আচরণ এবং জীবনধারা পরিবর্তন করেছিলেন। কারণ তিনি সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। যখন কেউ এই ঘোষণা করে আন্তরিকতা অবলম্বন করে যে তারা সত্যকে গ্রহণ করবে এবং তাদের সাধ্যমত তা

অনুসরণ করবে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, তখন এমনকি সরলতম সত্য, অন্যদের দ্বারা উপেক্ষিত সত্যগুলিও তাদের সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে আসে, চেরি-পিকিং মনোভাব নিয়ে এবং শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিকে গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে যা তাদের সন্তুষ্ট করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এমন বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে সে কখনই সঠিকভাবে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, যদিও সে মুসলিম হয়। এই আন্তরিকতার কারণেই ইতিহাসের অনেক মানুষ গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নয় বরং সহজতম জিনিসের মুখোমুখি হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই আন্তরিকতা মুসলমানদের অবশ্যই গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এটি ছাড়া ইসলামকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

# আবু বাসির (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, যাতে তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করা যায় তবে কিছু শর্ত স্থির করা হয়। যার একটি ছিল মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণকারী কেউ মদিনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গেলে তাদের মদিনায় ফেরত পাঠানো হবে না। এটা স্পষ্ট ছিল যে মক্কার অমুসলিমরা শুধুমাত্র এই দাবি করেছিল কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে এটি তাদের ঐক্য ভেঙে মুসলিম জাতিকে দুর্বল করবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় ফিরে আসেন। একজন সাহাবী, আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার বন্দীদশা থেকে রক্ষা পেয়ে মদিনায় পালিয়ে যান। মক্কার অমুসলিম নেতারা মদিনা থেকে আবু বাসির (রাঃ) কে উদ্ধার করার জন্য দু'জন লোককে পাঠিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিকে সম্মান জানিয়ে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর জন্য হস্তান্তর করেন। মক্কায় ফেরার পথে আবু বাসির, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, পালিয়ে যান এবং অবশেষে মদীনা ও মক্কা থেকে দূরে অন্য একটি নির্জন এলাকায় পালিয়ে যান। এর পর যখনই কোন সাহাবী,

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মক্কায় তাদের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যান তারা আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যোগ দেন। তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা মক্কার অমুসলিম নেতাদের বণিক কাফেলায় লুটপাট শুরু করে। এতে মক্কাবাসীদের জন্য মারাত্মক আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়। তারা অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি বার্তা পাঠান, আবু বাসির রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং তাঁর বাহিনীকে মদিনায় ডাকার জন্য অনুরোধ করেন যাতে অভিযান ও লুটপাট বন্ধ হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মত হলেন এবং আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর লোকেরা শান্তিপূর্ণভাবে মদিনায় হিজরত করলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 240-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজনের কখনই একটি মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

*“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."*

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে,

মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...*কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?*

# আবু তালহা (রাঃ)- ১

নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর, আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রিয় বাগানটি দান করেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

*"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।*

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মনোভাবের প্রশংসা করেছেন এবং তাকে তার আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 189-190- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যার অর্থ, তারা তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি ধারণ করবে, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এটি প্রত্যেকটি দোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানরা তাদের খুশির জিনিসগুলিতে তাদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে যা দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডে তাদের শারীরিক শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি , তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটি উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে, লোকেরা এমন জিনিসগুলিতে চেষ্টা করতে পেরে খুশি যা তারা কামনা করে যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন হয় না যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় করতে হবে এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হবে তবুও কতজন আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এইভাবে চেষ্টা করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে উচুঁ? কতজন স্বেচ্ছায় নামাজ পড়ার জন্য তাদের মূল্যবান ঘুম ছেড়ে দেয়?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উৎসর্গ করবে। কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত.

## খাব্বাব বিন আরাত (রাঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পর খাব্বাব (রা.) মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা নির্যাতিত ও নির্যাতনের শিকার হন। উদাহরণস্বরূপ, তারা একটি আগুন জ্বালাবে এবং তাকে তার উপর শুতে বাধ্য করবে। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি ইসলামের উপর অটল ছিলেন।

তিনি একবার মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য মহান আল্লাহর কাছে মিনতি করলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে উল্লেখ করেছেন যে কিভাবে অতীতের মুমিনদেরকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল তবুও তারা তাদের ঈমান ত্যাগ করেনি। তিনি তাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করবেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 303-304- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝার গুরুত্বের উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি অসুবিধা সহজে অনুসরণ করা হবে। এই বাস্তবতাটি পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, তালাকের অধ্যায় 65, আয়াত 7:

*"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ স্বস্তি] আনবেন।"*

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয়ে অনিশ্চিত হওয়া একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি বেআইনি জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন বেআইনি বিধান। কিন্তু যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে সহজে প্রতিস্থাপিত হবে, তিনি ধৈর্য সহকারে ইসলামের শিক্ষার উপর আস্থা রেখে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 146:

*"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"*

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এমন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহানবী নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে মহাকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিভাবে মহান আল্লাহ তাকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 76:

*"আর [উল্লেখ করুন] নূহ, যখন তিনি [আল্লাহর কাছে] ডাকেন [সেই সময়ের আগে], অতঃপর আমরা তাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারকে মহা বিপদ [অর্থাৎ বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"*

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 69:

*"আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, হে আগুন, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।*

মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) একটি বড় আগুনের আকারে একটি বড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এটিকে শীতল ও শান্তিময় করে দিয়েছিলেন।

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেকগুলি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে কঠিন সময়ের একটি মুহূর্ত অবশেষে তাদের জন্য সহজ হবে যারা আল্লাহর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ যে অগণিত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য, যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। মহান আল্লাহ যদি তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত বড় অসুবিধা থেকে রক্ষা করেন তবে তিনি ছোট ছোট অসুবিধার সম্মুখীন আজ্ঞাবহ মুসলমানদেরকেও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

# আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমনের পর হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম, যিনি একজন সম্মানিত ও জ্ঞানী ইহুদী পন্ডিত ছিলেন, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখার পর অবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার উপর, যেমন তিনি পূর্ববর্তী ঐশী প্রত্যাদেশে উল্লেখিত তার নিদর্শনগুলিকে চিনতে পেরেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 146:

*"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে] চেনে যেমন তাদের নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের একটি দল সত্যকে গোপন করে যখন তারা জানে।"*

তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অন্যান্য ইহুদি পন্ডিতরা তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন কিন্তু যদি তারা জানতে পারেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তবে তারা তার সম্পর্কে মিথ্যাচার করবেন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি পণ্ডিতদের ডেকেছিলেন এবং তাদের সত্য স্বীকার করতে বলেছিলেন যে তারা পুরোপুরি জানেন যে তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন তারা তাকে অস্বীকার করেছিল। আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানার পর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 194-195-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

# আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রহঃ) -২

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার কাঠের বান্ডিল নিয়ে বাজারের মধ্য দিয়ে যেতে দেখা গেছে। যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কেন তিনি তার একজন দাসকে কাঠ বহন করার নির্দেশ দেননি, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি নিজেকে নম্র করতে চেয়েছিলেন, কারণ একটি পরমাণুর গর্ব কাউকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 581- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

*“ আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।”*

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান

আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি । প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

# আদী বিন হাতেম (রহঃ)- ১

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নবম বছরে মদিনায় হিজরত করেন একজন সুপরিচিত খ্রিস্টান যিনি অবশেষে মুসলমান হয়েছিলেন, আদী বিন হাতেম, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, পবিত্র পবিত্র স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। নবী মুহাম্মদ সা. তার সাথে দেখা করার পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা প্রতিবন্ধী মহিলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে থামালেন। তিনি তার সাথে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধান করেন। এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় আদী বিন হাতেম, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, নিজেকে বলেছিলেন যে এটি কোনও জাগতিক রাজার আচরণ ছিল না। বাড়িতে পৌঁছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জোর দিয়ে বললেন যে আদি, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একটি বালিশে বসতে যখন তিনি নিজে মেঝেতে বসেছিলেন। আদি, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, আবার নিজেকে বলেছিলেন যে এটি একজন জাগতিক রাজার আচরণ ছিল না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 87-88-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান বিনয়কে নির্দেশ করে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 63:

*"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."*

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

*"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 63, দেখায় যে নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজনের চলার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

*"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."*

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

*“আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে । এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# আবু উমামা, আসাদ বিন জুরারাহ (রাঃ)- ১

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মিশনে অটল ছিলেন এবং তিনি যাকে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইসলামের বার্তা প্রচারের জন্য তিনি বহু গোত্র ও গোষ্ঠী পরিদর্শন করেছিলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে, তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি কিন্দা গোত্র, কালব গোত্র, হানিফা গোত্র এবং আরও অনেকের কাছে গিয়েছিলেন। উৎসবের সময় তিনি উপস্থিত সকলকে আমন্ত্রণ জানাতেন কিন্তু কেউই তাকে ইতিবাচক সাড়া দিতেন না। এটি চলতে থাকে যতক্ষণ না তিনি মদীনার লোকদের কাছে আসেন, যা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হিজরত করার আগে ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিল। তারা তার ইসলামের বার্তা গ্রহণ করে এবং তাকে তার মিশনে সহায়তা করেছিল। তারা ঐ সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া ঐশী ওহী শিখেছিল এবং তাদের লোকদের ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মদিনায় ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত মদিনার কোনো বাড়িই মুসলমানের খালি ছিল না। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 131-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মদিনা থেকে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তিদের একজন ছিলেন আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি তাঁর কথার মাধ্যমে তাঁর অটল প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, প্রতিটি আহ্বানের একটি পথ রয়েছে। কিছু পথ সহজ হলেও অন্যগুলো কঠিন। আজ আপনি আমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেছেন যা মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা উভয়ই নতুন এবং কঠিন। আপনি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করতে এবং আপনার বিশ্বাসে আপনাকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের আহ্বান করেছেন। এটি একটি সহজ কাজ নয়. যাইহোক, আমরা আপনার কল গ্রহণ করেছি. আপনি আমাদের নিকটাত্মীয় এবং দূরবর্তী উভয় আত্মীয়দের সাথে

(তাদের পরিবর্তে আপনাকে অনুসরণ করে) আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন। এটি একটি সহজ কাজ নয়. যাইহোক, আমরা আপনার কল গ্রহণ করেছি. আপনি আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন অথচ আমরা একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী যেখানে শক্তিশালী এবং পরাক্রমশালী (যেখানে আমাদের জান ও সম্পত্তি নিরাপদ) অবস্থান করছে। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে আমাদের নেতা এমন একজন হবেন যিনি আমাদের মধ্য থেকে নন, যাঁর মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যার পরিবার তাঁকে ত্যাগ করেছে। এটা সহজ কাজ নয় কিন্তু আমরা এটা মেনে নিয়েছি। যাদের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যারা এর ফলাফলের কল্যাণের আশা করছেন তাদের ব্যতীত সকলের জন্যই এই বিষয়গুলো কঠিন মনে হয়। আমরা আমাদের জিহ্বা, আমাদের হৃদয় এবং আমাদের হাত দিয়ে আপনার আহ্বান গ্রহণ করেছি কারণ আপনি আমাদের যা বলেছেন তা আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা গ্রহণ করেছি যা আমাদের হৃদয়ের গভীরে স্থির হয়েছে। আমরা এই সমস্ত কিছুতে আপনার কাছে আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আমরা আমাদের প্রভু এবং আপনার পালনকর্তার কাছেও অঙ্গীকারবদ্ধ। মহান আল্লাহর হাত আমাদের উপরে (এই অঙ্গীকার অনুমোদন করা)। আপনার রক্ষার জন্য আমরা আমাদের রক্ত ঝরাব এবং আপনার জন্য আমাদের জীবন দেব। আমরা আপনাকে রক্ষা করব যেমন আমরা নিজেদেরকে, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের স্ত্রীদের রক্ষা করি। আমরা যদি এই অঙ্গীকার পূরণ করি তবে তা হবে মহান আল্লাহর জন্য। আমরা যদি এই অঙ্গীকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহলে এটা হবে মহান আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, যার মূল্য আমাদের সবচেয়ে হতভাগা মানুষে পরিণত করা। হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমরা আপনাকে যা বলেছি তা সম্পূর্ণ সত্য এবং আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য ও সাহায্য কামনা করছি। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 125-126- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

*"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."*

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

*"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"*

# আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাঃ) - ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যা ইঙ্গিত দেয় যে তার রাজ্য শেষ পর্যন্ত একটি বিদেশী জাতি দ্বারা পরাস্ত হবে। যখন তিনি তদন্ত করলেন তখন তিনি সন্দেহ করলেন যে এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে। সে সময় তিনি ফিলিস্তিনে ছিলেন এবং তার লোকদেরকে তার কাছে এমন একজনকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন যিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত, যাকে তিনি প্রশ্ন করতে পারেন। এ সময় আবু সুফিয়ান বাণিজ্য অভিযানে ছিলেন। তাকে এবং তার লোকদের খুঁজে পাওয়া গেল এবং হেরাক্লিয়াসের কাছে আনা হল। হেরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে তার সামনে বসতে বললেন এবং আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদেরকে তার পিছনে বসিয়ে দিলেন এবং আবু সুফিয়ানকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার কোন মিথ্যা বললে তাদের আপত্তি করার নির্দেশ দিলেন। আবু সুফিয়ান, যিনি পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিলেন, বর্ণনা করেছেন যে এমনকি যদি সে মিথ্যা বলে তার লোকেরা তাকে অস্বীকার করত না কিন্তু তবুও সে সত্য বলেছিল কারণ সে মর্যাদা ও সম্মানের একজন মানুষ ছিল এবং সে মিথ্যা বলতে লজ্জিত ছিল। আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করার পর, হেরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন, "আপনি (আবু সুফিয়ান) বলেন তিনি (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার সবচেয়ে বিশুদ্ধ বংশের। মহান আল্লাহ পাক নবীগণকে বাছাই করেন, তাদের উপর এভাবেই; তিনি শুধুমাত্র তাদের লোকেদের মধ্যে শুদ্ধতম লাইন থেকে পুরুষদের নেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে তার (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিবারের অন্য কেউ কি অনুরূপ কথা বলছেন, যার অর্থ তিনি তাদের অনুকরণ করছেন, আপনি (আবু সুফিয়ান) বললেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তার কাছে কিছু সম্পত্তি আছে কি না আপনি হয়তো বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলাম যে সে হয়তো বলেছে যে সে আপনাকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কী করছে। কিন্তু তুমি বললে না। আমি আপনাকে তার অনুসারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি এবং আপনি বলেছেন যে তারা যুবক, শক্তিহীন এবং দরিদ্র। প্রত্যেক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারীরা এভাবেই আছে। আমি আপনাকে

জিজ্ঞাসা করেছি যে যারা তাকে অনুসরণ করে তারা তাকে পছন্দ করে এবং সম্মান করে নাকি তাকে ঘৃণা করে এবং ত্যাগ করে? আপনি উত্তর দিয়েছেন যে খুব কমই কেউ তাকে অনুসরণ করে এবং তাকে পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় ঈমানের মাধুর্য মানুষের অন্তরে প্রবেশ না করলে আবার চলে যায়। আমি (হেরাক্লিয়াস) তোমাদের দুজনের যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। আপনি (আবু সুফিয়ান) উত্তর দিয়েছিলেন যে এটি কখনও আপনার পক্ষে, কখনও তাঁর (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষে। এভাবেই মহানবী (সাঃ) এর জন্য যুদ্ধ হয়, তবুও তারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে সে তার কথার বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং আপনি বলেছিলেন যে তিনি তা করেননি। আপনি যা বলেছেন তা যদি সত্য হয় তবে তিনি আমার এই পায়ের নীচের জমি জয় করবেন।" ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 356-357-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা বিশ্বাসের নিশ্চিততায় পৌঁছায়। সকল মুসলমানের ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয়। যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমানের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস

হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

হুদাইবিয়ার চুক্তি । কিছু মুসলমান বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণরূপে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

*"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"*

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের

দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

# আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রা.)-২

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী মক্কায় পৌঁছানোর আগে বেশ কয়েকটি স্টপেজ করেছিল এই স্থানগুলির মধ্যে একটি ছিল মক্কার কাছাকাছি মার আল জাহরান। এখানে মক্কার কিছু জ্যেষ্ঠ সদস্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ভ্রমণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এই লোকদের একজন ছিলেন আবু সুফিয়ান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এই সফরের সময় আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছিলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে জামাতে নামাজে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আল আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম কি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সা. তার উপর, আদেশ? আল আব্বাস, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, ইতিবাচকভাবে উত্তর দেন এবং যোগ করেন যে তিনি যদি তাদের খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করার আদেশ দেন তবে তারা তার আনুগত্য করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে ওযু করতেন, তখন আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে উযূর অবশিষ্ট পানি থেকে বরকত লাভের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। এটি দেখে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেন যে, তিনি পারস্য বা রোমান রাজাদের প্রাসাদেও এর আগে এমন কিছু দেখেননি। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 394-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

*"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"*

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

*"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."*

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মাদ ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

# যায়েদ বিন সুআনা (রাঃ)-১

জায়েদ, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একজন ইহুদী রাব্বি ছিলেন যিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে উল্লিখিত পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

*“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."*

দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল তার পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ছিল না। প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল তার আত্মনিয়ন্ত্রণ তার রাগকে জয় করবে। এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি ছিল যে তার সহনশীলতা তাকে নির্দেশিত চরম মূর্খতার প্রদর্শনকে অতিক্রম করবে। তাই তিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন।

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঋণ দিয়েছিলেন এবং নির্ধারিত তারিখের আগে পরিশোধের দাবিতে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর কাছে আসেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অত্যন্ত রুক্ষ ও অভদ্র ছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হুমকি দিয়েছিলেন কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্ত থাকলেন এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তিনি যেন তাকে ঋণ পরিশোধ করার পরামর্শ দিতেন। আলতো করে জায়েদকে বললেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, সঠিক আচরণ করতে। মহানবী

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন উমরকে ঋণ পরিশোধ করতে এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হুমকির সম্মুখীন হওয়ার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত প্রদান করার নির্দেশ দেন। পূর্বে উল্লেখিত দুটি বৈশিষ্ট্য যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা গেল, তখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 166-167- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

*“আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"*

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."*

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

# উমায়ের বিন সা'দ (রাঃ)- ১

উমায়েরকে সিরিয়ায় হিমসের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন , খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও খলিফা তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর পাননি এবং তাই তাঁকে মদিনায় ফেরত ডেকে পাঠান। উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত পথ হেঁটেছিলেন এবং সফরের জন্য তাঁর সাথে কিছু খাবারের ব্যবস্থাসহ একটি ছাগল ও বাসনপত্র নিয়ে আসেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি হিমসের সরকারি কোষাগার থেকে তাঁর সাথে কী সম্পদ নিয়ে এসেছেন , তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি কিছুই আনেননি কারণ তিনি সর্বদা সমস্ত সম্পদ অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করবেন এবং তাই সরকারী কোষাগারে কিছুই রাখেননি। . উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর হিসেবে তাঁর নিয়োগ নবায়ন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্তে মদিনায় তাঁর বাড়িতে ফিরে আসেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সততা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং তাই তাঁকে স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি ব্যাগ পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে কি ঘটেছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কিছু খাবার এবং পোশাক প্রদান করলেন। উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরিবারের প্রয়োজনীয় পোশাকটি নিয়েছিলেন কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান এবং উমর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি চান উমায়েরের মতো অন্য একজন ব্যক্তি তাঁর কাছে থাকুক, যিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি তাকে মানুষের বিষয়গুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 169-172- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমাইর (রাঃ) তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একটি সহজ এবং কঠিন জীবনযাপন করেছিলেন কারণ তাঁর মনোযোগ আখেরাতের দিকে স্থির ছিল এবং এর জন্য প্রস্তুতি ছিল।

জন্য সঠিক উপলব্ধি বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয় তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন।

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

# উরওয়া বিন মাসউদ (রাঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পর, উরওয়া বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর গোত্র বনু সাকিফকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে সতর্ক করেছিলেন যে তারা তাকে হত্যা করবে, কারণ তিনি জানতেন তার গোত্র কতটা একগুঁয়ে এবং বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু সে উত্তর দিল যে তার গোত্র তাকে ভালবাসে এবং তার কোন ক্ষতি করবে না। তিনি দেশে ফিরে তার গোত্রকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তাকে তীর দিয়ে আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 203-204- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে দাবি করেন না। উদাহরণস্বরূপ, মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে যেখানে তারা তাদের পরিবার, বাড়িঘর, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রেখে এক বিচিত্র দেশে হিজরত করেছিল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলমানরা এখন যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ততটা কঠিন নয় যতটা ধার্মিক পূর্বসূরিরা সম্মুখীন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট কুরবানী করতে হবে, যেমন ফরজ ফজরের নামাজ পড়ার জন্য কিছু ঘুম কুরবানী এবং বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার জন্য কিছু সম্পদ। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বাড়িঘর ও পরিবার পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই

মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে একজনের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি ব্যবহার করে কার্যত দেখাতে হবে।

উপরন্তু, যখন একজন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উচিত ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল এবং কীভাবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল তা মনে রাখা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠিন সমস্যা সহ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী (সাঃ) তাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একজন মুসলমান যদি ধার্মিক পূর্বসূরিদের অটল মনোভাব অনুসরণ করে তবে আশা করা যায় যে তারা পরকালে তাদের সাথেই থাকবে।

# দিমাম বিন থা'লাবা (রহঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পর, দিমাম বিন থা'লাবা , আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তার গোত্রে ফিরে আসেন এবং প্রকাশ্যে তারা যে মূর্তিগুলি পূজা করত তার নিন্দা করেন। যখন তাকে তাদের সমালোচনা না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল কারণ তারা তাকে অসুস্থতার মতো কিছু দুর্ভাগ্য দিয়ে ফেলতে পারে, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে মূর্তিগুলি কারও ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না এবং যোগ করে যে মহান আল্লাহ পবিত্র নবী মুহাম্মদকে পাঠিয়েছেন, মানুষকে হেদায়েত করার জন্য পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। ফলে তার পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে এবং শক্তিহীন মূর্তিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 216-217- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর অসীম এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি যদি একজন ব্যক্তির উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাদের তা করতে চাননি। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রে কারো ক্ষতি করতে পারে না। এর অর্থ একমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেন তা মহাবিশ্বের মধ্যে ঘটে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই উপদেশটি ওষুধের মতো উপায় ব্যবহার ত্যাগ করার ইঙ্গিত দেয় না, তবে এর মানে হল যে কেউ উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ সেগুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করেছেন, তবে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহই সকল কিছুর ফলাফল নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অনেক অসুস্থ ব্যক্তি যারা ওষুধ খান এবং তাদের অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তারা অন্য যারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয় না। এটি ইঙ্গিত করে যে আরেকটি কারণ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে, তা হল মহান আল্লাহর ইচ্ছা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

*"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমরা কখনই আঘাত করব না..."*

যিনি এটি বোঝেন তিনি জানেন যে তাদের প্রভাবিত করে এমন কিছু এড়ানো যেত না। এবং যে জিনিসগুলি তাদের মিস করেছে সেগুলি কখনই পাওয়া যেত না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেষ ফলাফল যাই হোক না কেন তা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাদের ধৈর্য ধরে থাকা উচিত এবং সত্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম নির্বাচন করেছেন যদিও তারা ফলাফলের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

যখন কেউ এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে তখন তারা সৃষ্টির উপর নির্ভর করা বন্ধ করে দেয় যে তারা জন্মগতভাবে তাদের ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। পরিবর্তে, তারা মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের

মুখোমুখি হয়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সমর্থন ও সুরক্ষা কামনা করে। এটি একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দিকে পরিচালিত করে। এটি একজনকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

স্বীকার করা , মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝার একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয় যার কোন শেষ নেই এবং এটি কেবলমাত্র অতিমাত্রায় বিশ্বাস করার বাইরে চলে যায় যে মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। যখন এটি কারও হৃদয়ে স্থির হয় তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর উপর আশা করে, তারা জানে যে একমাত্র তিনিই তাদের সাহায্য করতে পারেন। তারা কেবল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করবে এবং আনুগত্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পেতে বা কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্যের আনুগত্য করে। একমাত্র মহান আল্লাহই এটি প্রদান করতে পারেন তাই কেবলমাত্র তিনিই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যের আনুগত্য পছন্দ করে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে যে এই অন্যটি তাদের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা তাদের ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। যা কিছু ঘটে তার উৎস হল আল্লাহ, মহান, তাই মুসলমানদের শুধুমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা উচিত। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

*"আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন- কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না..."*

উল্লেখ্য যে, এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উৎসাহিত করে, বাস্তবে মহান আল্লাহকে মান্য করা। যেমন হযরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

*"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."*

# আমর বিন মুররাহ (রাঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পর, আমর বিন মুররাহ (রা.) তাঁর গোত্রকে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনুমতি দিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর মিশনে পাঠানোর আগে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 218-219- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে ।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাকে নম্রতা অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে

তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

*"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."*

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

*"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"*

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে কথাবার্তায় সৎ থাকার পরামর্শ দেন।

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয় যা জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, সংখ্যা 2314।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার কারণ হবে। উপরন্তু, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে একজনের জীবন থেকে কথার দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যারা খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের কর্ম এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কাজের মূল্যায়ন থেকে বিরত রাখবে যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

পরিশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়শই পার্থিব বিষয় এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বদমেজাজ এড়িয়ে চলার উপদেশ দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী, 6116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ উপকারী হতে পারে উদাহরণস্বরূপ, আত্মরক্ষায় । এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল একজন ব্যক্তির উচিত তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে এটি তাকে পাপের দিকে নিয়ে না যায়। উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

প্রথমত, এই উপদেশ এমন সব ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজনকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য। এই হাদিসটিও ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তি তার রাগ অনুযায়ী কাজ করবে না। পরিবর্তে, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের নিজেদের সাথে লড়াই করা উচিত যাতে এটি তাদের পাপের দিকে নিয়ে না যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 134:

*"...যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"*

ইসলামের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, রাগ শয়তানের সাথে যুক্ত এবং অনুপ্রাণিত হওয়ায় সহীহ বুখারি, 3282 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন ক্ষুব্ধ মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সেজদা করবে। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি একজন নিষ্ক্রিয় শরীরের অবস্থান নেয় ততই তাদের রাগ করার সম্ভাবনা কম। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উপদেশের উপর কাজ করা একজনকে তাদের রাগকে নিজের মধ্যে বন্দী করার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না এটি চলে যায় যাতে এটি অন্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না করে।

একজন মুসলমান যে রাগান্বিত হয় তার উচিত সুনানে আবু দাউদ, 4784 নম্বরে পাওয়া হাদিসে দেওয়া উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাগান্বিত মুসলমানকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হল জল ক্রোধের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে কাউন্টার করে, তাপ। যদি কেউ তখন প্রার্থনা করে তবে এটি তাদের রাগকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি মহান পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে।

এ পর্যন্ত আলোচনা করা পরামর্শ একজন রাগান্বিত মুসলমানকে তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কারো কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাগ হলে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শব্দগুলি প্রায়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অন্যদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। রাগের মাথায় বলা কথার কারণে অগণিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে। এই আচরণ প্রায়ই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলমানের জন্য সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান গুণ এবং যে ব্যক্তি এটি আয়ত্ত করে তাকে সহীহ বুখারি, 6114 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্রোধ , অর্থ, তারা তাদের ক্রোধের কারণে কোন পাপ করে না, তাদের অন্তর শান্তি ও সত্য বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4778 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র হৃদপিণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একমাত্র হৃদয় যা কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88 এবং 89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আগেই বলা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ উপকারী হতে পারে। এটি নিজের নফস, বিশ্বাস এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত যা

সঠিকভাবে করা হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ হিসাবে গণ্য হয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা, যিনি কখনো নিজের কামনা-বাসনার জন্য রাগান্বিত হননি। তিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন, যা সহীহ মুসলিম, 6050 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহীহ মুসলিম, 1739 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তা নিয়ে খুশি হবেন এবং যা রাগান্বিত হবে তাতে রাগান্বিত হবেন।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু এই রাগ যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা দোষারোপযোগ্য হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হলেও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুনান আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 4901 নম্বর, এমন একজন উপাসককে সতর্ক করে যে ক্রোধের সাথে দাবি করে যে আল্লাহ, মহান, একটি নির্দিষ্ট পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। ফলস্বরূপ এই উপাসককে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং বিচারের দিনে পাপীকে ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উত্স চারটি জিনিস নিয়ে গঠিত: নিজের ইচ্ছা, ভয়, খারাপ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদীসের উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের চরিত্র ও জীবন থেকে এক চতুর্থাংশ মন্দতা দূর করবে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, তাই এটি তাদের এমনভাবে কাজ বা কথা বলে না যা তাদের এই দুনিয়া এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাকে অহংকার এড়িয়ে চলার উপদেশ দিয়েছেন।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

*“ আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।”*

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং

মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি । প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অন্যের প্রতি ঈর্ষা করা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে হিংসা ভাল কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

হিংসা করা একটি গুরুতর এবং বড় পাপ কারণ হিংসাকারীর সমস্যা অন্য ব্যক্তির সাথে নয় বাস্তবে এটি মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনিই সেই নিয়ামত যিনি ঈর্ষা করা হয় তাকে দিয়েছেন। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বরাদ্দ এবং পছন্দের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ একটি ভুল করেছেন যখন তিনি তাদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ বরাদ্দ করেছিলেন।

কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন হিংসাকারী আশীর্বাদ না পেলেও মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং মালিকের আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই প্রকারটি পাপ নয়, এটি অপছন্দনীয় বলে বিবেচিত হয় যদি হিংসা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং যদি তা ধর্মীয় আশীর্বাদের উপর হয় তবে প্রশংসনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যায় সে হল সেই ব্যক্তি যে বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং ব্যয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যেতে পারে সেই ব্যক্তি যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন এবং অন্যকে তা শেখান।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত হিংসা করা ব্যক্তির প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

# তুফায়েল বিন আমর (রাঃ)- ১

দাউস গোত্রের একজন সম্মানিত ও সম্মানিত ব্যক্তি তুফায়েল বিন আমর মক্কায় এলে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সতর্ক করে এবং তার কথা না শোনার জন্য জোর দেন। বা তার সাথে কথা বলবেন না। এমনকি তিনি তার কানে তুলা দিয়েছিলেন যাতে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী শোনা না হয়। কিন্তু তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পর তার সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করে অনুমান করলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যে বিষয়ে দাওয়াত দেন তা যদি ভালো হয় তবে তিনি তা গ্রহণ করবেন। খারাপ ছিল সে কেবল এটি প্রত্যাখ্যান করবে। ইসলামের শিক্ষা শোনার পর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে ইসলামের চেয়ে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ আর কিছু তিনি শুনিনি। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তার গোত্রে ফিরে আসেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার গোত্রের কাছে সদয় ও নম্রভাবে প্রচার করার পরামর্শ দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 48-49 এবং ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 221-222 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে কাজগুলি সঠিকভাবে, আন্তরিকভাবে এবং পরিমিতভাবে করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে একজন ব্যক্তির আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি হল সেগুলি যা নিয়মিত হয় যদিও তা কম হয়।

মুসলমানদের নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিক অর্থে কাজগুলো করছে, কারণ এই নির্দেশনা ব্যতীত কোনো কাজ করা একজনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

পরবর্তীতে, তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এগুলি সম্পাদন করবে, প্রদর্শনের মতো অন্য কোনও কারণে নয়। এই লোকদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত নিজেদেরকে অতিরিক্ত বোঝা না দিয়ে পরিমিতভাবে স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজ করা কারণ এটি প্রায়শই একজনকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সামর্থ্য এবং উপায় অনুযায়ী নিয়মিত কাজ করা উচিত যদিও এই ক্রিয়াগুলি আকার এবং সংখ্যায় সামান্যই হয় কারণ এটি একটি সময়ে একবার সম্পাদিত বড় ক্রিয়াগুলির চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের সৎ কাজগুলি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদ, কারণ সেগুলি সম্পাদন করার অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সুযোগ মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে।

অতএব, মুসলমানরা কেবল মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই সত্য উপলব্ধি অহংকারের মারাত্মক বৈশিষ্ট্য প্রতিরোধ করে । একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৬ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

# তুফায়েল বিন আমর (রাঃ) – ২

যখন তুফায়েল, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর গোত্রকে আমন্ত্রণ জানান, তাদের অধিকাংশই তাঁকে এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি শোকাহত ও ক্ষুব্ধ হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে ফিরে আসেন এবং তাই তাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার জন্য তার গোত্রকে অভিশাপ দিতে বলেন। ফলস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাদের হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর লোকদেরকে সত্যের দিকে আমন্ত্রণ জানাতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে উত্সাহিত করেছিলেন এবং অবশেষে তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 222-223- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিশাপ হল যখন কেউ মহান আল্লাহর কাছে রহমতের জন্য প্রার্থনা করে, যাকে অন্য কিছু থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কে অভিশপ্ত এবং তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য তা একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। তাই এই বোকা অভ্যাস পরিহার করা উচিত। যে ব্যক্তি এর যোগ্য নয় তাকে অভিশাপ দেওয়া একটি জঘন্য কাজ এবং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমত কামনা করে, অন্য কারো কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে স্পষ্ট করেছেন যে, একজন প্রকৃত মুমিন অভিশাপ দেয় না। যেসব মুসলমানদের অভিশাপ দেওয়ার অভ্যাস আছে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা এতটাই অপছন্দ করেন যে, বিচারের দিন তারা সাক্ষী ও সুপারিশকারী হতে বঞ্চিত হবে। মহান আল্লাহ শেষ দিবসে বাকি সৃষ্টির কাছে তাদের প্রদর্শন করা অপছন্দ করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6610 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে ।

অবশেষে, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6652, একজন মুমিনকে অভিশাপ দেওয়ার তীব্রতা তুলে ধরে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, একজন মুমিনকে অভিশাপ দেওয়া তাদের হত্যার শামিল।

এমনকি যদি কেউ অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য হয় তবে তা পরিহার করা এবং তার পরিবর্তে এমন শব্দ উচ্চারণ করা নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের কাজ যা মহান আল্লাহকে খুশি করবে, যেমন তাঁর স্মরণ।

# মুগীরা বিন শু’বা (রাঃ)- ১

কাদিসিয়ার যুদ্ধের আগে, যা পারস্যদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল, উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতের সময়, মুগিরা ( রা.)-কে পারস্য নেতার সাথে কথা বলার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 237-238- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখন পারস্যের নেতা মুগিরাকে উৎসাহিত করেন , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, এবং মুসলমানদের শান্তিতে দেশে ফিরে যেতে এবং পরিবর্তে দুটি জাতির মধ্যে বাণিজ্য স্থাপন করতে তিনি উত্তর দেন যে মুসলমানদের বস্তুগত জগতের প্রতি কোন আগ্রহ নেই এবং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে। পরকাল

এই মনোভাব অবলম্বন করার জন্য এই জড় জগত ও পরকাল সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি অবলম্বন করতে হবে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায়

না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

যখন পারস্যের নেতা তাকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরে বলেছিলেন যে এটি মানুষকে মানুষের দাস হওয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহর দাস হওয়ার দিকে নিয়ে যায়।

প্রথমত, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রধান জিনিস যা একজন মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে তা হল মানুষ একটি উচ্চতর নৈতিক নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করে। যদি মানুষ এটা পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তবে তাদের এবং পশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, লোকেরা আরও খারাপ হবে কারণ তারা এখনও উচ্চ স্তরের চিন্তাভাবনার অধিকারী, তবুও পশুদের মতো জীবনযাপন করা বেছে নেয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষ বাস্তবে স্বীকার করুক বা না করুক, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো ব্যক্তির সেবক। কেউ কেউ অন্যের সেবক, যেমন হলিউড এক্সিকিউটিভ এবং তারা যা করতে আদেশ করেন তা করেন এমনকি যদি তা শালীনতা এবং লজ্জাকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্যরা তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের দাস এবং তাদের খুশি করার জন্য যা যা লাগে তাই করে। অন্যরা তাদের নিজের ইচ্ছার দাস হয়ে আরও খারাপ কারণ এটি এমন প্রাণীদের মনোভাব যারা সাধারণত নিজেকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দাসত্বের সর্বোত্তম ও সর্বোত্তম রূপ হচ্ছে মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মহান আল্লাহর বান্দা ছিলেন, যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সম্মান ও সম্মান দেওয়া হয়েছিল এবং থাকবে। পরের এই মঞ্জুর. শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ

পেরিয়ে গেছে তবুও তাদের নাম ইতিহাসের স্তম্ভ এবং আলোকবর্তিকা হিসাবে স্মরণ করা হয়। পক্ষান্তরে যারা বিশেষ করে অন্যের সেবক হয়েছিলেন, তাদের নিজেদের কামনা-বাসনা কিছু পার্থিব মর্যাদা অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং তারা ইতিহাসের পাদটীকাতে পরিণত হয়েছিল। মিডিয়া খুব কমই তাদের মনে রাখে যারা রিপোর্ট করার জন্য পরবর্তী ব্যক্তির দিকে যাওয়ার আগে কয়েক দিনের বেশি সময় ধরে চলে যায়। তাদের জীবনকালে এই লোকেরা অবশেষে দু: খিত, একাকী, হতাশাগ্রস্ত এবং এমনকি আত্মঘাতী হয়ে ওঠে কারণ তাদের আত্মা এবং শালীনতা তাদের পার্থিব প্রভুদের কাছে বিক্রি করে তাদের তৃপ্তি দেয়নি যা তারা খুঁজছিল। এই সুস্পষ্ট সত্যটি বুঝতে পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং মানুষকে যদি বান্দা হতেই হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া, কেননা স্থায়ী সম্মান, মহানুভবতা ও প্রকৃত সাফল্য কেবল এতেই নিহিত।

যখন পারস্য নেতা তাকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেছিলেন যে ইসলাম শেখায় যে সমস্ত মানবজাতিই হযরত আদম (আঃ) এর সন্তান এবং তাদের একক পিতা ও মাতা রয়েছে।

এটি ইসলামে সমতার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে

তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

# জারির বিন আবদুল্লাহ – ১

জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন, ফরয নামায কায়েম করতে, ফরয দান-খয়রাত করতে এবং প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি আন্তরিক ও সত্যবাদী হতে। সহীহ বুখারীর ৫৭ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

*"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."*

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

*"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."*

# আওফ বিন মালিক (রহঃ)

আউফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এমন একটি ছোট দলের মধ্যে ছিলেন যারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তারা মানুষের কাছে কিছু চাইবেন না। এই ছোট দলটি এই অঙ্গীকারটি এতটাই কঠোরভাবে মেনে চলে যে তারা এমনকি অন্য কাউকে তাদের রাইডিং মাউন্ট থেকে নেমে যাওয়া কিছু পাস করতে বলবে না। সুনানে ইবনে মাজা, ২৮৬৭ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6470 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকবে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

প্রয়োজনে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু একজন মুসলমানের এই অভ্যাস করা উচিত নয় কারণ এতে আত্মসম্মান নষ্ট হতে পারে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে কারণ যে ব্যক্তি আত্মসম্মান হারায় তার পাপ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যরা তাদের সম্পর্কে যা চিন্তা করে তার যত্ন নেওয়া বন্ধ করে দেয়।

উপরন্তু, সাহায্যের জন্য অন্যদের দিকে ফিরে যাওয়ার আগে একজন মুসলিমকে তাদের দেওয়া সমস্ত উপায় ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে, মহান আল্লাহ তাকে মানুষের স্বাধীনতা দান করবেন।

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে অভাবী নয় এবং জিনিসের জন্য লোভী নয়। এটি তখন ঘটে যখন কেউ মহান আল্লাহ কর্তৃক যা দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হয়, যা অর্জিত হয় যখন একজন সঠিকভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিকে যা সর্বোত্তম দান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

এই ব্যক্তি সত্যিকারের ধনী যেখানে সর্বদা জিনিসের জন্য লোভী এবং অভাবী সে অনেক সম্পদের অধিকারী হলেও দরিদ্র। এটি সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

# আমর বিন শাস আল আসলামি (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। একজন সাহাবী, আমর বিন শাস আল আসলামী , আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, যিনি এই অভিযানের অংশ ছিলেন তিনি অনুভব করেছিলেন যে আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করেছিলেন। আমর (রাঃ) যখন মদিনায় ফিরে আসেন তখন তিনি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এবং বিভিন্ন লোকের সাথে আলাপ-আলোচনায় আলী (রাঃ)-এর সমালোচনা করেন। একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখতে পেলেন, যিনি তাঁর পাশে বসে না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন যে তিনি তাঁর ক্ষতি করেছেন। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ক্ষতি করার জন্য তার অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশেষে মন্তব্য করেছেন যে যে ব্যক্তি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে সে তার ক্ষতি করেছে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 143-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, অন্যদের তুচ্ছ নেতিবাচক আচরণকে উপেক্ষা করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত মুসলমানরা আশা করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা

একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"*

উপরন্তু, এই ঘটনাটি মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালবাসার নিদর্শন তুলে ধরে, যথা: যারা আল্লাহ, মহান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসেন, তাদের সকলকে ভালোবাসুন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যদিও এটি তাদের সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালবাসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালবাসা ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিগণ এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা সেই ব্যক্তির উপর কর্তব্য যে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। এটি অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যেমন সহীহ বুখারী, 17 নম্বরে পাওয়া একটি। এটি পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালবাসা, অর্থাত্ পবিত্র নগরী মদিনার বাসিন্দারা। ঈমানের একটি অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ভন্ডামীর লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে তারা যেন কোন সাহাবীর সমালোচনা না করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের ভালবাসা একটি চিহ্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাদের ঘৃণা করা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 143 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

যদি একজন মুসলিম অন্যায়ভাবে এমন কোন মুসলিমের সমালোচনা করে যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। একজন মুসলমান যদি পাপ করে তবে অন্য মুসলমানের পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের উচিত, তবুও পাপী মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অন্যদের ভালবাসার লক্ষণ হল তাদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ১

আবু ধার গাফারী, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এমন একজন ছিলেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করার আগেও মূর্তি পূজা করেননি এবং এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন। যখন তিনি ইসলামের কথা শুনেছিলেন তখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করতে, গোপনে, কারণ তিনি ইসলামের প্রতি মক্কার অমুসলিমদের ঘৃণা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আলী আবু ধারের সাথে দেখা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি তার এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে একটি গোপন বৈঠক স্থাপনে সহায়তা করেন। ফলে আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 71-72-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, আবু ধাররকে সাহায্য করার জন্য এবং আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য নিজেকে বিপদে ফেলেছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

# আবু যার গাফারী (রাঃ) -২

আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি সমালোচকের সমালোচনাকে ভয় করবেন না যখন এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে জড়িত। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 258- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা

তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)-3

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে খলিফা রাবদা থেকে ফরজ দান সংগ্রহের জন্য একজন ক্রীতদাসকে প্রেরণ করেছিলেন । যখন নামাযের সময় হল, তখন গোলাম প্রথমে নামাযের ইমামতি করার জন্য এগিয়ে গেল কিন্তু আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে তিনি পিছন সরে গেলেন এবং ইমামতি করতে উৎসাহ দিলেন। আবু ধার, রাদিয়াল্লাহু আনহু, ক্রীতদাসকে নামাযের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জোর দিয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকে দাস হলেও একজন নেতার কথা শুনতে এবং মানতে বলেছিলেন। সুনানে ইবনে মাজা, ২৮৬২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি একজন নেতার প্রতি আন্তরিকতার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."*

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

## আবু যার গাফারী (রাঃ) – ৪

সিরিয়ার গভর্নর একবার আবু জার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 300টি স্বর্ণমুদ্রা উপহার পাঠান। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তার তাদের প্রয়োজন নেই এবং সেগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে তার কাছে যা ছিল তা তার জন্য যথেষ্ট, যা ছিল একটি ছায়া যেখানে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন, ছাগলের একটি ছোট পাল এবং একটি মুক্তকৃত ক্রীতদাস যিনি তার সেবা করেছিলেন। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে এই সত্ত্বেও তিনি ভয় পান যে তিনি এই পৃথিবীতে অনেক কিছুর অধিকারী। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 279- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 103 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যারা তাদের আমলের বিচার করবে, বিচারের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই জড় জগতের হালাল আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ না হলেও তারা প্রায়শই হারামের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিরর্থক বক্তৃতা সাধারণত পাপপূর্ণ বক্তৃতার আগে প্রথম ধাপ। উপরন্তু, কেউ যত বেশি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসে লিপ্ত হবে, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা তত বেশি হবে। এক মনে রাখা উচিত যে বিচারের দিন একটি কঠিন দিন হবে। যেমন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও, একজন মুসলিমকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু কম নয়, তাদের জবাবদিহিতা যত বেশি সময় ধরে তারা তত বেশি চাপ সহ্য করবে। বিচারের দিন পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে বলে পবিত্র কুরআন

অনুসারে, কয়েক দশকের বৈধ আনন্দ উপভোগ করার অর্থ নেই যদি এর অর্থ হয় যে এমন একটি দিনে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। অধ্যায় 70 আল মাআরিজ, আয়াত 4:

*"...একটি দিনে যার ব্যাপ্তি পঞ্চাশ হাজার বছর।"*

তাই বিচার দিবসে নিজের জবাবদিহিতা কম করার জন্য সহজ সরল জীবনযাপন করাই উত্তম। সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উপদেশ দিয়েছেন তার একটি কারণ যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)-৫

আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার তাঁর দাসের মতো পোশাক পরতে দেখা গেছে। যখন তাকে তার ভৃত্যের চেয়ে ভাল পোশাক পরতে বলা হয়েছিল তখন তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন প্রভু তাদের ভৃত্যকে যে খাবার খায় তা খাওয়ান, তারা যে পোশাক পরেন এবং একই পোশাক পরাবেন। যে কোনো কাজে তাদের সহায়তা করুন যা সম্পূর্ণ করার ক্ষমতার বাইরে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 377-378- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ৬

আবু ধারের স্ত্রী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি দিনের বেশিরভাগ সময় নির্জনে ধ্যান করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 638-639- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নিছক ইবাদত করলে কাউকে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা যাবে না। মুসলমানরা কেবল তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেই এই স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদের কাছে থাকা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দিয়ে এবং তাদের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে অর্জন করা হয়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র গুরুতর প্রতিফলন এবং স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

যখন কেউ তাদের নিজস্ব বাস্তবতাকে চিনতে পারে তখন এটি তাদের সেবকের মতো জীবনযাপন করতে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করবে। এটি তাদের মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পরিচালিত করবে , যা চূড়ান্ত লক্ষ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

*"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"*

এই আত্ম-মূল্যায়ন একজনকে তাদের চরিত্র এবং আত্মাকে মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অত্যাবশ্যক,

যা উভয় জগতের সাফল্যের পথ। কেউ কেউ বস্তুগত জগতে এতটাই হারিয়ে যায় যে তারা কখনই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে না এবং তাই তাদের এক বিট পরিবর্তন না করেই কয়েক দশক কেটে যায়। দুর্বলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে মুসলমানদের অবশ্যই আত্ম-মূল্যায়ন এবং আরও উন্নতির জন্য তাদের দেওয়া শক্তির সময় ব্যবহার করতে হবে। এই মুহুর্তে তারা পরিবর্তন করতে চাইবে কিন্তু তারা তা করার বুদ্ধি বা শক্তির অধিকারী হবে না। এটি সহীহ বুখারী, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে যাদেরকে প্রভূত ক্ষমতা ও সম্পদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু অবশেষে এমন একটি সময় এল যখন তাদের শক্তির মুহূর্ত ফুরিয়ে গেল এবং তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাদের শক্তির মুহূর্তগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন, তারা এমনভাবে আশীর্বাদ করবেন যে, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও তারা সমাজে সম্মানিত হবেন।

যেহেতু মুসলমানদের অধিকাংশই আরবি ভাষা বোঝে না, প্রচুর পরিমাণে ইবাদত এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকে ট্রিগার করবে না। এই জড় জগৎ, মৃত্যু, কবর ও জাহান্নামকে চিন্তা করেই কেউ সেখানে পৌঁছাতে পারে। এ কারণে ষাট বছরের স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে এক মুহূর্তের প্রতিফলন উত্তম হয়ে উঠতে পারে।

যারা প্রজ্ঞা বা প্রতিফলন ছাড়াই জীবনযাপন করে তারা অভ্যাসগতভাবে ভুল করে যা শুধুমাত্র ক্রমাগত চাপের দিকে পরিচালিত করে। এই লোকেরাই কোন উচ্চ আকাঙ্খা ছাড়াই লক্ষ্যহীন জীবনযাপন করে এবং তাদের আসল উদ্দেশ্য না বুঝেই প্রতিটি দিন অতিক্রম করে।

ধার্মিকরা সর্বদা তাদের দিন থেকে সময় বের করে তাদের লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করার জন্য, তারা কী কাজ করেছে এবং তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে কি না । এই মানসিকতা নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি পাপ পরিহার করে, সৎ কাজ করে এবং যদি তারা পাপ করে তবে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। এই মানসিকতা ইসলামের দ্বিতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা ওমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেওয়া উপদেশের সাথে খাপ খায়, যা ইমাম আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৯৮ নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে। বিচার দিবসে অন্য কেউ তাদের বিচার করবে, নাম মহান আল্লাহ।

এই স্ব-মূল্যায়ন হল সেই চাবিকাঠি যা একজনকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করে। এই মঞ্চের তুলনায় এটি সর্বোত্তম পর্যায় যেখানে একজন তাদের ভুল বুঝতে পারে যখন অন্য একজন তাদের নির্দেশ করে। কিন্তু এই পর্যায়েও একজনের ভালো বন্ধু এবং আত্মীয়দের থাকা প্রয়োজন যারা জ্ঞানী এবং আন্তরিকভাবে তাদের চিরন্তন কল্যাণের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে শুধুমাত্র জড় জগতের সাথে উদ্বিগ্ন। একজন সত্যিকারের ধন্য মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কাছে এই ধরনের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব রয়েছে যারা তাদের তাকওয়া অবলম্বন করতে সাহায্য করে।

একজনের দিনের শুরুতে প্রতিফলিত হওয়া এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সেই কাজগুলি এড়িয়ে সময় বাঁচায় যেগুলি বিলম্বিত হওয়া উচিত।

নিচের আয়াতে সফল মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তাভাবনা করে এবং গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং অহংকার প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত না হয় তবে তাদের অনুতপ্ত হতে হবে এবং অনেক দেরি হওয়ার আগেই পরিবর্তন করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 83:

*"এবং যখন তারা শোনেন যা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে বলে তাদের চোখ অশ্রুতে উপচে পড়ছে..."*

আত্ম-প্রতিফলনের অভাব মুসলমানদের বস্তুজগতে হারিয়ে যেতে বাধ্য করেছে যদিও ইসলামিক জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক সহজলভ্য। স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা শুধুমাত্র একজনকে এতদূর নিয়ে যাবে কিন্তু বিশ্বাসের উচ্চতায় পৌঁছতে তাদের অবশ্যই তাদের চরিত্রের প্রতিফলন এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এটি তাদের মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিত্যাগ করতে এবং তাদের প্রতিস্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই আত্ম-মূল্যায়ন এবং প্রতিফলনকে উদ্দীপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানটি হল ইসলামী জ্ঞান যা অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত হতে হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে , এই ধরনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ৭

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তার চেয়ে কম পার্থিব জিনিস আছে তাদের দিকে তাকাতে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৫৩ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4142 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যারা তাদের চেয়ে কম পার্থিব জিনিসের অধিকারী তাদের পরিবর্তে যারা বেশি অধিকারী তাদের পালন করবে কারণ এটি তাদের অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে বিরত রাখবে। .

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ভুলভাবে অন্যের জীবন পর্যবেক্ষণ করে যা তাদের নিজের জীবনের চেয়ে ভালো বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ লোকেরা প্রায়শই সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের জীবন আরও ভাল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই ধারণাটি সত্য নয়। যেহেতু যারা ভাল অবস্থায় আছে বলে মনে হয় তারা হয়তো এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে যার ফলে অন্যরা তাদের সাথে জায়গা বাণিজ্য করতে চায় না। একজন বহিরাগত শুধুমাত্র একটি দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলি পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু যদি তারা পুরো গল্পটি দেখতে পায় তবে তারা বুঝতে পারবে যে প্রত্যেকেই সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং তাদের নিজের বা কত বিখ্যাত তা নির্বিশেষে কারোরই নিখুঁত জীবন নেই। প্রায়শই এই ভুল ধারণা মিডিয়ার কারণে হয়। কিন্তু লোকেরা মনে রাখতে ব্যর্থ হয় যে মিডিয়ার উদ্দেশ্য হল সেলিব্রিটিদের জীবনের একটি নির্দিষ্ট ছবি আঁকা যা পড়তে আকর্ষণীয় দেখায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদি

তারা শুধুমাত্র চিনির প্রলেপ ছাড়াই তথ্য জানায় তবে তাদের বেশিরভাগ গ্রাহক তাদের থেকে দূরে সরে যাবে।

মুসলমানদের অবশ্যই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি শয়তানের একটি হাতিয়ার যারা এটি ব্যবহার করে মানুষকে তাদের কাছে যা আছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এই হাদীসে যে সঠিক মানসিকতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে বাধা দেবে। যখনই একজন মুসলমান অকৃতজ্ঞ বোধ করে তখনই তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা উচিত অগণিত লোকের দিকে যারা গুরুতর দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে এবং তাদের চেয়ে অনেক বেশি কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে।

ঘাস বেড়ার অন্য পাশে সবুজ নয়, এটি আসলে নিজের পাশে যথেষ্ট সবুজ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

# আবু যার গাফারী (রাঃ) – ৮

যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু ধার গাফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সতর্ক করেছিলেন যে তিনি ভবিষ্যতে অসুবিধার সম্মুখীন হবেন তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহর আদেশকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং অভিবাদন জানিয়েছেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৬৩ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য

উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ৯

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু, একবার দুনিয়াবী লোকদের বর্ণনা করে বলেছিলেন যে তারা এমনটি তৈরি করে যা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। যা চলে যাবে তাকে তারা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে এবং যা চিরস্থায়ী তা ত্যাগ করে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৬৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, ভবন নির্মাণে ব্যয় করা সম্পদ ব্যতীত সমস্ত বৈধ ব্যয় মহান আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব লাভ করে।

এর মধ্যে হালাল জিনিসের উপর সমস্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত যা অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত। নির্মাণে ব্যয় করা যা প্রয়োজন তা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে যে নির্মাণ প্রয়োজন তার বাইরে। এটি অপছন্দ করা হয় কারণ নির্মাণে ব্যয় করা সহজে অপচয় এবং অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি নির্মাণে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার দাতব্য দান এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করার সম্ভাবনা কম। এছাড়াও এই আচরণটি প্রায়শই একজন মুসলিমকে দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করতে পরিচালিত করে কারণ যারা বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরিতে শক্তি এবং সম্পদ নষ্ট করবে না। দীর্ঘ জীবনের জন্য একজনের আশা যত বেশি হবে তত কম ধার্মিক কাজগুলি তারা করবে এই বিশ্বাসে যে তারা ভবিষ্যতে সবসময় ভাল কাজ করতে পারবে। এটি একজনকে আন্তরিক অনুতাপকে বিলম্বিত করে এই বিশ্বাস করে যে তারা সর্বদা ভবিষ্যতে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে পারে। অবশেষে, এটি এই পৃথিবীতে তাদের

দীর্ঘস্থায়ী থাকার জন্য আরও আরামদায়ক জীবন তৈরি করার জন্য বিশ্বের জন্য আরও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে।

অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া একজনের সময়কে দখল করে যা তাদের স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজগুলি করতে বাধা দেয়, যেমন উপবাস এবং স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা চরম ক্লান্তি থেকে। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার প্রচেষ্টা থেকেও বাধা দেয়।

অবশেষে, বাস্তবে অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে অংশ নেওয়া কখনই শেষ হয় না। অর্থ, যে মুহুর্তে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির একটি অংশ সম্পূর্ণ করে তারা পরবর্তীতে চলে যায় যতক্ষণ না চক্রটি পুনরাবৃত্তি হয়।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কেবল নির্মাণের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা উচিত যাতে তারা এই নেতিবাচক পরিণতিগুলি এড়াতে পারে।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ১০

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একবার বলেছিলেন, এমন এক যুগ আসবে যখন একজন মানুষ তার গাড়ির গতির জন্য ঈর্ষা করবে, এমন এক মুগ্ধতা নিয়ে সেও গর্ব করবে। ইমাম আল আসফাহানীর গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, হিলিয়াত আল আউলিয়া, সংখ্যা 370।

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে তাদের কামনা-বাসনা এবং অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এবং এটি তাদের জন্য নির্দেশিত যারা অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসগুলিকে এমনভাবে অনুসরণ করে যে এটি তাদের সঠিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে অবহেলা করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পরকাল এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে । অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা পায় না তখন তারা তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

*"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"*

মুসলমানদের বরং ধৈর্য্য ও সন্তুষ্ট থাকতে শেখা উচিত তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের ঐশ্বর্য। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি হল অভাবী অর্থ, দরিদ্র যদিও তার কাছে অনেক সম্পদ আছে। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে জানা, মহান, মানুষকে তাদের জন্য সর্বোত্তম কী দান করেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

*"আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"*

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ১১

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, কিয়ামতের দিন, যার কাছে দুটি রৌপ্য মুদ্রা রয়েছে তার কাছে একটি রৌপ্য মুদ্রার মালিকের চেয়ে আরও কঠোর জবাবদিহিতা করা হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৭১ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 103 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যারা তাদের আমলের বিচার করবে, বিচারের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই জড় জগতের হালাল আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ না হলেও তারা প্রায়শই হারামের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিরর্থক বক্তৃতা সাধারণত পাপপূর্ণ বক্তৃতার আগে প্রথম ধাপ। উপরন্তু, কেউ যত বেশি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসে লিপ্ত হবে, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা তত বেশি হবে। এক মনে রাখা উচিত যে বিচারের দিন একটি কঠিন দিন হবে। যেমন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও, একজন মুসলিমকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু কম নয়, তাদের জবাবদিহিতা যত বেশি সময় ধরে তারা তত বেশি চাপ সহ্য করবে। বিচারের দিন পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে বলে পবিত্র কুরআন অনুসারে, কয়েক দশকের বৈধ আনন্দ উপভোগ করার অর্থ নেই যদি এর অর্থ হয় যে এমন একটি দিনে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। অধ্যায় 70 আল মাআরিজ, আয়াত 4:

*"...একটি দিনে যার ব্যাপ্তি পঞ্চাশ হাজার বছর।"*

তাই বিচার দিবসে নিজের জবাবদিহিতা কম করার জন্য সহজ সরল জীবনযাপন করাই উত্তম। সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উপদেশ দিয়েছেন তার একটি কারণ যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ১২

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় তার লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৭৩ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7 এর সাথে সংযুক্ত :

*"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"*

এই আয়াতের অর্থ হল কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতেই সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অগণিত মানুষ মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। . বেশিরভাগ লোকেরা যে অজুহাত দেয় তা হল তাদের সৎ কাজ করার সময় নেই। তারা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দেবে না। এটা কোনো কিছু হলো? যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে না এবং তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে মহান আল্লাহর সাহায্যের আশা করে তারা নিতান্তই মূর্খ। এবং যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তবুও তাদের অতিক্রম করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তারা যে সাহায্য পাবে তা সীমিত। একজন কিভাবে আচরণ করে তাদের সাথে কিভাবে আচরণ

করা হয়। যত বেশি সময় এবং শক্তি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হবে, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই যে সহজ।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে বেশিরভাগ বাধ্যতামূলক কর্তব্য, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, একজনের দিনে অল্প সময় লাগে। একজন মুসলমান প্রতিদিন মাত্র এক ঘণ্টা ফরজ নামাজের জন্য উৎসর্গ করার এবং তারপর সারাদিনের জন্য মহান আল্লাহকে অবহেলা করার এবং সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অব্যাহত সমর্থন আশা করতে পারে না। একজন ব্যক্তি এমন একজন বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তাদের সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে বিশ্বজগতের রব মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন আচরণ কিভাবে করা যায়?

কেউ কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় নিবেদন করে, যখন তারা কোন পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে তা সমাধানের দাবি করে যেন তারা স্বেচ্ছায় সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ করেছেন। এই মূর্খ মানসিকতা স্পষ্টতই মহান আল্লাহর দাসত্বের বিরোধিতা করে। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরনের ব্যক্তি কীভাবে তাদের অন্যান্য অবসরের কাজগুলি করার জন্য সময় খুঁজে পান, যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা কিন্তু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উত্সর্গ করার জন্য কোন সময় খুঁজে পান না। তারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার এবং গ্রহণ করার সময় খুঁজে পায় না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও আমল করার সময় খুঁজে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় তবে স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করার মতো কোনও সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলিম তাদের আচরণ অনুযায়ী আচরণ করা হবে। অর্থ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা নিরাপদে সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কোন সময় নিবেদন না করে শুধুমাত্র তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ করে বললে, কেউ যত বেশি দেবে তত বেশি পাবে। কেউ বেশি না দিলে বিনিময়ে বেশি আশা করা উচিত নয়।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ১৩

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন যে, হিসাব দিবস হল মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্যের সবচেয়ে দূরে। অতএব, একটি তাদের সবচেয়ে উপকারী কি গ্রহণ করা উচিত. একজনের উচিত এই পৃথিবীকে দুই ধরনের প্রচেষ্টার জন্য একটি স্থাপনা করা। প্রথমটি হল পরকালের কল্যাণ কামনা করা এবং দ্বিতীয়টি হল দুনিয়াতে যা জায়েজ তা অন্বেষণ করা। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৭৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক মুসলমান আছে যারা তাদের অনেক সময়, শ্রম এবং সম্পদ এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে যা সৎ কাজ বা পাপ নয়, এগুলো নিরর্থক জিনিস। নিরর্থক জিনিসগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জন করাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেমন প্রয়োজনের বাইরে নিজের ঘরকে সুন্দর করা। যদিও, তারা তাদের দাবিতে সঠিক হতে পারে যে তারা পাপ করছে না, একটি সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যথা, সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান উপহার, যা একবার চলে গেলে লাভ করা যায় না। সময় ছাড়া অন্য সব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করা যায়। সুতরাং যখন কেউ তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদ যেমন সম্পদকে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত জিনিসের অর্থ, নিরর্থক জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, তখন তা বিচার দিবসে একটি বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়। এটি তখন ঘটবে যখন তারা তাদের সময়কে সদ্ব্যবহার করে এবং সৎকাজ সম্পাদনকারীদের প্রদত্ত পুরষ্কার দেখে। সময় নষ্টকারীরা পাপ এড়িয়ে যেতে পারে যা তাদের শাস্তি থেকে বাঁচায় কিন্তু তারা অযথা কাজে সময় নষ্ট করার কারণে তারা সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। এবং তারা অবশ্যই তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তারা যে পুরষ্কার অর্জন করতে পারত তা অবশ্যই হারাবে।

উপরন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যত বেশি নিরর্থক জিনিসে লিপ্ত হয় সে তত বেশি বাড়াবাড়ি এবং অপচয়ের মধ্যে পড়ে যা উভয়ই দোষের যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, যারা আশীর্বাদ নষ্ট করে তারা শয়তানের ভাইবোন বলে বিবেচিত হয়। এবং এটি তর্ক করা যেতে পারে যখন কেউ নিরর্থক জিনিসের জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে সময়ের মূল্যবান আশীর্বাদকে নষ্ট করেছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"*নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই..*"

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ১৪

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে মানুষের নাগালের বাইরে যা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই তাদের ধ্বংস করবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৭৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের বিশ্বাস নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্খা করে, ঠিক যেমন খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকারটি হল যখন একজন ব্যক্তি সম্পদের প্রতি চরম ভালবাসা রাখে এবং তা বৈধ উপায়ে অর্জনের জন্য ক্লান্তি ছাড়াই চেষ্টা করে। এমন আচরণ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষণ নয় কারণ একজন মুসলমানের

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বিধান তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের দায়িত্বে অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত। যে শরীর সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি পরিশ্রম করবে যে তারা এটি উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং এটিকে অন্য লোকেদের উপভোগ করার জন্য রেখে যাবে যদিও তারা এর জন্য দায়ী হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তারা এখনও মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই অর্জন করুক না কেন তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, প্রকৃত দরিদ্র, এমনকি যদি তাদের অনেক সম্পদ থাকে।

একমাত্র লোভ যা উপকারী তা হল সত্যিকারের সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যথা, সৎকর্মের জন্য নিজের প্রত্যাবর্তনের দিনের জন্য প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয় প্রকারের ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা প্রথম প্রকারের মতই কিন্তু তা ছাড়াও এই ধরনের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার যেমন ফরজ সদকা পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিসে, 6576 নম্বর, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা হারাম জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি যে সম্পদের অধিকারী নয় তার জন্য চেষ্টা করে যা অসংখ্য বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন, লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসাইতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 3114, সতর্ক করে যে চরম লোভ এবং সত্যিকারের বিশ্বাস একজন সত্যিকারের মুসলমানের হৃদয়ে কখনই একত্রিত হবে না।

কোনো মুসলমান যদি এ ধরনের লালসা অবলম্বন করে তাহলে একজন অশিক্ষিত মুসলমানের জন্যও এর চরম বিপদ স্পষ্ট। এটি তাদের ঈমানকে ধ্বংস করবে যতক্ষণ না সামান্য ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট না থাকে ঠিক যেমনটি আলোচিত প্রধান হাদিসটি সতর্ক করে যে একজনের বিশ্বাসের এই ধ্বংসটি ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক। এই মুসলমান তাদের মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের সামান্য বিশ্বাস হারানোর ঝুঁকি নেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয় । প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩

নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ১৫

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, নির্জনে থাকা খারাপ সঙ্গীর চেয়ে উত্তম এবং একজন সৎ সঙ্গী নির্জনতার চেয়ে উত্তম। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, ২/২৬১।

সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে তাকে তাদের একজন হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমস্ত মুসলমান নির্বিশেষে তাদের বিশ্বাসের শক্তিতে গণনা করা এবং পরবর্তী পৃথিবীতে ধার্মিকদের সাথে শেষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যদি তারা ধার্মিকদের অনুকরণ করে তবেই তাদের সাথে শেষ হবে। এই অনুকরণ একটি ব্যবহারিক জিনিস শুধু শব্দের মাধ্যমে ঘোষণা নয়। এই অনুকরণটি মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে করা হয়।

কিন্তু যারা মৌখিকভাবে ধার্মিকদের প্রতি তাদের ভালবাসা ঘোষণা করে এবং তাদের অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে মুনাফিক এবং পাপীদের মধ্যে

পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুকরণ করে তাদের একজন হিসাবে বিবেচিত এবং বিচার করা হবে। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের বিশ্বাস হারাবে তবে এর অর্থ তাদের অবাধ্য মুসলিম হিসাবে বিচার করা হবে । কিভাবে একজন অবাধ্য মুসলমানকে একজন আনুগত্যকারী মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যায় এবং ধার্মিকদের সাথে শেষ করা যায়? এটা শুধুমাত্র ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 20:

*"জাহান্নামের সঙ্গী এবং জান্নাতের সাথী সমান নয়। জান্নাতের সাথী- তারাই [সাফল্যের]।*

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ১৬

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে তার দারিদ্র্যের দিনটি হল যখন তাকে তার কবরে রাখা হবে। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, ২/৩০৮।

সহীহ বুখারী, 6514 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে দুটি জিনিস মৃতকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল একটি জিনিস তাদের কাছে থাকে। যে দুটি জিনিস তাদের পরিত্যাগ করে তা হল তাদের পরিবার ও সম্পদ এবং তাদের কাছে অবশিষ্ট থাকে তা হল তাদের আমল।

ইতিহাস জুড়ে লোকেরা সর্বদা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছে সম্পদ এবং একটি সুখী পরিবার অর্জনের জন্য। যদিও ইসলাম এই জিনিসগুলিকে নিষিদ্ধ করে না কারণ এগুলোর প্রয়োজন হতে পারে একজনের দায়িত্ব পালনের জন্য, উদাহরণস্বরূপ, একজনের নির্ভরশীলদের সমর্থন করার জন্য সম্পদের প্রয়োজন। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে তাদের প্রয়োজনের বাইরে তাদের জন্য প্রচেষ্টা করতে এবং সৎকর্ম সম্পাদনের মতো আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের উপর তাদের অগ্রাধিকার দিতে নিরুৎসাহিত করে।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং এমন একটি পরিবার পেতে হবে যা তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে। এইভাবে ব্যবহার করা হলে এগুলি উভয়ই ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়। এটি সহীহ বুখারী, 6373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিহ্ন যিনি সেই জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দেন যা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে সহ্য করবে এবং সমর্থন করবে যথা, সৎ কাজ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহর হুকুম পালনে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যস্ত রাখতে দেয় তাকে পবিত্র কুরআনে ক্ষতিগ্রস্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 9:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ না করে। আর যে এটা করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"*

কেউ কেউ ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, কারণ তিনি তাদের প্রচুর সম্পদ এবং পরিবার দান করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ ঘোষণা করে তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তার প্রিয় ও নিকটবর্তী। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 37:

*"এবং আপনার সম্পদ বা আপনার সন্তান-সন্ততি আপনাকে অবস্থানে আমাদের নিকটবর্তী করে না, বরং এটি এমন একজন ব্যক্তি যে বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে..."*

পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন যে, তাদের ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন আখেরাতে তাদের কোনো উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না তারা সুস্থ চিত্তে পরকালে পৌঁছায়। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

*"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"*

সুস্থ হৃদয়ের সংজ্ঞাটি সহজভাবে বলতে গেলে কেউ তা অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি না হয়। তাকে।

একজনের সম্পদ কেবলমাত্র তাদের পরকালে উপকার করতে পারে যদি তারা এটিকে চলমান দাতব্য প্রকল্পে ব্যয় করে তাদের আগে পাঠায়। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একই হাদিস মানবজাতিকে জানায় যে একজন নেক সন্তান তাদের মৃত পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করলেও কবুল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে অনেক শিশু তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের উত্তরাধিকার খুঁজতে ব্যস্ত।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ধার্মিক সন্তানকে লালন-পালন করা যে তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তা অর্জন করা সম্ভব নয় যদি পিতামাতারা তাদের জীবনে সৎ কাজ না করেন। দ্বিতীয়ত, এটা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের পথ নয়, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, সৎকাজ করা থেকে বিরত থাকুন এবং আশা করি অন্যরা এ থেকে সরে যাওয়ার পর তাদের জন্য দোয়া করবেন। বিশ্ব একজনকে জীবিত অবস্থায় সৎকাজের জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং তারপর আশা করা উচিত যে তারা মারা যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র একজন যে সম্পদ পাঠাবে তা তাদের উপকার করবে। এটি তাদের সন্তানদের শিক্ষার মতো একজনের দায়িত্ব পালনে ব্যয় করে অর্জন করা যেতে পারে। ভুলভাবে ব্যয় করা সমস্ত সম্পদ মালিকের জন্য বোঝা হয়ে উঠবে এবং তাদের শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যারা লোভের বশবর্তী হয়ে ফরজ সদকা থেকে বিরত থাকে তাদের ভয়ানক শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এই গুরুতর পাপ করবে বিচারের দিন তার সাথে একটি বিশাল বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা তাদের চারপাশে আবৃত করবে এবং অবিরাম দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

*"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."*

সুনানে আবু দাউদ, 1658 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, বিচারের দিন কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সোনা ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং যদি তারা বাধ্যতামূলক সদকা করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের শরীরে দাগ দেওয়া হবে। এটার উপর বকেয়া

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে যখন মৃত ব্যক্তি তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী থাকবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কোন ব্যক্তি জেনেশুনে এমন কোন ব্যক্তির কাছে সম্পদ ছেড়ে দেয় যে এটি অধিকার করার উপযুক্ত নয় এবং এভাবে তার অপব্যবহার করে তাহলে মৃত ব্যক্তিও এর জন্য দায়ী হতে পারে। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিকভাবে ব্যয়কারী ব্যক্তির কাছে সম্পদ রেখে যায় তবে মৃত ব্যক্তিকে বিচারের দিন অনেক অনুশোচনা করতে হবে যখন তারা সঠিকভাবে ব্যয়কারীকে দেওয়া মহাপুরস্কার দেখবে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪২০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, বাস্তবে একজন ব্যক্তি তার সম্পদ শুধুমাত্র তিনটি উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। প্রথমটি হল সম্পদ যা তাদের খাদ্যের জন্য ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয়টি হল তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করা সম্পদ এবং শেষ সম্পদ হল যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে। অন্যান্য সমস্ত সম্পদ অন্য লোকেদের ভোগ করার জন্য রেখে দেওয়া হয় যখন মৃত ব্যক্তিকে তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী করা হয়।

মজুদ করা এবং ভুলভাবে সম্পদ ব্যয় করা একজনকে বস্তুগত জগতকে ভালবাসতে এবং পরকালকে অপছন্দ করতে অনুপ্রাণিত করে কারণ তারা তাদের প্রিয় সম্পদকে পিছনে ফেলে যেতে অপছন্দ করে, যা তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে। যে আখেরাতকে অপছন্দ করে সে তার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না।

উপরন্তু, কেউ যদি সত্যিকারের তাকওয়া অবলম্বন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

*"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."*

প্রকৃতপক্ষে, সম্পদ একটি অদ্ভুত সঙ্গী কারণ এটি কেবল তখনই কাউকে উপকৃত করে যখন এটি তাদের অর্থ ছেড়ে দেয়, যখন এটি সঠিক উপায়ে ব্যয় করা হয়।

একজন ব্যক্তি যদি কোনো বিধান ছাড়াই দীর্ঘ ভ্রমণে যান তাহলে তাকে বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি তাদের আখেরাতের দীর্ঘ সফরের জন্য তাদের ধন-সম্পদ আগে থেকে পাঠায় না সেও মূর্খ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে একজন মানুষ মৃত্যুর সময় সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করে যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ পিছনে ফেলে খালি হাতে পরকালের দিকে যাত্রা করছে। একজন মুসলমানের উচিত যে কোনো মূল্যে এই পরিণতি এড়ানো।

সৎ কাজ করাই একমাত্র উপায় যা একজনের কবরের জন্য প্রস্তুত করা হয় কারণ সেখানে আর কোন সান্ত্বনা পাওয়া যাবে না। এটা আসলে পরকালে একজনের চিরস্থায়ী আবাস প্রস্তুত করার মাধ্যম। অতএব, এই প্রস্তুতিকে সাময়িক বস্তুগত জগতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তার দুটি ঘর থাকে এবং তার বেশিরভাগ প্রচেষ্টা ঘরকে সুন্দর করার জন্য উৎসর্গ করে যেটিতে তারা কম সময় ব্যয় করবে। একইভাবে, একজন মুসলিম যদি এই বিশ্বে তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য আরও বেশি সময় এবং প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে । পরকালের চিরস্থায়ী বাসস্থান তারাও নিছক নির্বোধ। এটা কারো কারো মনোভাব যদিও তারা স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত এবং একটি অজানা দৈর্ঘ্যের জন্য যেখানে তাদের আখেরাতে থাকবে চিরস্থায়ী।

এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাসের নিশ্চিততার অভাবকে নির্দেশ করে এবং তাই যে কেউ এই মানসিকতাকে ভাগ করে তার জন্য ইসলামের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা অত্যাবশ্যকীয় যাতে তারা আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ ছাড়াই তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের সাথে তাদের কবরের জন্য প্রস্তুত করে, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে সে পাবে যে তাদের ভাল কাজগুলি তাদের জন্য স্বস্তি দেয় যেখানে তাদের পুঞ্জীভূত গুনাহগুলি কেবল তাদেরই হবে। অন্ধকার কবরে তাদের অবস্থান আরও খারাপ। তাই একজন মুসলমানের উচিত দুর্বলতার সময় আসার আগেই তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো কাজ করা। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত মূল হাদীসে নির্দেশিত বাস্তবতাকে চিনতে হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে সঠিকভাবে কাজ করা উচিত এমন একটি সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তাদের সৎকাজ করার জন্য আরও সময় দেওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

*"আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু আল্লাহ কখনই কোন আত্মাকে বিলম্ব করবেন না যখন তার সময় এসে যাবে..."*

তাদের এখনই তাদের কাজের প্রতি চিন্তা করা উচিত যাতে তারা আন্তরিকভাবে পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে পারে এবং এমন একটি দিন আসার আগে সৎ কাজ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে পারে যখন চিন্তা করা তাদের উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

*"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"*

প্রত্যেকে তাদের আগে যারা মারা গেছে এবং তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আরও সৎ কাজ করতে তাদের অক্ষমতা নিয়ে চিন্তা করা যাক। এই সময় আসার আগে তাড়াতাড়ি করুন এবং অনিবার্য জন্য প্রস্তুত করুন। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 99:

*"আর তোমার প্রভুর ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত মৃত্যু আসে।"*

# আবু যার গাফারী (রাঃ)- ১৭

আবু যার গাফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, জ্ঞানকে নিজের বালিশ বানানোর চেয়ে অজ্ঞতাকে নিজের বালিশ বানানো উত্তম। ইমাম আবু লাইছ সমরকান্দীর তানবীহুলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে গাফিলীন , সাদ/৩৩৮।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বিখ্যাত বিবৃতি অজ্ঞতা আনন্দ হল বিশেষ করে, ধর্মীয় বিষয় এবং পরকালের ক্ষেত্রে সত্য নয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে যে তারা একটি ইসলামী নিয়ম জানে না বলেই তারা এটা মেনে চলা থেকে অব্যাহতি পায় এবং মহান আল্লাহ তাদের এর জন্য জবাবদিহি করবেন না। এটি একটি নিকৃষ্ট প্রকারের অজ্ঞতা কারণ মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এখানে কোন অজুহাত নেই এবং মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটিকে সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। অজ্ঞতাকে একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত বিশ্বাস করা শয়তানের ফাঁদ। এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই। একটি সরকার যদি এই অজুহাত গ্রহণ না করে তাহলে মহান আল্লাহর কাছে কিভাবে আশা করা যায়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার সাথে সংযুক্ত নিয়মগুলি জানার আশা করা হয়, যেমন একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভার হওয়া, যে ব্যক্তি ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে তার সাথে যুক্ত নিয়মগুলি শেখার জন্য দায়ী। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই অজ্ঞতা পরিহার করতে হবে কারণ এটি তাদের দুনিয়াতে কোন উপকারে আসবে না এবং এটি অবশ্যই তাদের পরকালে সাহায্য করবে না।

# উতবা বিন গাযওয়ান (রাঃ)- ১

উতবা বিন গাজওয়ান, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে মানুষ একটি অস্থায়ী আবাস থেকে চূড়ান্ত এবং স্থায়ী আবাসে চলে যাচ্ছে। অতএব, তারা যা খুঁজে পেতে পারে তার সেরাটি তাদের সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং তাদের যা প্রয়োজন নেই তা ছেড়ে দেওয়া উচিত। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৮৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 7420 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একমাত্র সম্পদ যা প্রকৃতপক্ষে অধিকারী তা তিনটি জিনিসের সাথে যুক্ত।

প্রথমটি হ'ল একজন ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে খাদ্য প্রাপ্তি এবং খাওয়ার জন্য ব্যয় করে। একজন মুসলমানের উচিত খাবারের উপর অতিরিক্ত খরচ না করে, অপচয় বা বাড়াবাড়ি করা, কারণ এটি একটি পাপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

*"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"*

জন্য শুধুমাত্র হালাল খাওয়া অত্যাবশ্যক কারণ সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে যদি তারা হারাম খায় তবে তার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়। যদি কারও প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে তাদের বাকি কাজগুলি কীভাবে আল্লাহ কবুল করতে পারেন, মহিমান্বিত?

পরের জিনিসটি একজন তাদের আসল সম্পদ তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করে। আবার, একজন মুসলমানের উচিত বাড়াবাড়ি এবং অপচয় করা এড়িয়ে চলা, কারণ এই লোকগুলোকে শয়তানের ভাইবোন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

*"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই..."*

একজন মুসলমানের সুন্দর, পরিষ্কার এবং সাধারণ পোশাকে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত কারণ এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে ঈমানের একটি দিক।

একজন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে যে সম্পদের মালিক হয় তা হলো মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক উপায়ে ব্যয় করার মাধ্যমে যা তারা পরকালের জন্য প্রেরণ করে। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহারে, একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে প্রথম দুটি জিনিস ইতিমধ্যেই মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করেছেন, কারণ এগুলি তাদের বিধানের একটি অংশ যা পরিবর্তন করতে পারে না এবং আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। পৃথিবী সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, তাদের উচিত তাদের প্রচেষ্টাকে শেষ দিকের দিকে মনোনিবেশ করা। প্রকৃত অর্থে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করার অন্যান্য সকল প্রকার, একজন ব্যক্তির অন্তর্গত নয় এবং অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে যদিও বিচারের দিনে তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে।

# উতবা বিন গাযওয়ান (রাঃ) -২

উতবা বিন গাজওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, এমন সময় আসবে যখন একজনকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অন্যায় শাসকদের দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৮৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে যখন সাধারণ জনগণ একে অপরের সাথে আর্থিকভাবে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচারী নেতা নিয়োগ করে তাদের শাস্তি দেন। এই নিপীড়নের একটি দিক হলো দুর্নীতি যা সাধারণ জনগণকে চরম দুর্ভোগের কারণ। একই হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হবে যারা তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। আবার, এটি দুর্নীতির একটি দিক যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, যেমন সরকারি কর্মকর্তারা পরিণতির ভয় ছাড়াই অন্যের জিনিসপত্র অবাধে নিয়ে যায়। যখন সাধারণ জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তখন তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা এই আচরণকে সাধারণ জনগণ গ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করে একইভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। এটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ করার সাহস করবে না এবং সাধারণ জনগণ এর পক্ষে দাঁড়াতে পারবে না। এবং পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদিস অনুসারে, সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের প্রভাবশালী পদে লোক নিয়োগ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবেন যারা ন্যায়বিচারে রয়েছেন।

বিশ্বে পরিলক্ষিত ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অন্যকে দোষারোপ করার অপরিপক্ক পথ গ্রহণ না করে মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের আচরণের প্রতি সত্যিকারভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তাদের মনোভাব সামঞ্জস্য করা। তা না হলে সময়ের সাথে সাথে সমাজে দুর্নীতি বাড়বে। কেউ বিশ্বাস করবেন না যে তারা প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে না থাকায় সমাজে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত দুর্নীতি সাধারণ জনগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে ঘটে এবং তাই সাধারণ জনগণের ভালো আচরণের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

*"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."*

# হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রহঃ) - ১

আবু জাহেল একবার মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষতি করেছিল। হামজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যিনি তখনও মুসলিম ছিলেন না, তিনি যখন শুনেছিলেন যে তাঁর ভাই তাদের ভাতিজা, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষতি করেছে তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ফলে তিনি আবু জাহেলকে আক্রমণ করে আহত করেন এবং তারপর প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। যেদিন হামজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিন মুসলমানরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 282-283- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে যখনই তারা এমন কিছুর সম্মুখীন হয় যা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করে, যা শয়তান, নিজের ভিতরের শয়তান এবং অন্যান্য লোকের আকারে আসতে পারে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা। . এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই শত্রুদেরকে খুশি করার জন্য কখনই কাজ করা উচিত নয় যদি এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, কারণ এইভাবে তারা যা কিছু অর্জন করুক না কেন তা উভয় জগতে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা এবং বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। একজনকে দৃঢ়ভাবে মনে রাখা উচিত যে তারা অবিলম্বে তা পালন করুক বা না করুক, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন যে তার আনুগত্য করবে যদিও তা এই শত্রুদের অসন্তুষ্ট করে। অথচ এই শত্রুরা মহান আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করবে না।

সত্যিকার অর্থে মনে রাখা যে একজনকে তাদের প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে যা একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে সাহায্য করতে পারে। এই সাফল্যের একটি উপাদান সর্বদা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এর মধ্যে শুধুমাত্র জিভের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করাই অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে পূর্বে বর্ণিত কাজের মাধ্যমে। এই ব্যবহারিক স্মরণ এইসব শত্রুদের থেকে রক্ষা করবে যারা মুসলমানদেরকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 36:

*"এবং যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার কাছে কোন মন্দ পরামর্শ আসে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর..."*

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, এই আয়াতটি ঘোষণা করে যে একজনকে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত, অনেক অর্থ; তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের উপর আরোপিত সকল দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনটি বেছে নিতে হবে তা নয়। কিংবা মাঝেমধ্যে সেগুলো পূরণ করে অলস হওয়া উচিত নয়। এই মুসলমান এই শত্রুদের থেকে মহান আল্লাহর পূর্ণ সুরক্ষা পাবে না এবং তাই বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে উভয় জগতের সকল পার্থিব ও ধর্মীয় অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার চাবিকাঠি। আলোচ্য মূল আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

# হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রহঃ)-২

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশটি আর প্রয়োগ করা হয়নি। যখন তারা উহুদ পর্বত থেকে নেমে আসে তখন এটি মুসলিম বাহিনীর পিছনের অংশকে উন্মোচিত করে দেয়। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে তিনি নারীদের তাদের পতিত আত্মীয়দের জন্য বিলাপ করতে শুনেছিলেন। যুদ্ধের সময় শহীদ হওয়া তাঁর চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কেউ শোক প্রকাশ না করায় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। তখন এই নারীদেরকে তাদের পুরুষ আত্মীয়রা হামজা (রাঃ) এর জন্য বিলাপ করতে বলেছিল। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এটি চান না এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে তিনি কান্নাকাটি পছন্দ করেন না। এর পর তিনি কান্নাকাটি করতে নিষেধ করলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 66-67-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 3127 নম্বর, সতর্ক করে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে প্রিয়জনকে হারানোর মতো কঠিন সময়ে কান্না করা অনুমোদিত নয়। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায় তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নাতি যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্নার জন্য বা তাদের হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে যদি তারা মহান আল্লাহর পছন্দের ব্যাপারে তাদের অধৈর্যতা প্রদর্শন করে এমন শব্দ উচ্চারণ করে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হারাম জিনিসগুলি হল কান্না, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা দুঃখে মাথা ন্যাড়া করা। যারা এইভাবে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর সতর্কবাণী। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। এইভাবে কাজ করার জন্য একজন

ব্যক্তি শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে যদি মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয় তবে তারাও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 18:

*"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না..."*

# জুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পর জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরিবারের দ্বারা নির্যাতিত ও নির্যাতনের শিকার হন। উদাহরণস্বরূপ, তার চাচা, তাকে একটি খড়ের মাদুরে ঝুলিয়ে রাখতেন এবং তার নীচে জ্বলতে থাকা আগুনের ধোঁয়ায় তাকে শ্বাসরোধ করতেন। জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের উপর অটল ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 298- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

*"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টার [1- এ থাকে যা] আমরা এটিকে সৃষ্টি করার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."*

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলমানের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে

আফসোস করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তান তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে। একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থেই বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না । অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলমানকে বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ তৃপ্তি।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর কাজ করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি অবস্থাই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল বা সন্তুষ্ট আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ও সিদ্ধান্তে, সহজ ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং

উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলমান কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

*"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে*

*পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"*

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে আচরণ করা, যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করবে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তেতো ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জেনে তাদের গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান তাদের যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবেন।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি পর্যালোচনা করা, যা ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে দেওয়া পুরস্কারের বিষয়ে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা একজন মুসলিমকে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সময় অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা

ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের উৎকর্ষ হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

*"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"*

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন একজন কর্তৃত্বশীল

ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবে না যার ভয় ছিল, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

# জুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)-২

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রত্যেক মহানবী (সা.)-এর একজন বিশেষ শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর বিশেষ শিষ্য ছিলেন জুবায়ের বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু। সহীহ বুখারী, 3719 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি এই উচ্চ মর্যাদা লাভের অন্যতম কারণ ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর অগাধ আন্তরিকতা।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

*"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"*

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

*"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."*

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মাদ ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

# জুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) – ৩

জুবায়ের বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু এক সময় ধনী ছিলেন। তার অনেক চাকর ছিল যারা তার ব্যবসা এবং সম্পত্তি থেকে প্রতিদিনের রাজস্ব সংগ্রহ করত। প্রতি রাতে তিনি তার আনা সমস্ত আয় ভাগ করে দিতেন এবং তিনি তার বাড়িতে প্রবেশের আগে দাতব্য কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে বিতরণ করতেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১৮০ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 2336 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। প্রথমটি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে তার জন্য ব্যয় করে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে। দ্বিতীয়টি মহান আল্লাহকে অনুরোধ করে, যে বাধা দেয় তাকে ধ্বংস করতে।

এই হাদিসটির উদ্দেশ্য হল একজনকে উদার হতে এবং কৃপণতা এড়ানোর জন্য উত্সাহিত করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দান-খয়রাতের সাথে জড়িত নয় বরং এর সাথে নিজের প্রয়োজন এবং পরিবারের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করাও অন্তর্ভুক্ত কারণ ইসলাম এটির নির্দেশ দিয়েছে। যে কেউ এই উপাদানগুলিতে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তার সম্পদ ধ্বংস হওয়ার যোগ্য কারণ তারা তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা বাস্তবে সম্পদকে অকেজো করে তোলে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা কখনই সামগ্রিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় না কারণ একজন ব্যক্তিকে এক বা অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত

তিরমিযী, 2029 নম্বর অধ্যায় 34 সাবা, 39 নং আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে দান করার ফলে কারো সম্পদ কমে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

*"...কিন্তু আপনি [তাঁর পথে] যা কিছু ব্যয় করবেন - তিনি তার ক্ষতিপূরণ দেবেন..."*

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে একজন উদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, পরাক্রমশালী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। অথচ কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসটি সমস্ত নিয়ামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন তাদের সুস্বাস্থ্য, শুধু সম্পদ নয়। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাদের নিয়ামতকে সঠিকভাবে উৎসর্গ করতে এবং ব্যয় করতে ব্যর্থ হয়, তবে ফেরেশতার দ্বারা তাদের আশীর্বাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা মহান আল্লাহ কবুল করতে পারেন। তাই, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক, যাতে তারা আরও বেশি করে যা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অন্যথায়, তারা চিরতরে আশীর্বাদ হারাতে পারে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

# জুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)- ৪

জুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তাদের ভালো কাজগুলো গোপন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের তা করা উচিত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কিতাব আয যুহদ , সাদ/১৭৯- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

এই মনোভাব দেখাতে বাধা দেয়।

সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে সামান্য প্রদর্শন করাও শিরক।

এটি একটি ছোট ধরনের শিরক যার কারণে কারো ঈমান নষ্ট হয় না। পরিবর্তে এটি সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এই মুসলিম লোকদের খুশি করার জন্য কাজ করেছিল যখন তাদের উচিত ছিল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে এই লোকদের বলা হবে যে তারা তাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাও, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

যদি শয়তান কাউকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে না পারে তবে সে তাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করার চেষ্টা করবে যার ফলে তাদের পুরস্কার নষ্ট হবে। যদি

তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে কলুষিত করতে না পারেন তবে তিনি সূক্ষ্ম উপায়ে এটিকে কলুষিত করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে রয়েছে যখন লোকেরা সূক্ষ্মভাবে অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি প্রদর্শন করে। কখনও কখনও এটি এতই সূক্ষ্ম হয় যে ব্যক্তি নিজেই তারা কী করছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। যেহেতু জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা সকলের জন্য কর্তব্য, সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, দাবী করা অজ্ঞতাকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহ কবুল করবেন না।

সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শন প্রায়ই সামাজিক মিডিয়া এবং একজনের বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম অন্যদেরকে জানাতে পারে যে তারা রোজা রাখছে যদিও কেউ তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করে যে তারা রোজা রাখছে কিনা। আরেকটি উদাহরণ হল যখন কেউ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে স্মৃতি থেকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে যাতে অন্যদের দেখায় যে তারা পবিত্র কোরআন মুখস্ত করেছে। এমনকি প্রকাশ্যে নিজের সমালোচনা করাকেও অন্যের কাছে নম্রতা দেখানো বলে বিবেচিত হতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, সূক্ষ্মভাবে দেখানো একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করে এবং তাদের সৎ কাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। এটা শুধুমাত্র ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে সম্ভব, যেমন একজনের কথাবার্তা কিভাবে রক্ষা করা যায়।

# আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)- ১

উত্তর আফ্রিকা অভিযানের সময়, একটি মুসলিম সেনাবাহিনী তার আকারের 8-10 গুণ একটি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল। মুসলিম সৈন্যরা শত্রু সৈন্যদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হলে, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রু রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে রাজা নিহত হন। শত্রু সেনারা এটা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেকেই পালিয়ে যায়। এটি মুসলমানদের তাদের পরাস্ত করতে এবং বিজয় অর্জন করতে দেয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 292-293- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের অভ্যন্তরীণ শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে।

একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

*"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."*

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

# বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পর, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মালিকের দ্বারা নির্যাতিত ও নির্যাতনের শিকার হন। উদাহরণস্বরূপ, তার মালিক তাকে জ্বলন্ত বালির উপর শুয়ে থাকতে বাধ্য করবে এবং তার বুকের উপরে একটি বোল্ডার রাখবে যাতে সে গরম বালিতে পুড়ে যায় এবং বোল্ডারের দ্বারা দম বন্ধ হয়ে যায়। বিলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের উপর অটল ছিলেন। অবশেষে, হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর স্বাধীনতা ক্রয় করেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 299-300- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝার গুরুত্বের উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি অসুবিধা সহজে অনুসরণ করা হবে। এই বাস্তবতাটি পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, তালাকের অধ্যায় 65, আয়াত 7:

*"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ স্বস্তি] আনবেন।"*

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয়ে অনিশ্চিত হওয়া একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি বেআইনি জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে,

যেমন বেআইনি বিধান। কিন্তু যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে সহজে প্রতিস্থাপিত হবে, তিনি ধৈর্য সহকারে ইসলামের শিক্ষার উপর আস্থা রেখে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 146:

*"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"*

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এমন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহানবী নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে মহাকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিভাবে মহান আল্লাহ তাকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 76:

*"আর [উল্লেখ করুন] নূহ, যখন তিনি [আল্লাহর কাছে] ডাকেন [সেই সময়ের আগে], অতঃপর আমরা তাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারকে মহা বিপদ [অর্থাৎ বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"*

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 69:

*“আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ্] বললাম, হে আগুন, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।*

মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) একটি বড় আগুনের আকারে একটি বড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এটিকে শীতল ও শান্তিময় করে দিয়েছিলেন।

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেকগুলি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে কঠিন সময়ের একটি মুহূর্ত অবশেষে তাদের জন্য সহজ হবে যারা আল্লাহর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ যে অগণিত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য, যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। মহান আল্লাহ যদি তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত বড় অসুবিধা থেকে রক্ষা করেন তবে তিনি ছোট ছোট অসুবিধার সম্মুখীন আজ্ঞাবহ মুসলমানদেরকেও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

# বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)-২

স্বর্গীয় যাত্রার সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন ব্যক্তিকে না দেখে জান্নাতে পূর্বের পদধ্বনি শুনেছিলেন। যখন তিনি ফেরেশতা জিবরীল (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাকে বললেন যে তিনি ছিলেন বিলাল বিন রাবাহ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩২৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা জরুরী, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং আমল করার সুযোগের মাধ্যমে একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে সম্ভব। এই বোধগম্যতা একজনকে অহংকার গ্রহণ করতে বাধা দেয় যা এড়াতে অত্যাবশ্যক কারণ একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি পরমাণুর মূল্যের অহংকার প্রয়োজন। সহীহ মুসলিমের ২৬৭ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহর এই রহমত, সৎকর্মের আকারে প্রকৃতপক্ষে একটি আলো যা একজনকে এই পৃথিবীতে সংগ্রহ করতে হবে যদি তারা পরকালে একটি পথনির্দেশক আলো পেতে চায়। একজন মুসলিম যদি গাফিলতিতে জীবনযাপন করে এবং মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে দুনিয়াতে এই আলো সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তারা পরকালে এই পথনির্দেশক আলো পাওয়ার আশা করবে কিভাবে?

সমস্ত মুসলমান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে জান্নাতে বাস করতে চায়। কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধুমাত্র কর্ম ছাড়াই এই কামনা করলে তা বাস্তবে পরিণত হবে না অন্যথায় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাদের উপর সন্তুষ্ট হতেন। সহজ কথায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হবে, আখেরাতে তারা ততই তাঁর নিকটবর্তী হবে।

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল শারীরিকভাবে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করা, যা সহীহ বুখারি, 7436 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। যদি কোনো মুসলমান এই অকল্পনীয় নেয়ামত পেতে চায় তাহলে তাদের অবশ্যই একটি হাদিসে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বের স্তর অর্জনের জন্য বাস্তবিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। সহীহ মুসলিম, 99 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি হল যখন একজন ব্যক্তি কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা তাদের উপেক্ষা করে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি একজনের অবিচল ও আন্তরিক আনুগত্য নিশ্চিত করে। আশা করা যায় যে, যে ঈমানের এই স্তরের জন্য চেষ্টা করবে সে পরকালে মহান আল্লাহকে শারীরিকভাবে পালন করার বরকত পাবে।

# বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ) – ৩

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশাল মুসলিম বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিল, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তারা সেদিন মক্কা জয় করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহর গৃহ, কাবা ঘরের ছাদ থেকে নামাযের আযান ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 411-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ইথিওপিয়ান এবং প্রাক্তন ক্রীতদাস ছিলেন এবং সেই কারণে সেই সময়ের সমাজ অনুসারে তাকে নীচ ও তুচ্ছ বলে গণ্য করা হত। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজেই এমন কাউকে দিতে পারতেন যাকে সে সময়ের সমাজে সম্মানিত বলে মনে করা হতো নামাযের আযান ঘোষণা করার জন্য কিন্তু তিনি বিশেষভাবে বিলালকে বেছে নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের

অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

# বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)- ৪

সিরিয়া অভিযানের সময়, মুসলিম সেনাদের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল কারণ তাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ফলস্বরূপ, খলিফা, আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, স্বেচ্ছাসেবকদের তাদের সাথে যোগদানের জন্য বলেছিলেন এবং সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হুদাইম (রা.) এর নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করা হয়েছিল । নামাযের মূল আহবানকারী বিলাল, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হলেন, এই বাহিনী নিয়ে চলে যাওয়ার অনুমতির জন্য। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি তাঁর প্রবল ভালোবাসার কারণে তাঁকে যেতে দিতে নারাজ, কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। আবু বক্কর চলে যাওয়ার আগে, বিলাল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বদা ভাল কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ তারা এই পৃথিবীতে তার জীবিকা হবে এবং তার মৃত্যুর পরে একটি উত্তম প্রতিদানের দিকে নিয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬৫৫-৬৫৬-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সৎকর্মের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। যে এগুলি করবে সে কেবল এই দুনিয়াতেই শান্তি ও সাফল্য পাবে না বরং তারা এই পার্থিব নিয়ামতগুলিকে চিরস্থায়ী পুরস্কারের আকারে পরকালে নিয়ে যাবে। কিন্তু যারা তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করে তারা দুনিয়াতে শান্তি লাভ করতে পারবে না এবং এই পার্থিব নেয়ামতগুলো তাদের কবরে পৌঁছে তাদের পরিত্যাগ করবে।

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ হল যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে তার সম্পদ। উত্তরাধিকারী

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায় তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা নিয়ামতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে সে বিচারের দিন খালি হাতে থাকবে। অথবা তাদের উত্তরাধিকারী নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যা নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে শিক্ষা না দেয়, তাহলে দোয়াগুলোকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি একটি কর্তব্য। তাদের উপর এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা হাশরের দিনে খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে।

# আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পর আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মালিকের দ্বারা নির্যাতিত ও নির্যাতনের শিকার হন। তাকে এতটাই নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল যে নিজেকে এর থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে অবিশ্বাসের শব্দ উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। যখন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। যখন আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তখন তাঁর হৃদয় বিশ্বাসের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন তখন মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন যে তার কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে যদি এর অর্থ তার জীবন রক্ষা করা হয়। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 302- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তার উদাহরণের মাধ্যমে, মহান আল্লাহ, অনুরূপ কষ্টের সম্মুখীন লোকদের সহজ এবং ছাড় দিয়েছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি ইসলামের সহজ প্রকৃতি নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারি, 39 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ধর্ম সহজ এবং সোজা। এবং একজন মুসলমানের নিজের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো উচিত নয় কারণ তারা এটি মেনে চলতে সক্ষম হবে না।

এর অর্থ হল একজন মুসলমানকে সর্বদা একটি সহজ ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন যাপন করা উচিত। ইসলাম মুসলমানদেরকে সৎকর্ম সম্পাদনে নিজেদের অতিরিক্ত বোঝার দাবি করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সরলতার শিক্ষা দেয় যা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। একজন মুসলমানের উচিত সর্বপ্রথম তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা যা নিঃসন্দেহে তার শক্তির মধ্যে রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ করার জন্য একজন মুসলমানকে তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। পবিত্র কুরআনের 286 নং আয়াতে আল বাকারাহ 2 অধ্যায়ে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে:

*"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."*

পরবর্তীতে, তাদের উচিত তাদের দিনের কিছু সময় ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য বের করা যাতে তারা তাদের শক্তি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর আমল করতে পারে। এটি মহান আল্লাহর প্রেমকে আকর্ষণ করে, যা সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যদি একজন মুসলমান এই আচরণে অবিচল থাকে তবে তাদের এমন করুণা প্রদান করা হবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই এই বিশ্বের বৈধ আনন্দ উপভোগ করার সময় পাবে।

এভাবেই একজন মুসলিম নিজের জন্য সহজ করে তোলে। এবং যদি তাদের উপর নির্ভরশীল থাকে, যেমন শিশু, তাহলে তাদের উচিত তাদের একই শিক্ষা দেওয়া, যাতে তাদের জন্য জিনিসগুলিও সহজ হয়। নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া জিনিসগুলিকে কঠিন করে তোলে এবং একজনকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে পারে। এবং অত্যধিক শিথিল করা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তুলবে কারণ অলসতার মাধ্যমে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত হারাবে।

# আম্মার বিন ইয়াসির (রহঃ)- ২

আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করেছিলেন। ফিরে এসে তিনি মন্তব্য করেন যে, তিনি বিস্মিত হয়েছেন যে, পার্থিব ভোগ-বিলাস অর্জন করা ছাড়া মানুষের আর কোনো আগ্রহ নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিয়েছিলেন যে এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় ভবিষ্যতে এমন লোক হবে যারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং এখনও পার্থিব ভোগ-বিলাস অর্জন ও উপভোগ করা ছাড়া আর কোন আগ্রহ রাখে না। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 238- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে তাদের কামনা-বাসনা এবং অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এবং এটি তাদের জন্য নির্দেশিত যারা অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসগুলিকে এমনভাবে অনুসরণ করে যে এটি তাদের সঠিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে অবহেলা করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পরকাল এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা পায় না তখন তারা তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

*“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"*

মুসলমানদের বরং ধৈর্য্য ও সন্তুষ্ট থাকতে শেখা উচিত তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের ঐশ্বর্য। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি হল অভাবী অর্থ, দরিদ্র যদিও তার কাছে অনেক সম্পদ আছে। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে জানা, মহান, মানুষকে তাদের জন্য সর্বোত্তম কী দান করেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

*“আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"*

# আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) – ৩

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন যে তিনি একবার মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিলেন যে, আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি ঈমানে পরিপূর্ণ ছিলেন। অস্থি মজ্জা। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 290 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঈমানের নিশ্চয়তা অবলম্বন করা জরুরী কারণ ঈমানের দুর্বলতা পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথে বড় বাধা হল ঈমানের দুর্বলতা। এটি একটি দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়, যেমন নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া, অন্যকে ভয় করা, মানুষের আনুগত্যকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপরে রাখা, এর জন্য চেষ্টা না করে ক্ষমার আশা করা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত। বৈশিষ্ট্য ঈমানের দূর্বলতার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হল যে এটি একজনকে পাপ করতে দেয়, যেমন ফরজ কর্তব্যে অবহেলা করা। ঈমানের দুর্বলতার মূল কারণ ইসলামের অজ্ঞতা।

ঈমানকে মজবুত করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। সময়ের সাথে সাথে তারা অবশেষে বিশ্বাসের নিশ্চিততায় পৌঁছে যাবে যা এত শক্তিশালী যে এটি একজন ব্যক্তিকে সমস্ত পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দায়িত্ব পালন করে। পবিত্র

কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস অধ্যয়ন করলে এই জ্ঞান পাওয়া যায়। বিশেষ করে, যে শিক্ষাগুলো আনুগত্যকারীদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং যারা মহান আল্লাহর অবাধ্য তাদের জন্য শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করে। এটি একজন মুসলমানের হৃদয়ে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের আশা তৈরি করে যা মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে একটি টান এবং ধাক্কা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মতো কাজ করে।

স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টির উপর প্রতিফলন করে কেউ তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে। সঠিকভাবে করা হলে এটি স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ব, মহান এবং তাঁর অসীম ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মুসলমান রাত ও দিন নিয়ে চিন্তা করে এবং তারা কতটা নিখুঁতভাবে সুসংগত হয় এবং তাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য জিনিসগুলি তারা সত্যই বিশ্বাস করবে যে এটি কোনও এলোমেলো জিনিস নয় যার অর্থ, এমন একটি শক্তি রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে সবকিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে। এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। উপরন্তু, যদি কেউ রাত এবং দিনের নিখুঁত সময় নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। একাধিক ঈশ্বর থাকলে প্রত্যেক ঈশ্বরই রাত ও দিন তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটতে চান। এটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ একজন ঈশ্বর সূর্যের উদয় হতে চাইতে পারেন যেখানে অন্য ঈশ্বর রাত্রি অব্যাহত রাখতে চান। মহাবিশ্বের মধ্যে

পাওয়া নিখুঁত নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, নাম আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

*"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."*

আরেকটি জিনিস যা একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে তা হল সৎকর্মে অবিচল থাকা এবং সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকা। বিশ্বাস যেহেতু কর্ম দ্বারা সমর্থিত বিশ্বাস তাই পাপ সংঘটিত হলে এটি দুর্বল হয়ে যায় এবং যখন ভাল কাজ করা হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে আন নাসাই, 5662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমান যখন মদ পান করে তখন সে বিশ্বাসী হয় না।

## আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) – ৪

আম্মার বিন ইয়াসির, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে উপদেশদাতা হিসাবে মৃত্যুই যথেষ্ট। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, সাদ/219।

মৃত্যু এমন একটি জিনিস যা ঘটবে নিশ্চিত কিন্তু সময়টি অজানা তাই এটি বোধগম্য হয় যে একজন মুসলিম যে পরকালে বিশ্বাস করে সে তার জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় যা ঘটতে পারে না, যেমন বিয়ে, সন্তান বা তাদের অবসর গ্রহণ। এটা আশ্চর্যজনক যে কত মুসলমান বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে যদিও তারা সাক্ষ্য দেয় যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত অথচ আখেরাত চিরস্থায়ী এবং তারা সেখানে পৌঁছানো নিশ্চিত। কেউ যেভাবে আচরণ করুক না কেন তাদের কাজের ব্যাপারে তাদের বিচার করা হবে। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা ভবিষ্যতে পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে পারে এবং করবে কারণ এই মনোভাব তাদের মৃত্যু ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত তাদের আরও বিলম্বিত করে এবং তারা অনুশোচনা নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় যা তাদের সাহায্য করবে না।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে মানুষ মারা যাবে কারণ এটি অনিবার্য, তবে মূল বিষয় হল এমনভাবে কাজ করা যাতে কেউ এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। এর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ঘটতে না পারে এমন জিনিসগুলির জন্য প্রস্তুতির চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় ।

# আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) – ৫

আম্মার বিন ইয়াসির, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে দৃঢ় বিশ্বাসই তৃপ্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, সাদ/219।

সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে সমস্ত প্রাণীর জন্য সমস্ত কিছু যেমন রিযিক বরাদ্দ করেছিলেন। এবং পৃথিবী।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত অবস্থার ক্ষেত্রে দুটি দিক রয়েছে, যেমন একজনের রিজিক লাভ করা। প্রথম দিকটি হল, মহান আল্লাহ যা অর্থ, ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন; এটি ঘটবে এবং সৃষ্টির কিছুই এটি ঘটতে বাধা দিতে পারে না। যেহেতু এটি একজন ব্যক্তির হাতের বাইরে তাই এই দিকটির উপর চাপ দেওয়ার কোন মানে হয় না কারণ তারা বা অন্য কেউ যাই করুক না কেন নিয়তির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই।

দ্বিতীয় দিকটি হল নিজের প্রচেষ্টা। এই দিকটির উপর একজন ব্যক্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তাই তাদের উচিত এই দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যে উপায়গুলি তাদের দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে তাদের শারীরিক শক্তি যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। মহানবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য, যার ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এর মধ্যে রয়েছে হারাম, অতিরিক্ত, অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য হালাল রিজিক অর্জনের চেষ্টা করা।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের কখনই এমন জিনিসের উপর চাপ দিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয় যেগুলির উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব নেই, বরং তাদের নিজেদের হাতে থাকা উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা জিনিসগুলির উপর কাজ করা উচিত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাই নির্দেশ দিয়েছেন।

# আম্মার বিন ইয়াসির (রহঃ)- ৬

আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, ইবাদতই মানুষকে ব্যস্ত রাখার জন্য যথেষ্ট। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, সাদ/219।

জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না তারা সেসব বিষয় এড়িয়ে চলে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই হাদিসটিতে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এতে একজন ব্যক্তির বক্তৃতা এবং সেইসাথে তাদের অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ হল যে একজন মুসলমান যে তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে চায় সেগুলিকে অবশ্যই কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে, যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এবং পরিবর্তে তাদের অবশ্যই সেই জিনিসগুলির সাথে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে যা করে। যে বিষয়গুলো তাদের উদ্বেগজনক তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সাথে যে দায়িত্ব পালন করা হয় তা পালন করার চেষ্টা করা উচিত একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে কেউ যদি তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দেয় সে সেসব এড়িয়ে চলে যা ইসলাম পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, একজনকে তাদের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, সমস্ত পাপ

এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে হবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি তখনই যখন কেউ মহান আল্লাহকে পালন করে এবং উপাসনা করে, যেন তারা তাকে পালন করতে পারে বা অন্ততপক্ষে তারা আল্লাহ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়। , মহিমান্বিত, তাদের প্রতিটি চিন্তা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ. এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন হওয়া একজন মুসলমানকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করবে। যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে না, সে এ শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাতে পারবে না।

একজন ব্যক্তিকে উদ্বেগজনক নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক বক্তৃতার সাথে যুক্ত। অধিকাংশ গুনাহ তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। নিরর্থক কথা বলার সংজ্ঞা হল যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা পাপপূর্ণ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের উদ্বেগের বিষয় নয়। সহীহ বুখারি, 2408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অনর্থক কথাবার্তা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অগণিত তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতি হয়েছে কেবল এই কারণে যে কেউ এমন কিছু কথা বলেছে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিয়ে শেষ হয়েছে কারণ কেউ তাদের ব্যবসায় কিছু মনে করেনি। এ কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন ধরনের উপকারী কথাবার্তার পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তা করা উচিত। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

*"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।*

প্রকৃতপক্ষে, এমন শব্দ উচ্চারণ করা যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয়, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত বক্তৃতা গণনা করা হবে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদি না এটি ভাল উপদেশ, মন্দ নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে যুক্ত হয়। এর মানে হল যে অন্য সব ধরনের বক্তৃতা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ তারা তাদের উপকার করবে না। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভালো উপদেশ দেওয়া এমন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজনের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তারা পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের জন্য উদ্বেগজনক নয় যাতে তারা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারে। সহজ করে বললে, যে ব্যক্তি সেসব বিষয়ের জন্য সময় উৎসর্গ করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, সে তাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে। এবং যে ব্যক্তি তাদের উদ্বেগজনক জিনিসগুলির সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে যে বিষয়গুলিকে চিন্তা করে না সেগুলি ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর রহমতে উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করবে।

# আম্মার বিন ইয়াসির (রহঃ) – ৭

আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যখন একজন মুসলমানকে পরীক্ষা করা হয়, তখন এটি তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ইমাম ইবনে আবদুল মালিক আল হিন্দির কানয আল উম্মাল 3/745- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 492 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানকে তার আকার নির্বিশেষে কোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না, যেমন ছিদ্র করা। একটি কাঁটা, বা কোনো মানসিক অসুবিধা, যেমন চাপ, মহান আল্লাহ ছাড়া, এটি কারণে তাদের পাপ মুছে ফেলা হয়.

এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। এই পরিণতি ঘটে যখন একজন মুসলমান কষ্টের শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক লোক বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে অভিযোগ করতে পারে এবং পরে ধৈর্য দেখায়। এটি সত্য ধৈর্য নয় বরং এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা যা সময়ের সাথে সাথে ঘটে। সুনানে আন নাসাই, 1870 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে সারা জীবন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে কারণ একজন ব্যক্তি অধৈর্যতা দেখিয়ে তার পুরস্কার নষ্ট করতে পারে।

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, তাদের ছোটখাট পাপগুলোকে এই অসুবিধার মধ্য দিয়ে মুছে ফেলার পর বিচার দিবসে পৌঁছানো অনেক ভালো। একজন মুসলমানের উচিত ক্রমাগত অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের ছোটখাটো পাপ মোচন করার জন্য সৎ কাজ করার চেষ্টা করা। এবং যদি তারা কোন শারীরিক বা মানসিক অসুবিধার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত তাদের ছোটখাট পাপ মুছে ফেলার এবং একটি অগণিত পুরস্কার পাওয়ার আশায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

# আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) – ৮

আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যখন একজন অমুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তারা একটি উটের মতো হয় যেটিকে তার মালিক বেঁধে রাখে অথচ সে জানে না কেন তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এবং যখন এটি খোলা হয়, কেন এটি খোলা হয়েছে তা জানে না। ইমাম ইবনে আবদুল মালিক আল হিন্দির কানয আল উম্মাল 3/745- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের জন্য একটি মূল সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মানুষ এই প্রজ্ঞা অবিলম্বে পালন না করলেও বিজ্ঞ কারণ ছাড়া সৃষ্টির কিছুই ঘটে না। একজন মুসলমানের উচিত যা কিছু ঘটে, সেগুলি সহজে হোক বা অসুবিধার সময়ে হোক, বোতলের বার্তা হিসাবে। বোতলটির মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের খুব বেশি ধরা পড়া উচিত নয় কারণ এটি নিছক একটি বার্তাবাহক যা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করে। এটি তখন ঘটে যখন মুসলমানরা হয় ভাল জিনিসের জন্য উল্লাস করে যা ঘটে থাকে যার ফলে ভাল জিনিসের মধ্যে বার্তার প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। অথবা তারা অসুবিধার সময় শোকাহত হয় যার ফলে অসুবিধার মধ্যে বার্তাটি বুঝতে খুব বেশি বিভ্রান্ত হয়। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের উপদেশ অনুসরণে মনোনিবেশ করা এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রতিটি পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগ করা। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 23:

*"যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তাতে উল্লাসিত না হন..."*

এই আয়াতটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হতে নিষেধ করে না কারণ এটি মানব প্রকৃতির একটি অংশ। কিন্তু এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির পরামর্শ দেয় যার মাধ্যমে কেউ চরম আবেগ এড়িয়ে চলে যেমন, উল্লাস যা অত্যধিক সুখ বা দুঃখ যা অত্যধিক দুঃখ। এই ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা একজনকে তাদের মনকে বোতলের অভ্যন্তরে আরও গুরুত্বপূর্ণ বার্তার উপর ফোকাস করার অনুমতি দেবে, পরিস্থিতির ভিতরে তা স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার পরিস্থিতি। লুকানো বার্তা মূল্যায়ন, বোঝা এবং কাজ করার মাধ্যমে একজন মুসলমান তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় জীবনকে আরও উন্নত করতে পারে। কখনও কখনও বার্তাটি তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি জাগরণ কল হবে। কখনও কখনও এটি তাদের পদমর্যাদা বাড়ানোর একটি উপায় হবে। অন্য সময় তাদের পাপ মুছে ফেলার একটি উপায় এবং কখনও কখনও একটি অনুস্মারক যাতে নিজেকে সাময়িক বস্তুগত জগতে এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলির সাথে সংযুক্ত না করা হয়। এই মূল্যায়ন ব্যতীত একজন ব্যক্তি তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনের উন্নতি না করে নিছক ঘটনার মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে।

# উসমান বিন মাদউন (রাঃ)- ১

মক্কায়, কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাদের উপজাতীয় অনুষঙ্গের কারণে অমুসলিমদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাদের একজন, যিনি অমুসলিমদের একজন নেতা ওয়ালিদ বিন মুগিরার সুরক্ষা পেয়েছিলেন । একবার, উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খারাপ লেগেছিল যে তিনি একজন মুশরিক দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন যখন তাঁর মুসলিম ভাই ও বোনেরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্যাতিত হচ্ছিল। ফলস্বরূপ, তিনি প্রকাশ্যে ওয়ালিদ তাকে যে সুরক্ষা দিয়েছিলেন তা অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি একজন অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং এর ফলে তার চোখ আহত হয়। ওয়ালিদ তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে এই আঘাতটি ঘটত না যদি সে তাকে প্রসারিত সুরক্ষা থেকে অব্যাহতি না দেয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহর পথে আঘাত পেয়ে খুশি হয়েছিলেন এবং এখন ওয়ালিদের চেয়েও বেশি সম্মানিত ও ক্ষমতাবানের আশ্রয়ে ছিলেন, অর্থাত্ আল্লাহ। উচ্চাভিলাষী। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 310-311- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে হেফাজত করেন এবং সংরক্ষণ করেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তাদের যত্ন নেন। তিনি শয়তানের চক্রান্ত এবং ফাঁদ থেকে আনুগত্যকারীদের রক্ষা করেন এবং তিনি অবাধ্যদেরকে তার তাৎক্ষণিক শাস্তি থেকে রক্ষা করেন যাতে তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

একজন মুসলমানের উচিত এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা উচিত তাদের দেওয়া উপায়গুলি ব্যবহার করে আল্লাহ, মহান, কিন্তু সর্বদা তাঁর ঐশ্বরিক যত্ন এবং পছন্দের উপর আস্থা রাখুন যে কোনও পরিস্থিতিতে এবং ফলাফলের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তারা কিছু পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করলেও। এটি ধৈর্য এবং এমনকি মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে সন্তুষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

*"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."*

একজন মুসলমানের এটাও বোঝা উচিত যে তারা কেবলমাত্র অভিভাবক অর্থাৎ মহান আল্লাহ দ্বারা বিভ্রান্তি ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। এটি অহংকারের যেকোনো লক্ষণকে দূর করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সুরক্ষা খোঁজে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আস্থা যেমন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে তাদের আশীর্বাদ রক্ষা করে। তাদের উচিত তাদের কাজ ও কথাবার্তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে আরও আশীর্বাদ পাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

# উসমান বিন মাধূন (রাঃ)-২

মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার মন্তব্য করেছিলেন যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 567-568- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2458 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের বিনয় দেখানোর মধ্যে রয়েছে মাথার হেফাজত করা এবং এতে যা আছে এবং পাকস্থলী রক্ষা করা। এটা ধারণ করে এবং প্রায়ই মৃত্যু মনে রাখা. তিনি এই ঘোষণা দিয়ে উপসংহারে এসেছিলেন যে যে ব্যক্তি পরকালের সন্ধান করতে চায় তাকে জড় জগতের শোভা ত্যাগ করতে হবে।

এই হাদিস প্রমাণ করে যে শালীনতা এমন একটি জিনিস যা পোশাকের বাইরেও বিস্তৃত। এটি এমন কিছু যা একজনের জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। মাথার সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে জিহ্বা, চোখ, কান এমনকি পাপ ও নিরর্থক জিনিস থেকে চিন্তাকে হেফাজত করা। যদিও তারা যা বলে এবং যা দেখে তা অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসব লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই শরীরের এই অংশগুলোকে রক্ষা করা সত্যিকারের বিনয়ের লক্ষণ।

পেট হেফাজত করার অর্থ হল হারাম সম্পদ ও খাদ্য পরিহার করা। এর ফলে কারো ভালো কাজ প্রত্যাখ্যান হবে। এটি সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, বিনয়ের মধ্যে রয়েছে এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে রয়েছে বস্তুগত জগত থেকে গ্রহণ করা যাতে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি করা হয় না কারণ এগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

*"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"*

যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছে এবং পরিমিতভাবে দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে।

# উসমান বিন মাদউন (রাঃ) – ৩

উসমান বিন মাদউন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু হলে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কপালে চুম্বন করেন এবং মন্তব্য করেন যে তিনি তাঁর বিশ্বাসে সত্য ছিলেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 211 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

*"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."*

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

*"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"*

# উসমান বিন মাধউন (রাঃ) – ৪

হযরত উসমান বিন মাদউন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইন্তেকাল করেন, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কপালে চুম্বন করেন এবং মন্তব্য করেন যে, তিনি এই দুনিয়া থেকে কিছুই নেননি এবং দুনিয়া থেকে কিছু গ্রহণ করতেও সফল হয়নি। তাকে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 211 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুগত জগত যা থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তা আসলে একজনের ইচ্ছাকে বোঝায়। এটি পাহাড়ের মতো ভৌত জগতের উল্লেখ করে না। এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 14 নং আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে:

*"মানুষের জন্য শোভিত হল সেই ভালবাসা যা তারা কামনা করে - নারী ও পুত্রের, সোনা ও রৌপ্যের স্তূপ, সূক্ষ্ম দানাদার ঘোড়া এবং গবাদি পশু এবং চাষের জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন [অর্থাৎ জান্নাত]।*

এই জিনিসগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা মানুষ পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত হয়। যখন কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে তখন তারা বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণেই একজন মুসলিম যার কাছে পার্থিব জিনিস নেই, তাকে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কারণে দুনিয়াবী মানুষ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অথচ,

একজন মুসলমান যে জাগতিক জিনিসের অধিকারী, কিছু ধার্মিক পূর্বসূরিদের মতো, তাকে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ তারা তাদের মন, হৃদয় এবং কাজগুলি তাদের সাথে কামনা করে না এবং দখল করে না। পরিবর্তে তারা চিরন্তন পরকালে মিথ্যা কামনা করে।

বিরত থাকার প্রথম স্তর হল অবৈধ ও অসার কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরে যাওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করার সময় তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। তারা এমন জিনিস এবং লোকদের থেকে দূরে সরে যায় যারা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পূরণ করতে বাধা দেয়।

পরিহারের পরবর্তী পর্যায় হল যখন কেউ তার প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তারা এমন কিছুতে তাদের সময় ব্যয় করে না যা তাদের পরবর্তী জগতে লাভবান হবে না। সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একজন মুসলমানকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মানুষই তাদের গন্তব্য অর্থাৎ পরকাল নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করবে। তাদের মৃত্যু এবং পরকালের গমন কতটা নিকটবর্তী তা বোঝার মাধ্যমে একজন মুসলমান এটি অর্জন করতে পারে। মৃত্যু যে কোন সময় একজন ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা নয়, একজন দীর্ঘ জীবন যাপন করলেও মনে হয় যেন তা এক মুহূর্তে চলে যায়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে একজন ব্যক্তি চিরন্তন পরকালের জন্য মুহূর্তটি উৎসর্গ করে। এই জড়জগতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করা তাদেরকে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। যে দীর্ঘায়ু কামনা করে সে বিপরীত আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।

বস্তুজগতে যিনি সত্যিকার অর্থে বর্জন করেন, তিনি একে দোষ দেন না, প্রশংসা করেন না। তারা যখন এটি লাভ করে তখন তারা আনন্দ করে না এবং যখন এটি তাদের অতিক্রম করে তখন তারা দুঃখিত হয় না। এই ধার্মিক মুসলমানের মন লোভের সাথে ক্ষুদ্র বস্তুজগতকে লক্ষ্য করার জন্য চিরন্তন পরকালের দিকে নিবদ্ধ।

বিরত থাকা বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। কিছু মুসলমান তাদের হৃদয়কে সমস্ত নিরর্থক ও অকেজো পেশা থেকে মুক্ত করার জন্য বিরত থাকে যাতে তারা মহান আল্লাহকে আনুগত্যে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করতে পারে এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 257 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় , যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব বিষয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যে শুধু পার্থিব বিষয় নিয়েই চিন্তিত সে তাদের যন্ত্রের কাছে চলে যাবে এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের আধিক্য, যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে ছুটবে, সে দেখতে পাবে যে তাদের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব এই যে, এটি তাদের মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে। এটি এখনও সত্য এমনকি যদি একজন ব্যক্তি বস্তুজগতের অতিরিক্ত দিকগুলির সাধনায় কোনও পাপ না করে।

কেউ কেউ বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা হালকা করার জন্য দুনিয়া থেকে বিরত থাকে। একজনের কাছে যত বেশি সম্পত্তি থাকবে তত বেশি তাদের জবাবদিহি করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা যাদের ক্রিয়াকলাপ যাচাই-বাছাই করবেন, বিচারের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারি, ৬৫৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনের জবাবদিহিতা যত কম হবে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা তত কম। এ কারণেই

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অধিকারী তারা কিয়ামতের দিনে খুব কম কল্যাণের অধিকারী হবে যারা উৎসর্গ করে। তাদের মাল ও সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কিন্তু এগুলো সংখ্যায় অল্প। এই দীর্ঘ জবাবদিহিতার কারণেই বিচারের দিন ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিই কামনা করবে যে, পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের প্রতিদিনের রিজিক দেওয়া হয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4140 নম্বরে পাওয়া হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু মুসলমান জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার জন্য এই জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে যা এই জড় জগতের আনন্দকে হারাতে হবে।

কেউ কেউ জাহান্নামের ভয়ে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে। তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে এই জড় জগতের আধিক্যে কেউ যত বেশি লিপ্ত হয়, ততই তারা হারামের কাছাকাছি থাকে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজা, 4215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ধার্মিক হবে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু থেকে বিরত থাকে যা পাপ নয় এই ভয়ে যে এটি পাপ হতে পারে।

সর্বোত্তম স্তরের বিরত থাকা হল মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে যা চান তা বোঝা এবং তার উপর কাজ করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যথা, মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করা, জেনে রাখা যে তাদের রব বস্তুজগতকে পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ এই জড় জগতের

বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছেন এবং এর মূল্যকে তুচ্ছ করেছেন। এই ধার্মিক বান্দারা লজ্জিত হয়েছিল যে তাদের রব তাদের এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখবেন যা তিনি অপছন্দ করেন। এরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা যেহেতু তারা শুধুমাত্র তাদের পালনকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এমনকি যখন তাদের এই দুনিয়ার বৈধ বিলাসিতা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যদিও তাকে পৃথিবীর ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল। সহীহ বুখারী, ৬৫৯০ নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটিই চান। মহান আল্লাহ যেমন জড়জগৎকে অপছন্দ করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিভাবে একজন প্রকৃত বান্দা তাদের পালনকর্তা যা অপছন্দ করেন তাকে ভালবাসতে পারে এবং লিপ্ত হতে পারে?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দারিদ্র্যকে বেছে নিয়ে দরিদ্রদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ধনীদেরকে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি সহজে বিকল্পটি বেছে নিতে পারতেন এবং কার্যত ধনীদের দেখিয়ে দিতে পারতেন কিভাবে তাকে দেওয়া পৃথিবীর ভান্ডার নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে গরিবদেরকে সঠিকভাবে বাঁচতে শেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট কারণে দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যা তার প্রভু মহান আল্লাহর দাসত্বের বাইরে ছিল। এই বিরত থাকা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের প্রথম সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিক, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার যখন তাকে মধুর সাথে মিষ্টি জল দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি একবার এক অদৃশ্য বস্তুকে দূরে ঠেলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে জড় জগত তার কাছে এসেছে এবং তিনি তাকে একা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগত উত্তর দিল যে সে জড় জগত থেকে পালিয়ে গেছে কিন্তু তার পরে যারা থাকবে না। এ কারণে আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মধু

মিশ্রিত পানি দেখে কেঁদেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে জড়জগত তাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছে। এই ঘটনাটি ইমাম আশফাহানীর , হিলিয়াত আল আউলিয়া, 47 নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে ।

প্রকৃতপক্ষে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, আনন্দ লাভের জন্য কখনো ভোজন বা পোশাক পরেননি বরং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করার সময় বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতেন। তারা অপছন্দ করত যখন জড়জগৎ তাদের পায়ে দাঁড় করানো হয় এই ভয়ে যে তাদের প্রতিদান আখেরাতের পরিবর্তে এই দুনিয়াতেই তাদের দেওয়া হয়েছে।

যে কেউ সত্যিকারের পরিহারকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। মুসলমানদের এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং দাবি করা উচিত যে তাদের হৃদয় মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। যদি একজন ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তবে তা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং তাদের কর্মে প্রকাশ পায় যা সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে, সে যা গ্রহণ করে সৎ পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের প্রয়োজন জড়জগত থেকে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটাই প্রকৃত বিরত থাকা।

# উসমান বিন মাদউন (রাঃ) – ৫

যখন উসমান বিন মাধূন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করা হয় তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিই ভালোবাসতেন। . ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 212 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সত্যিকারের ভালবাসার সাথে আন্তরিকতা জড়িত।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল আল্লাহ, মহান, তাঁর গ্রন্থ, অর্থ, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদের প্রতি আন্তরিকতা। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য

কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত 5।

*"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"*

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

*"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"*

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের

ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

*"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"*

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

*"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."*

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মাদ ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

# মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)- ১

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, মুসআব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একটি ধনী পরিবার থেকে ছিলেন এবং তাই তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার পরিবার তাকে বন্দী করে এবং বন্দী করে রাখে যতক্ষণ না তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং অন্যান্য কিছু সাহাবীর সাথে ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। পরে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং তার দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে সারা জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 312- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। মুসআব বিন উমায়র রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। একটি পশমী চাদর ছাড়া তার কিছুই ছিল না। তার দাফনের সময় যখন তার মাথাটি এটি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল তখন তার পা অনাবৃত ছিল এবং যখন তার পা পশমী চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল তখন তার মাথাটি উন্মুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তার মাথা পশমী চাদরে ঢেকে রাখতে হবে এবং পা ঢেকে ঘাস ব্যবহার করতে হবে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 46-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

# মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)-২

মদিনায় হিজরত করার পূর্বে এবং মদিনাবাসীদের অনুরোধে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসআব বিন উমায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-কে মদীনায় প্রেরণ করেন যাতে তিনি তাদের সম্পর্কে শিক্ষা দেন। ইসলাম। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন যতক্ষণ না মদিনার প্রতিটি ঘরে মুসলমান ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 136-137- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

# মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) – ৩

মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার একটি নিম্নমানের ভেড়ার চামড়া পরে মসজিদে প্রবেশ করেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি একবার দেখেছিলেন যে মুসআবের পিতা-মাতা কীভাবে তাকে বিলাসী জীবনে লালন-পালন করেছিলেন অথচ আল্লাহর ভালবাসা, মহিমান্বিত, এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন দারিদ্র্যের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 313- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার নিদর্শন, পরকালকে ভালোবাসে এবং জড় জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এর কারণ হলো জড়জগৎ মানুষকে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মরণ থেকে বিমুখ হতে উৎসাহিত করে। অথচ পরকাল মানুষকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে।

উপরন্তু, এটা পরকালে একজন মুসলিম মহান আল্লাহ, এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করবে। অতএব, সত্যিকারের ভালবাসা একজনকে পরকালের দিকে ফিরে যেতে উত্সাহিত করবে। জড় জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে সম্পূর্ণরূপে জগৎ ত্যাগ করে গুহায় বসবাস করতে হবে। কিন্তু এর অর্থ হল, তাদের প্রয়োজন এবং দায়িত্বগুলিকে

অপচয় ও অযথা পরিপূর্ণ করার জন্য তাদের এই দুনিয়া থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করা উচিত এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত।

দুনিয়া ব্যতীত কাজ করা শুধু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ছিল না, বরং জামে আত তিরমিযী, 2352 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছিলেন। এইভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিন এবং এভাবেই পুনরুত্থিত হবেন।

মানুষের হৃৎপিণ্ড এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে তার মধ্যে অবশ্যই কিছু থাকবে। সুতরাং কেউ যদি এটিকে জড় জগত দিয়ে পূর্ণ করে তবে আখেরাতের ভালবাসার জন্য এতে কোনও স্থান থাকবে না। যদি কেউ এই জড় জগতের আধিক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তার অন্তর পরকালের সাথে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এর জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে। এটি মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত ভালোবাসার জন্ম দেবে।

# মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) – ৪

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মুসআব বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর আধ্যাত্মিক হৃদয়কে আলোকিত করেছেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 215 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ৫২ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যায় কিন্তু যদি তার আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয় তবে পুরো শরীরই সুস্থ হয়ে যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত

প্রথমত, এই হাদিসটি সেই মূর্খ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে যেখানে কেউ তার কথা ও কাজ খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একটি শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী বলে দাবি করে। কারণ ভিতরে যা আছে তা শেষ পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাবে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজের থেকে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন করে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের

মুখোমুখি হতে পারে। তাকে। এইভাবে আচরণ করা একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। এই শুদ্ধিকরণ তখন শরীরের বাহ্যিক অঙ্গে প্রতিফলিত হবে, যেমন একজনের জিহ্বা এবং চোখ। অর্থ, তারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধার্মিক বান্দার প্রতি ভালবাসার একটি চিহ্ন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই শুদ্ধি একজনকে সমস্ত জাগতিক অসুবিধার মধ্যে সফলভাবে পথ দেখাবে যাতে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্য অর্জন করতে পারে।

# মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) -৫

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশটি আর প্রয়োগ করা হয়নি। যখন তারা উহুদ পর্বত থেকে নেমে আসে তখন এটি মুসলিম বাহিনীর পিছনের অংশকে উন্মোচিত করে দেয়। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের পতিত সহযোদ্ধাদের কবর দিতে শুরু করলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন শহীদ সাহাবী মুসআব বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশ দিয়ে গেলেন এবং 33 আল আহযাব, আয়াত 23 পাঠ করলেন:

*“মুমিনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যা তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী। তাদের মধ্যে এমন একজন যে তার মানত [মৃত্যু পর্যন্ত] পূর্ণ করেছে, এবং তাদের মধ্যে সে আছে যে [তার সুযোগের] অপেক্ষা করছে। এবং তারা কোন পরিবর্তনের মাধ্যমে [তাদের প্রতিশ্রুতির শর্তাবলী] পরিবর্তন করেনি।"*

ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 62-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের 172 নম্বর অধ্যায় আল আরাফের সাথে যুক্ত:

*"এবং [উল্লেখ করুন] যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি। [এটি] - পাছে কেয়ামতের দিন আপনি বলতে না পারেন, "নিশ্চয়ই আমরা এ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।"*

সমস্ত মানুষকে উদ্‌ভূত করা হয়েছিল যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে এই অঙ্গীকার নিতে পারে। এই ঘটনার পিছনে যে শিক্ষা রয়েছে তা হল, সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে মেনে নিয়েছিল। অর্থ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের টিকিয়ে রেখেছেন এবং যিনি বিচার দিবসে তাদের কর্মের বিচার করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার পূরণ করা সকল মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। .

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করেননি যে তারা তার বান্দা কিনা, বরং তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি তাদের প্রভু কিনা। এটি একটি ইঙ্গিত যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা সর্বদা একজন ব্যক্তির ইচ্ছা ও ইচ্ছার আগে আসা উচিত। যদি একজন মুসলমানের আল্লাহ, মহান বা অন্য

কাউকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে একটি পছন্দ থাকে তবে এই অঙ্গীকারটি তাদের মনে করিয়ে দেবে যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সবার আগে আসতে হবে।

এই প্রশ্নটিও মহান আল্লাহর অসীম রহমতের ইঙ্গিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রতি উত্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন শব্দের মাধ্যমে। এটি মুসলমানদেরকে দেখায় যে যদিও আল্লাহ, মহান, প্রভু যিনি তাদের কাজের বিচার করবেন, তিনি অসীম দয়ালুও।

এই চুক্তির প্রভাব সমস্ত মানবজাতির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিরই ইঙ্গিত সহীহ মুসলিমের ৬৭৫৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জন্য আগে থেকে মন স্থির করে সত্যের সন্ধান না করে প্রমাণের সন্ধান করা জরুরি। যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। শুধুমাত্র তারাই যারা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের মন খোলে তারা এই চুক্তিটি আনলক করবে যা তাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় সমস্ত বিষয়ে খোলা মন থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে সত্য এবং সর্বোত্তম পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। এই মনোভাব সমাজকে শক্তিশালী করে এবং সর্বদা মানুষের মধ্যে শান্তিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যারা তাদের পছন্দগুলি পূর্বনির্ধারণ করে তাদের একগুঁয়েমি সর্বদা একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে কীলক তৈরি করবে যা জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। মুসলমানদের জন্য এটা জরুরী যে তারা সবসময় জাগতিক বিষয়ে সঠিক বলে বিশ্বাস না করা অন্যথায় তারা এই একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করবে। এটি তাদের অন্যের মতামত গ্রহণ করতে বাধা দেবে যা তর্ক, শত্রুতা এবং সম্পর্ক ভাঙার দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, এই মনোভাব যেকোন মূল্যে পরিহার করা উচিত।

পরিশেষে, এই চুক্তিটি যে একজন ব্যক্তির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে তা ইঙ্গিত করে যে এটি উন্মোচন করা মুসলমানদের কর্তব্য। এটি একজনকে বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যাবে যা শোনার অর্থের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, একজনের পরিবারের দ্বারা বলা হয় যে তারা একজন মুসলিম। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন মুসলমানকে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের সময় এই পৃথিবীতে সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে দেয়। একজন শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে পরীক্ষা এবং তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ হয়। ঈমানের নিশ্চিততা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

# আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফা (রাঃ) - ১

উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতকালে আবদুল্লাহ (রা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং কিছু মুসলিম সৈন্য রোমান নেতার হাতে বন্দী হন। আবদুল্লাহর সাহসিকতা ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করার পর, রোমান নেতা তাকে খ্রিস্টান হতে উৎসাহিত করেন এবং তার সাথে তার শাসন ভাগাভাগি করার প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু আবদুল্লাহ (রাঃ) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং তাকে ধর্মত্যাগে ভয় দেখানোর জন্য তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের উপর অটল ছিলেন। রোমান নেতা একটি কড়াই ফুটন্ত পানিতে পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে দেখেছিলেন, যখন একজন মুসলিম বন্দিকে তাতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনও ইসলামের উপর অটল ছিলেন। কড়াইতে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি কেঁদে ফেললেন। যখন রোমান নেতা তার কান্নার কথা জিজ্ঞেস করলেন, তিনি উত্তর দিলেন যে তিনি দুঃখিত যে তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন এবং তিনি চান যে তার অসংখ্য জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে পারে। উচ্চাভিলাষী। রোমান নেতা তখন তাকে তার কপালে চুম্বন করে সম্মান ও সম্মান দেখাতে বলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি তাকে মুক্ত করবেন। আব্দুল্লাহ, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, শুধুমাত্র রোমান নেতা তার সাথে সমস্ত মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করলেই এটি করতে সম্মত হন। রোমান নেতা রাজি হলেন এবং তিনি তার কথা রাখলেন। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মদিনায় ফিরে আসেন এবং খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ঘটনাটি জানানো হয়, তখন তিনি সবাইকে আবদুল্লাহর কপালে চুম্বন করার নির্দেশ দেন। তাঁর জন্য সম্মান ও সম্মানের চিহ্ন , এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম ব্যক্তি যিনি তা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 312-313- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহর দেখানো অটল মনোভাব অবলম্বন করতে হবে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন

হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

*"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."*

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে , মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি

অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

*"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"*

## শোয়েব আর রুমি (রহঃ)- ১

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের বিরুদ্ধে সহিংসতার পর তিনি আরও বাড়তে থাকলে তিনি সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেন। গোপনে তারা মদিনায় হিজরত করতে লাগলো তাদের যা কিছু ছিল এবং যা জানত সব ফেলে রেখে।

যখন একজন সাহাবী, শোয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন মক্কার অমুসলিমরা তাকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। তারা দাবি করেছিল যে তিনি যখন প্রথম মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি দরিদ্র ছিলেন এবং সেখানে আর্থিক সুযোগের মাধ্যমে তিনি ধনী হয়েছিলেন তাই তারা তাকে লাভবান হওয়ার পরে মক্কা ছেড়ে যেতে দেবে না। শোয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তাঁর সমস্ত সম্পদ যা তিনি মক্কায় দাফন করেছিলেন তা তাদের অর্পণ করেছিলেন অথবা এক পক্ষ বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত তারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে পারে। তারা তার সম্পদের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া বেছে নিয়েছে। মদিনায় আগমনের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তার ব্যবসা সবচেয়ে লাভজনক। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিও এই ঘটনার সাথে যুক্ত হয়েছে: অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 207:

*“এবং মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু।"*

তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮০-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92 এর সাথে সংযুক্ত:

*"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।*

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যার অর্থ, তারা তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি ধারণ করবে, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এটি প্রত্যেকটি দোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানরা তাদের খুশির জিনিসগুলিতে তাদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে যা দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডে তাদের শারীরিক শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি, তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটি উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে, লোকেরা এমন জিনিসগুলিতে চেষ্টা করতে পেরে খুশি যা তারা কামনা করে যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন হয় না যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় করতে হবে এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হবে তবুও কতজন আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এইভাবে চেষ্টা করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের

মুখোমুখি হয়ে উচুঁ? কতজন স্বেচ্ছায় নামাজ পড়ার জন্য তাদের মূল্যবান ঘুম ছেড়ে দেয়?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উৎসর্গ করবে। কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত.

# ধামরা বিন ঈস (রহঃ)- ১

ধামরা , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, একজন ধনী অন্ধ ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কায় বসবাস করতেন। যদিও তিনি মদীনায় হিজরত করার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, তার অক্ষমতার কারণে, তিনি সওয়াব অর্জন করতে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যোগদান করতে চেয়েছিলেন। হিজরতের সময় তার মৃত্যু হয় এবং তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 100:

*"এবং যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে অনেক [বিকল্প] স্থান এবং প্রাচুর্য পাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতকারী হয়ে তার ঘর ত্যাগ করে অতঃপর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে, তার প্রতিদান আল্লাহর উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর আল্লাহ সর্বদা ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"*

কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 365-367- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7 এর সাথে সংযুক্ত :

*"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"*

এই আয়াতের অর্থ হল কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতেই সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অগণিত মানুষ মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। . বেশিরভাগ লোকেরা যে অজুহাত দেয় তা হল তাদের সৎ কাজ করার সময় নেই। তারা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দেবে না। এটা কোনো কিছু হলো? যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে না এবং তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে মহান আল্লাহর সাহায্যের আশা করে তারা নিতান্তই মূর্খ। এবং যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তবুও তাদের অতিক্রম করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তারা যে সাহায্য পাবে তা সীমিত। একজন কিভাবে আচরণ করে তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করা হয়। যত বেশি সময় এবং শক্তি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হবে, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই যে সহজ।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে বেশিরভাগ বাধ্যতামূলক কর্তব্য, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, একজনের দিনে অল্প সময় লাগে। একজন মুসলমান প্রতিদিন মাত্র এক ঘণ্টা ফরজ নামাজের জন্য উৎসর্গ করার এবং তারপর সারাদিনের জন্য মহান আল্লাহকে অবহেলা করার এবং সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অব্যাহত সমর্থন আশা করতে পারে না। একজন ব্যক্তি এমন একজন বন্ধুকে

অপছন্দ করবে যে তাদের সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে বিশ্বজগতের রব মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন আচরণ কিভাবে করা যায়?

কেউ কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় নিবেদন করে, যখন তারা কোন পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে তা সমাধানের দাবি করে যেন তারা স্বেচ্ছায় সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ করেছেন। এই মূর্খ মানসিকতা স্পষ্টতই মহান আল্লাহর দাসত্বের বিরোধিতা করে। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরনের ব্যক্তি কীভাবে তাদের অন্যান্য অবসরের কাজগুলি করার জন্য সময় খুঁজে পান, যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা কিন্তু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উত্সর্গ করার জন্য কোন সময় খুঁজে পান না। তারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার এবং গ্রহণ করার সময় খুঁজে পায় না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও আমল করার সময় খুঁজে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় তবে স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করার মতো কোনও সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলিম তাদের আচরণ অনুযায়ী আচরণ করা হবে। অর্থ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা নিরাপদে সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কোন সময় নিবেদন না করে শুধুমাত্র তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ করে বললে, কেউ যত বেশি দেবে তত বেশি পাবে। কেউ বেশি না দিলে বিনিময়ে বেশি আশা করা উচিত নয়।

# উবাদা বিন সামিত (রাঃ)- ১

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে একটি ইহুদি গোত্র, বনু কাইনুকা, যারা মদিনায় বসবাস করছিলেন তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। . পার্থিব সুবিধার কারণে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের আগে বনু কাইনুকার সাথে মিত্রতা করেছিলেন, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সা. তাদের ক্ষতি করা এড়িয়ে চলুন এবং তিনি তাদের প্রতি অনুগত থাকলেন যদিও তারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। যেখানে একজন সাহাবী, উবাদাহ বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যিনি বনু কায়নুকার সাথেও একটি পুরানো মৈত্রী রেখেছিলেন, তিনি প্রকাশ্যে তাদের সাথে তার মৈত্রী ত্যাগ করেছিলেন এবং পরিবর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাঁর মৈত্রী পুনর্নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর উপর এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। মহান আল্লাহ অতঃপর ৫ম অধ্যায় আল মায়িদাহ, ৫১ নং আয়াত নাযিল করেন:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের সহযোগী। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের মিত্র হয়, তবে সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"*

এবং অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 56:

*"এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং যারা ঈমান এনেছে - প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দল - তারাই প্রধান হবে।"*

ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 3-4 এ আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."*

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহূর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

# উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ)-২

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত আমলে মিশর অভিযানের সময়, বাবলিয়ন দুর্গ মুসলমানরা অবরোধ করেছিল। মিশরের শাসক আল মুকাকিস তার কয়েকজন দূতের সাথে মুসলমানদের নেতা আমর ইবনে আল আস রা.-এর কাছে একটি চিঠি পাঠান। দূতগণ মুসলমানদের সাথে দুই দিন অবস্থান করেন এবং ফিরে আসার পর আল মুকাকিস তাদের কাছে মুসলমানদের বর্ণনা দিতে বলেন। তাদের কথা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তির আলোচনা করাই উত্তম হবে তাই তিনি আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে অনুরোধ করলেন যে তিনি কিছু লোক পাঠাতে যাদের সাথে তিনি আলোচনা করতে পারেন। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি দল পাঠালেন এবং উবাদাহ বিন সামিতকে তাদের নেতা নিযুক্ত করলেন। যখন তারা শাসকের দরবারে পৌঁছায়, তখন উবাদাহ, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, আল মুকাকিসকে সম্বোধন করার জন্য এগিয়ে গেলেন কিন্তু পরবর্তীরা তাকে বরখাস্ত করেন কারণ তিনি কালো চামড়ার ছিলেন। আল মুক্বকিস তাকে অন্য কাউকে সম্বোধন করার দাবি করেছিলেন কিন্তু মুসলমানদের দল উত্তর দিয়েছিল যে উবাদাহ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাদের নেতা, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম, তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। তারা আরও বলেন, ইসলামে গায়ের রঙের কোনো ওজন নেই। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 325-328- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

# উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) – ৩

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত আমলে মিশর অভিযানের সময়, বাবলিয়ন দুর্গ মুসলমানরা অবরোধ করেছিল। মিশরের শাসক আল মুকাকিস তার কয়েকজন দূতের সাথে মুসলমানদের নেতা আমর ইবনে আল আস রা.-এর কাছে একটি চিঠি পাঠান। দূতগণ মুসলমানদের সাথে দুই দিন অবস্থান করেন এবং ফিরে আসার পর আল মুকাকিস তাদের কাছে মুসলমানদের বর্ণনা দিতে বলেন। তাদের কথা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তির আলোচনা করাই উত্তম হবে তাই তিনি আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে অনুরোধ করলেন যে তিনি কিছু লোক পাঠাতে যাদের সাথে তিনি আলোচনা করতে পারেন। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি দল পাঠালেন এবং উবাদাহ বিন সামিতকে তাদের নেতা নিযুক্ত করলেন। যখন উবাদাহ, আল্লাহ তাঁর সাথে খুশি, আল মুকাকিসকে সম্বোধন করেছিলেন তখন তিনি তাকে বলেছিলেন যে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানের কারণ, যারা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের কোনটিই পার্থিব লাভের আশা বা সম্পদ আহরণ নয়। যদি তারা যুদ্ধের মাধ্যমে একটি সোনার পাহাড় বা শুধুমাত্র একটি রৌপ্য মুদ্রা অর্জন করে তবে তারা এই পৃথিবী থেকে যা চায় তা খাওয়া এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য এবং নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখার জন্য একটি কাপড়। তারা সন্তুষ্ট হবে. তাদের মধ্যে কেউ যদি একটি সোনার পাহাড়ও অর্জন করে তবে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করবে এবং তাদের হাতে যা অবশিষ্ট থাকবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। কারণ এই জড় জগতের আনন্দ প্রকৃত আনন্দ নয় এবং এর বিলাসিতা প্রকৃত বিলাসিতা নয়: বরং প্রকৃত আনন্দ ও বিলাসিতা আসে পরকালে। এভাবেই মহান আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করেছেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যা শিখিয়েছেন। তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, এই পৃথিবীতে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবারণ এবং তাদের শরীর ঢেকে রাখার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত, তাদের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত মহান আল্লাহকে খুশি করা এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইমাম

মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 325-328- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি নিয়ে চিন্তিত নন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর উদাহরণ হল একজন সওয়ারীর মতো যে একটি গাছের ছায়ায় সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম এবং তারপর এটিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তিই একজন ভ্রমণকারী যারা এই পৃথিবীতে খুব সীমিত সময়ের জন্য অবস্থান করে যেখানে তারা অর্থ, আত্মার জগত থেকে এসেছেন এবং তারা যেখানে যাচ্ছেন যা অনন্ত পরকাল। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবী তুলনামূলকভাবে বাস স্টপে অপেক্ষা করার মতো। এ হাদীসে এ পৃথিবীকে ছায়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হল একটি ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং লোকেরা এমনকি খেয়াল না করেও দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যায় যা একজন ব্যক্তির দিন এবং রাত ঠিক কীভাবে কেটে যায়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণকারীর হোটেল বা হোটেলের কথা উল্লেখ করেননি কারণ এগুলো শক্ত কাঠামো যা স্থায়ীত্ব নির্দেশ করে। একটি বিবর্ণ ছায়া এই বস্তুজগতকে আরও ভালভাবে বর্ণনা করে। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন তারা সর্বদা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি মুহুর্তের মতো ফ্ল্যাশ করেছে এবং অনুভব করেছে। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

*"যেদিন তারা এটা (বিচার দিবস) দেখবে, সেদিন এমন হবে যে, তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আরোহীকে ইঙ্গিত করেছেন যে কেউ হাঁটবে না কেননা যে হাঁটছে সে আরোহীর চেয়ে গাছের ছায়ায় বেশি বিশ্রাম নেবে। এটি আরও নির্দেশ করে যে মানুষ এই পৃথিবীতে কতটা সীমিত সময় ব্যয় করে।

ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া একজনের গুরুত্ব নির্দেশ করে বস্তুগত জগতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বিধানগুলি পাওয়ার জন্য ঠিক যেমন রাইডার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমন বিশ্রাম। তাই একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুত হয়ে এই দুনিয়া থেকে অবিলম্বে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে এই দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য একজনকে বস্তুগত জগতকে ব্যবহার করা উচিত। রাইডার বিশ্রাম নেয় এবং মুসলমানদের অবশ্যই অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে তাদের সময় উৎসর্গ করার পরিবর্তে এমন জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে যা তাদের আখেরাতের জন্য উপকারী হবে যা বিচারের দিনে তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

*“এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, হায়!*

# সা'দ বিন মুআয (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলে একজন সাহাবী সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য একটি অস্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা উচিত। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে হেরে গেলে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চাদপসরণ করতে পারতেন এবং মদিনায় তাঁর বাকি সাহাবীগণের সাথে পুনরায় যোগদান করতে পারতেন। তিনি আরও বলেন যে, এই সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, শুধুমাত্র মদিনায় থেকে যান কারণ তারা জানত না যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে চলেছে এবং তারা সর্বদা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকবে। তাকে ভালো পরামর্শ। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তার ধারণার সাথে একমত হলেও যুদ্ধে অন্য কারো চেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 268-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."*

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

# সা'দ বিন মুআয (রাঃ)-২

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনা থেকে ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ হয় । মহান আল্লাহ অমুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যখন তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে তাদের শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। মুহাম্মাদ, শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এবং পরিবর্তে খন্দকের যুদ্ধের সময় অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হন । মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। বনু কুরাইজা একজন সাহাবী সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সিদ্ধান্তের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হয়েছিল , যাকে তারা মুসলিম হওয়ার আগে থেকেই ভাল করে জানত। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সম্মত হন এবং সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তলব করা হয় এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে বনু কুরাইজার সৈন্যদের হত্যা করা হবে এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর ঘোষণা করলেন যে, তিনি মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 166-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য মৃত্যুদণ্ড এই দিন এবং যুগেও একটি খুব সাধারণ রায়।

যারা তার দুর্বল বান্দাদের উপর অত্যাচার করে তাদের উপর মহান আল্লাহ প্রতিশোধ নেন কারণ তারা নিজেদের রক্ষা করার বা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে মহান আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার করবে না, বিশেষ করে যারা প্রতিরক্ষাহীন বলে মনে হয় বাস্তবে তাদের রক্ষাকর্তা এবং প্রতিশোধদাতা হলেন মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এবং বিশেষ করে বিচার দিবসে প্রতিশোধ নেবেন। তিনি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজগুলো তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপ তাদের অত্যাচারীর কাছে স্থানান্তরিত করবেন। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে । এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই স্বর্গীয় নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমে, যা তাদেরকে মহান আল্লাহর কঠোর আনুগত্যের অধীন করে মন্দের দিকে অনুপ্রাণিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। . এবং একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিসের প্রতিশোধ নিতে হবে।

# সা'দ বিন মুআয (রাঃ)- ৩

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে তিনি বনু কুরাইজাকে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অবরোধ করেন। বনু কুরাইজা সা'দ বিন মুআয (রা.) কর্তৃক সংঘটিত রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি যে ক্ষত দিয়েছিলেন তাতে তিনি মারা যান । তাঁর দাফনের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন যে সাদ (রাঃ) এর কবর তাকে ক্ষণিকের জন্য আটকে রেখেছিল যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাকে তা থেকে মুক্তি দেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 175-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তখন তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আমল। যদি একজন মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তবে এটি নিশ্চিত করবে

যে তারা প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রস্তুত করবে। তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে দীর্ঘ সময় থাকা। এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

# মিকদাদ বিন আমর (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার অমুসলিমদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার পথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানানো হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে কি করতে হবে তার মতামত জানতে চাইলেন। মিকদাদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম, মহানবী মূসা (আঃ)-এর জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁকে ত্যাগ করবেন না, যখন তারা অসম্মানজনক ঘোষণা করলেন। যে হযরত মুসা (আঃ) গিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন কারণ তারা তাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিল না। পরিবর্তে মিকদাদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, ঘোষণা করেছিলেন যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সমস্ত পরিস্থিতিতে তাঁর সাথে যুদ্ধ করবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 250-260-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

*"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."*

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

উপরন্তু, ভন্ডামির একটি দিক হল যখন কেউ মৌখিকভাবে অন্যদের এবং তাদের ভাল প্রকল্পগুলির জন্য সমর্থন দেখায় যেমন, একটি মসজিদ নির্মাণ

কিন্তু যখন প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সময় আসে, যেমন সম্পদ দান করার সময় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। একইভাবে, লোকেরা যখন ভাল সময়ের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা অন্যদের মনে করিয়ে দিয়ে মৌখিকভাবে তাদের সমর্থন করে। কিন্তু জনগণ যে মুহুর্তে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এই মুনাফিকরা কোন মানসিক বা শারীরিক সমর্থন দেয় না। বরং তারা তাদের সমালোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকদের এই মনোভাব ছিল । অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 62:

*"অতএব কেমন হবে যখন তাদের হাতের বর্ধনের কারণে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসে এবং তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার কাছে আসে, "আমরা সদাচরণ ও বাসস্থান ছাড়া আর কিছুই চাইনি।"*

# মিকদাদ বিন আমর (রহঃ)- ২

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। যখন তিনি ফিরে আসেন তখন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন যে, তাকে খুব বেশি সম্মান ও সম্মান দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি অভিযানের নেতা ছিলেন এবং তাদের সাথে এই আচরণ করা হলে যে অনুভূতি গ্রহণ করা যায় তা অপছন্দ করেন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন যে নেতৃত্ব এমনই হয়। মিকদাদ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, শপথ নেন যে তিনি আর কখনও নেতা হওয়া মেনে নেবেন না। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 95-96- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মিকদাদ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, নেতৃত্বের বিপদ বুঝতে পেরেছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের বিশ্বাস নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্খা করে, ঠিক যেমন খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায়

পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয় । প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

# উমায়ের বিন হামাম (রাঃ)- ১

বদর যুদ্ধের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সাহাবীগণকে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন এবং বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই প্রতিশ্রুতি শুনলেন, তখন তিনি কিছু খেজুর নিক্ষেপ করলেন যা তিনি খাচ্ছিলেন, তলোয়ার তুলে নিলেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 409-410- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এইভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন কারণ তিনি এই জড়জগত ও পরকালের ব্যাপারে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি গ্রহণ করেছিলেন।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয় তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ

পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন।

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

# সুহাইল বিন আমর (রাঃ)- ১

সুহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং কুরাইশ গোত্রের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা একবার খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। খলিফা প্রথমে গরীব সাহাবীদের ভর্তি করলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং বিশিষ্ট ও ধনী ব্যক্তিদের বাইরে রেখে দিলেন। আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি কুরাইশ গোত্রের আরেকজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন, আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, কীভাবে দরিদ্র সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, খলিফাকে দেখার জন্য ভর্তি করা হয়েছিল যখন তিনি এবং কুরাইশের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতারা ছিলেন। বাইরে সুহাইল, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর সমালোচনা করেছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁর নিজের উপর বিরক্ত হওয়া উচিত, যেহেতু ইসলাম সবার কাছে পেশ করা হয়েছিল এবং দরিদ্র সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি প্রথমে এটি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাই তিনি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য যারা কুরাইশ গোত্রের প্রধান নেতাদের মধ্যে ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 444-445- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু

লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

# আবু খায়থামা (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করতে এবং প্রয়োজনে মহান বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সাম্রাজ্য। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। কয়েকজন সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, অলসতার কারণে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায়ের পর পিছনে থেকে যান। তাদের একজন ছিলেন আবু খায়থামা , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার বেশ কিছু দিন পর তিনি তার জন্য তৈরি শীতল পানীয় এবং খাবারের সন্ধান করতে বাড়িতে ফিরে আসেন। গৃহে বিশ্রামরত অবস্থায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই অভিযানে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা স্মরণ করে তিনি নিজেকে তিরস্কার করেছিলেন। তিনি তার পরিবারকে তার প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাবুকে ক্যাম্প স্থাপনকারী অভিযানের সাথে দ্রুততার সাথে জড়িত হন। আবু খাইথামা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খবর দিলেন, তখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে দোয়া করলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 8-9 এ আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এবং গুনাহ করলে আন্তরিকভাবে তওবা করা। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

*"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."*

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

# ইবনে ইয়ামিন (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করতে এবং প্রয়োজনে মহান বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সাম্রাজ্য। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। আরও কিছু গরীব সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এই দীর্ঘ এবং কঠিন অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য সম্পদের অধিকারী ছিলেন না এবং কিছু ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে সম্পদ ছিল না। তাদেরও দাও। যদিও মহান আল্লাহ স্বয়ং তাদের মাফ করে দিয়েছেন তারা এতটাই শোকাহত যে অভিযানে অংশ নিতে না পেরে কাঁদতেন। অধ্যায় 9 এ তাওবাহ, আয়াত 92:

*"তাদেরও [দোষ নেই] যারা, যখন তারা তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার কাছে এসেছিল, তুমি বলেছিলে, "আমি তোমাকে বহন করার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।" [আল্লাহর পথে] ব্যয় করার মতো কিছু খুঁজে না পাওয়ার দুঃখে তারা ফিরে গেল যখন তাদের চোখ অশ্রুতে উপচে পড়ল।"*

এই দরিদ্র সাহাবীদের মধ্যে দুইজন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আরেকজন ইবনে ইয়ামিনকে কাঁদতে দেখেছিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। ইবনে ইয়ামিন রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদের উট দিলেন এবং কিছু খেজুর দিলেন যাতে তারা অভিযানে যোগ দিতে পারে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 5 এ আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয়

অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

# আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে তাকে মদিনার নিকটবর্তী খায়বারে বসবাসকারী একটি অমুসলিম উপজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের যে শান্তিচুক্তি ছিল তা অবিরাম ভঙ্গ করার কারণে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। খায়বারের অমুসলিমরা তাদের একটি দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কৃষি জমির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাঁর এলাকা থেকে বহিষ্কার করতে চাইলে তারা তাঁর সাথে চুক্তি করে। তারা কৃষি জমির দেখাশোনা করবে এবং অর্ধেক ফসল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হস্তান্তর করবে এই শর্তে যে তাদের জমি থেকে বহিষ্কার করা হবে না। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর তাদের সাথে দেখা করতে এবং তাদের অর্থ গ্রহণ করার জন্য একজন সাহাবী আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং তাদের দায়িত্ব নিযুক্ত করেছিলেন। এই অমুসলিমরা আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, যাতে তিনি তাদের অর্ধেকের বেশি রাখতে দেন যা সম্মত হয়েছিল। তিনি উত্তর দিলেন যে, যদিও পৃথিবীতে কেউ তাঁর কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল না, এবং অমুসলিমরা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করত, তবুও তিনি পবিত্রতার প্রতি ভালোবাসা ছেড়ে দেবেন না। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাদের প্রতি তাঁর অপছন্দ তাকে তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতে এবং ন্যায়বিচার করতে বাধা দেয় না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 270-271-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে

মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

*“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য।* [1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও...”*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

# আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রহঃ)- ২

একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত দিনে একটি অভিযানের সময়, যেখানে লোকেরা সূর্য থেকে নিজেদেরকে ছায়া দেওয়ার জন্য তাদের হাত ব্যবহার করছিল, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত কেউ রোজা রাখছিলেন না। . এটি সহীহ বুখারী, 1945 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত সমস্ত সৎ কাজ নিজের জন্য করা হয় কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি তা করবেন। সরাসরি পুরস্কৃত করুন।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস হল একটি অনন্য ধার্মিক কাজ কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ শুধুমাত্র তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয়

এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

*"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."*

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত ঈমানদার হবে না কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজাও পূর্ণ না করে তাহলে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। সারাজীবন রোজা রাখলেও সওয়াব ও আশীর্বাদ হারিয়ে যায়।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত রোজা সঠিকভাবে তাকওয়া বাড়ে. অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া

তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন তারা রোজা রাখে এই অভ্যাসটি শেষ পর্যন্ত তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা সত্ত্বেও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, সিয়ামের

সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবেও রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখা উচিত, এবং এর পরিবর্তে ভাগ্য ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে জানার জন্য নিয়ে আসে, মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন যদিও তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং অন্যদের না জানানো যদি এটি পরিহারযোগ্য হয় কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

# আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রহঃ) – ৩

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে তিনি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি এই বাহিনীর একজন সেনাপতি এবং একের পর এক আরো দুইজন উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা করেন। এ থেকে লোকেরা বুঝতে পেরেছিল যে এই নির্দিষ্ট সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, শহীদ হবেন। এমনকি একজন ইহুদি লোকও পূর্ববর্তী ঐশী শিক্ষা থেকে নিশ্চিত করেছেন যে, যখনই একজন মহানবী (সা.) তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে একজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেন তার মানে তারা অবশ্যই শহীদ হবেন। প্রথম সেনাপতির একজন উত্তরসূরি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) লোকদের বিদায় জানাতে গিয়ে কেঁদেছিলেন। যখন তাকে তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তার কান্না দুনিয়া বা মানুষের প্রতি ভালবাসার কারণে নয় বরং তিনি আখেরাত এবং মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করেছেন যে সকলেই জাহান্নামের মুখোমুখি হবে তবে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি কেমন ছিলেন। এটা এড়াতে যাচ্ছে. অধ্যায় 19 মরিয়ম, আয়াত 71:

*“এবং তোমাদের মধ্যে সে ছাড়া আর কেউ নেই [জাহান্নামে] আসবে। এটা আপনার পালনকর্তার উপর অনিবার্য ফরমান।”*

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 326-327-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব নির্দেশ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা সর্বদা আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করত এবং জড় জগতের বিলাসিতা সংগ্রহ ও মজুদ করার চেয়ে এর জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিত। ইহকাল ও পরকালের স্বরূপ বুঝে এই সঠিক উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য জরুরি।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো

একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

# আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রহঃ)- ৪

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে তিনি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু। মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহিনীকে খুব ভোরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রস্থান বিলম্ব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যাতে তিনি নবী মুহাম্মদের পিছনে নামাজ পড়তে পারেন, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, এবং তারপর বাকি সেনাবাহিনীকে ধরুন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদে নামাযের জন্য উপস্থিত হতে দেখেন তখন তিনি তার কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তার নিয়তের কথা জানার পর তিনি তাকে বললেন যে তাকে প্রদত্ত আদেশ পালন করা সারা বিশ্বের চেয়েও বেশি সওয়াব। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 327-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যদিও ইসলামে এগুলিকে ভাল বলে মনে করা হয়।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

# আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) -৫

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে তিনি মুতার যুদ্ধে অংশ নিতে 3000 সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনী মুতার কাছে পৌঁছে এবং শিবির স্থাপন করে যেখানে তাদের জানানো হয় যে শত্রু বাহিনীর সংখ্যা প্রায় 200,000। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মিশন চালিয়ে যাবেন নাকি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করবেন, তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং পরবর্তী আদেশের জন্য অনুরোধ করবেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রহঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়ে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন এবং তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের শক্তি সংখ্যা বা অস্ত্র নয় বরং তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাঁর আন্তরিক আনুগত্যে এসেছে। তিনি সেনাবাহিনীর শাহাদাত বা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী সম্মত হয় এবং অবিচল থেকে এগিয়ে যায় এবং অবশেষে তারা বিজয় লাভ করে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 328-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর

প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

*"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."*

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2,

হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

*"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"*

# কাব বিন মালিক (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করতে এবং প্রয়োজনে মহান বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সাম্রাজ্য। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় ফিরে আসেন, যারা অভিযানে অংশ নিতে ব্যর্থ হয় তারা তাদের অজুহাত পুনরাবৃত্ত করে এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে। তিনি তাদের সকল অজুহাত গ্রহণ করলেন, তাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপন অভিপ্রায়কে তাদের ও মহান আল্লাহর মধ্যে ছেড়ে দিলেন। একজন সাহাবী, কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, শুধুমাত্র অবহেলা ও অলসতার কারণে পিছিয়ে ছিলেন। যদিও তিনি অন্যদের অজুহাত দেখাতে দেখেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ক্ষমা পেয়েছিলেন, তবুও তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সত্য ঘোষণা করেছিলেন, জেনেছিলেন যে, মহান আল্লাহ মিথ্যা বলার জন্য তার প্রতি রাগান্বিত হয় যদিও সে মিথ্যা বলে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রোধ থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা পায়। অন্য দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট,ও সত্য স্বীকার করলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাদের অবস্থার ফলাফল নির্ধারণ করবেন। মদিনার জনগণকে বলা হয়েছিল যে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনজনকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে। এই সময় একজন অমুসলিম শাসক কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি চিঠি পাঠান এবং তাকে পরামর্শ দেন যে তার সাথে কঠোর আচরণ করা হচ্ছে এবং তাকে মদিনা ছেড়ে তার কাছে আসতে হবে যেখানে তার সাথে অত্যন্ত সম্মান ও সম্মানের সাথে আচরণ করা হবে। . কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি একটি পরীক্ষা এবং চিঠিটি পুড়িয়ে দিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 31-32-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

*"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"*

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে

উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা জরুরী যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , সব পরিস্থিতিতে।

# কাব বিন মালিক (রহঃ)-২

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করতে এবং প্রয়োজনে মহান বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সাম্রাজ্য। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় ফিরে আসেন, যারা অভিযানে অংশ নিতে ব্যর্থ হয় তারা তাদের অজুহাত পুনরাবৃত্ত করে এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে। তিনি তাদের সকল অজুহাত গ্রহণ করলেন, তাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপন অভিপ্রায়কে তাদের ও মহান আল্লাহর মধ্যে ছেড়ে দিলেন। একজন সাহাবী, কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, শুধুমাত্র অবহেলা ও অলসতার কারণে পিছিয়ে ছিলেন। যদিও তিনি অন্যদের অজুহাত দেখাতে দেখেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ক্ষমা পেয়েছিলেন, তবুও তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সত্য ঘোষণা করেছিলেন, জেনেছিলেন যে, মহান আল্লাহ মিথ্যা বলার জন্য তার প্রতি রাগান্বিত হয় যদিও সে মিথ্যা বলে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রোধ থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা পায়। অন্য দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট,ও সত্য স্বীকার করলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাদের অবস্থার ফলাফল নির্ধারণ করবেন। মদিনার জনগণকে বলা হয়েছিল যে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনজনকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে। 50 কঠিন দিন পরে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের ক্ষমা প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে সত্যকে মেনে চলার জন্য তাদের জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 118:

*"এবং [তিনি ক্ষমা করেছেন] যে তিনজনকে একা রেখে দেওয়া হয়েছিল [অর্থাৎ, তাদের ভুলের জন্য অনুশোচনা করা হয়েছিল] এমনভাবে যে পৃথিবী তার বিশালতা সত্ত্বেও তাদের উপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের আত্মা তাদের সীমাবদ্ধ করেছিল [অর্থাৎ, ব্যথিত হয়েছিল] এবং তারা ছিল নিশ্চিত যে আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। তারপর তিনি তাদের দিকে ফিরে গেলেন যাতে তারা অনুতপ্ত হতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"*

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 30-33-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ

এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

# কাব বিন মালিক (রহঃ)- ৩

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করতে এবং প্রয়োজনে মহান বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সাম্রাজ্য। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় ফিরে আসেন, যারা অভিযানে অংশ নিতে ব্যর্থ হয় তারা তাদের অজুহাত পুনরাবৃত্ত করে এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে। তিনি তাদের সকল অজুহাত গ্রহণ করলেন, তাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপন অভিপ্রায়কে তাদের ও মহান আল্লাহর মধ্যে ছেড়ে দিলেন। একজন সাহাবী, কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, শুধুমাত্র অবহেলা ও অলসতার কারণে পিছিয়ে ছিলেন। যদিও তিনি অন্যদের অজুহাত দেখাতে দেখেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ক্ষমা পেয়েছিলেন, তবুও তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সত্য ঘোষণা করেছিলেন, জেনেছিলেন যে, মহান আল্লাহ মিথ্যা বলার জন্য তার প্রতি রাগান্বিত হয় যদিও সে মিথ্যা বলে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রোধ থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা পায়। অন্য দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট,ও সত্য স্বীকার করলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাদের অবস্থার ফলাফল নির্ধারণ করবেন। মদিনার জনগণকে বলা হয়েছিল যে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনজনকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে। 50 কঠিন দিন পরে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের ক্ষমা প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে সত্যকে মেনে চলার জন্য তাদের জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 118:

*"এবং [তিনি ক্ষমা করেছেন] যে তিনজনকে একা রেখে দেওয়া হয়েছিল [অর্থাৎ, তাদের ভুলের জন্য অনুশোচনা করা হয়েছিল] এমনভাবে যে পৃথিবী তার বিশালতা সত্ত্বেও তাদের উপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের আত্মা তাদের সীমাবদ্ধ করেছিল [অর্থাৎ, ব্যথিত হয়েছিল] এবং তারা ছিল নিশ্চিত যে আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। তারপর তিনি তাদের দিকে ফিরে গেলেন যাতে তারা অনুতপ্ত হতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"*

কা'ব, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে দেখা করলেন, যিনি বাকি মদিনার সাথে তাকে অভিনন্দন জানালেন। কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে তিনি যদি কিছু দান করেন এবং বাকিটা রাখেন তবে এটি সর্বোত্তম। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 30-33-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে, তাকে তারা যা দান করবে সে অনুসারে পুরস্কৃত করা হবে। এবং তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অন্যথায় মজুত করবেন না, অন্যথায় মহান আল্লাহ তাঁর নেয়ামত বন্ধ করে দেবেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজনকে অবশ্যই হালাল সম্পদ অর্জন করতে হবে এবং ব্যয় করতে হবে এমন যে কোন সৎ কাজ যার ভিত্তি হারামের উপর ভিত্তি

করে আছে তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন, তার ইচ্ছা যাই হোক না কেন। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই ব্যয় শুধুমাত্র দাতব্যের মাধ্যমে নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য খরচ করা, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে এটি আসলে একটি সৎ কাজ। একজন মুসলমানের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ব্যয় করা যাতে তারা নিজের অভাব না করে অন্যদের সাহায্য করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 29:

*"এবং তোমার হাত তোমার গলায় বেঁধে রাখো না বা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করো না এবং [এর ফলে] দোষী ও দেউলিয়া হয়ে যাও।"*

একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা, যদিও তা আল্লাহ, মহান, একজনের গুণগত অর্থ, তাদের আন্তরিকতা পর্যবেক্ষণ করেন, কাজের পরিমাণ নয়। নিয়মিত অল্প কিছু দান করা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বেশি উত্তম ও প্রিয়, একবারে বেশি পরিমাণ দান করার চেয়ে। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আলোচ্য প্রধান হাদীসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন কেউ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবে, মহান আল্লাহ তাকে তাঁর অসীম

মর্যাদা অনুসারে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যে আটকে থাকে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। যদি একজন মুসলমান তাদের সম্পদ জমা করে রাখে তবে তারা তা অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে দেবে যখন তারা এর জন্য দায়ী থাকবে। যদি তারা তাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তবে তা তাদের জন্য দুনিয়াতে অভিশাপ ও বোঝা এবং পরকালে শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে।

# আবু আইয়ুব আনসারী (রহঃ)- ১

যুদ্ধের সময় একজন মুসলিম শত্রুর সারিতে ঢুকে পড়ে। অন্যান্য মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ নিম্নলিখিত আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করে মন্তব্য করে যে তিনি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 195:

*"আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং [নিজের] হাতে [নিজেদের] ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না [নিরুৎসাহিত হয়ে]। আর ভালো কাজ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"*

আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ব্যাখ্যা করেন যে, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে নিজেকে ধ্বংস করা উচিত নয়, যেমনটি নাযিল হয়েছিল যখন কিছু সাহাবী, আল্লাহ সন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের সাথে, মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার পরিবর্তে তাদের জমি চাষে মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন, এমন সময়ে যখন ইসলাম উন্নতি করতে শুরু করেছিল। জামে আত তিরমিযী, ২৯৭২ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি সর্বদা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

*"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."*

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

*"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"*

# আব্বাদ বিন বিশর (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর চতুর্থ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধাত আল রিকা নামে একটি অভিযানে রওনা হন । যখন তারা রাতারাতি একটি উপত্যকায় থামল তখন তিনি দুই সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, সেনারা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় উপত্যকার মুখে পাহারা দিতে। এই সাহাবীদের একজন আব্বাদ বিন বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম শিফটে নিলেন যখন দ্বিতীয় সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘুমিয়েছিলেন। আব্বাদ বিন বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়তে লাগলেন। তার নামাজের সময় একজন অমুসলিম শত্রু সৈন্য তাকে দেখে একটি তীর দিয়ে আঘাত করে। আব্বাদ বিন বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শরীর থেকে তীরটি সরিয়ে দিয়ে সালাত আদায় করতে থাকেন। এটি মোট চারবার ঘটেছিল এবং তখনই তিনি আম্মার বিন ইয়াসিরকে জাগ্রত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন। অমুসলিম সৈনিক দুইজন প্রহরী আছে বুঝতে পেরে পালিয়ে যায়। আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন কেন আব্বাদ বিন বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম তীর আঘাতে তাকে জাগালেন না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি তার নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করতে চান না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 115-116-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ আশা করা হয় না তবে তারা পবিত্র কুরআনের প্রতি সত্যিকারের আন্তরিকতা প্রদর্শন করবে বলে আশা করা হয়।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাঃ)- ১

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 23 পাঠ করেছিলেন:

*“ মুমিনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যা তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন একজন যে তার মানত [মৃত্যু পর্যন্ত] পূর্ণ করেছে, এবং তাদের মধ্যে সে আছে যে [তার সুযোগের] অপেক্ষা করছে। এবং তারা কোন পরিবর্তনের মাধ্যমে [তাদের প্রতিশ্রুতির শর্তাবলী] পরিবর্তন করেনি।"*

অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে এই আয়াতটি পূরণ করেছে? এমন সময় তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন তিনি তাদের একজন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১৭৬ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি পবিত্র কুরআনের 72 অধ্যায় আল আরাফের সাথে সংযুক্ত:

*"এবং [উল্লেখ করুন] যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?"*

*তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি। [এটি] - পাছে কেয়ামতের দিন আপনি বলতে না পারেন, "নিশ্চয়ই আমরা এ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।"*

সমস্ত মানুষকে উদ্‌ভূত করা হয়েছিল যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে এই অঙ্গীকার নিতে পারে। এই ঘটনার পিছনে যে শিক্ষা রয়েছে তা হল, সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে মেনে নিয়েছিল। অর্থ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের টিকিয়ে রেখেছেন এবং যিনি বিচার দিবসে তাদের কর্মের বিচার করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার পূরণ করা সকল মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। .

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করেননি যে তারা তার বান্দা কিনা, বরং তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি তাদের প্রভু কিনা। এটি একটি ইঙ্গিত যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা সর্বদা একজন ব্যক্তির ইচ্ছা ও ইচ্ছার আগে আসা উচিত। যদি একজন মুসলমানের আল্লাহ, মহান বা অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে একটি পছন্দ থাকে তবে এই অঙ্গীকারটি তাদের মনে করিয়ে দেবে যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সবার আগে আসতে হবে।

এই প্রশ্নটিও মহান আল্লাহর অসীম রহমতের ইঙ্গিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রতি উত্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন শব্দের মাধ্যমে। এটি মুসলমানদেরকে দেখায় যে যদিও আল্লাহ, মহান, প্রভু যিনি তাদের কাজের বিচার করবেন, তিনি অসীম দয়ালুও।

এই চুক্তির প্রভাব সমস্ত মানবজাতির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিরই ইঙ্গিত সহীহ মুসলিমের ৬৭৫৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জন্য আগে থেকে মন স্থির করে সত্যের সন্ধান না করে প্রমাণের সন্ধান করা জরুরি। যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। শুধুমাত্র তারাই যারা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের মন খোলে তারা এই চুক্তিটি আনলক করবে যা তাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় সমস্ত বিষয়ে খোলা মন থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে সত্য এবং সর্বোত্তম পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। এই মনোভাব সমাজকে শক্তিশালী করে এবং সর্বদা মানুষের মধ্যে শান্তিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যারা তাদের পছন্দগুলি পূর্বনির্ধারণ করে তাদের একগুঁয়েমি সর্বদা একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে কীলক তৈরি করবে যা জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। মুসলমানদের জন্য এটা জরুরী যে তারা সবসময় জাগতিক বিষয়ে সঠিক বলে বিশ্বাস না করা অন্যথায় তারা এই একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করবে। এটি তাদের অন্যের মতামত গ্রহণ করতে বাধা দেবে যা তর্ক, শত্রুতা এবং সম্পর্ক ভাঙার দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, এই মনোভাব যেকোন মূল্যে পরিহার করা উচিত।

পরিশেষে, এই চুক্তিটি যে একজন ব্যক্তির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে তা ইঙ্গিত করে যে এটি উন্মোচন করা মুসলমানদের কর্তব্য। এটি একজনকে বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যাবে যা শোনার অর্থের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, একজনের পরিবারের দ্বারা বলা হয় যে তারা একজন মুসলিম। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন মুসলমানকে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের সময় এই পৃথিবীতে সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে দেয়। একজন শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে পরীক্ষা এবং তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ হয়। ঈমানের নিশ্চিততা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

# তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাঃ)-২

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার একদিনে এক লাখ রৌপ্য মুদ্রা সদকায়ে বিতরণ করেছিলেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১৭৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, দুনিয়ার ধনী ব্যক্তিরা পরকালে গরীব হবে যদি না তারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করে তবে এই লোক সংখ্যায় অল্প। .

এর অর্থ এই যে, অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ ভুলভাবে ব্যয় করে, অর্থাৎ হয় নিরর্থক জিনিসের জন্য যা তাদের আখিরাতে কোন উপকার করে না, অথবা তারা এমন পাপ কাজে ব্যয় করে যা উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় অথবা তারা ব্যয় করে। ইসলামের অপছন্দের মত হালাল জিনিসের উপর যেমন অপব্যয় বা অযথা। এসব কারণে বিচারের দিন ধনীরা গরীব হয়ে যাবে কারণ তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং এমনকি তাদের উপর শাস্তিও দেওয়া হবে।

উপরন্তু, যারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পদ তাদেরকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাই তারা পরকালে খালি হাতে গরিব হিসেবে পৌঁছাবে। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি তার জন্য দায়বদ্ধ থাকা অবস্থায় অন্যদের ভোগের জন্য সম্পদ রেখে যাবে।

পরিশেষে, ধনীরা যেমন তাদের সম্পদ অর্জন, মজুদ, রক্ষা এবং বৃদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, এটি তাদের সৎ কাজ করা থেকে বিভ্রান্ত করে যা বিচার দিবসে কাউকে ধনী করে তোলে। বাস্তবে, এটিকে হারানো তাদের দরিদ্র করে তুলবে।

এটা মনে রাখা জরুরী, সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করা মানে শুধু দাতব্য দান করা নয় বরং এর মধ্যে অযথা বা অপব্যয় না করে তাদের প্রয়োজনীয় এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এই ব্যক্তি দুনিয়া ও পরকালে ধনী হবে। এবং এই মনোভাব অনেক সম্পদ থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। যেকোন পরিমাণ সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একজন ব্যক্তি ধনী হতে পারে যদিও তার কাছে সামান্য সম্পদ থাকে। বাস্তবে, এই ব্যক্তি তাদের সম্পদ তাদের সাথে পরকালে নিয়ে যায় এবং এই মনোভাব তাদের অবসর সময় দেয় যা তাদেরকে সৎ কাজ করতে দেয় যা পরকালে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

# তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাঃ)-3

তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যখন একজন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে (অপ্রয়োজনীয়ভাবে), তখন তাদের কাছ থেকে তাদের দ্বীন কেড়ে নেওয়া হয়, এমনকি তারা তা উপলব্ধি না করেও। সালিহ আহমাদ আশ-শামীর, মাওয়ায়েজ আল সাহাবাহ, পৃষ্ঠা 293- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কীভাবে নাজাত অর্জন করতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

উল্লেখিত জিনিসগুলির মধ্যে একটি হল যে কোনও ব্যক্তি অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হবেন না। এইভাবে আচরণ করা সময় নষ্ট করে এবং মৌখিক ও শারীরিক উভয় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যদি কেউ সত্যিই আন্তরিকভাবে প্রতিফলিত করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের বেশিরভাগ পাপ এবং তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতার কারণে হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে এটি সর্বদা অন্যের দোষ ছিল তবে এর অর্থ যদি কেউ অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এড়িয়ে যায় তবে তারা কম পাপ করবে এবং কম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এটি তাদের ইসলামিক শিক্ষাগুলিকে আরও শিখতে এবং তার উপর কাজ করার সময়কে খালি করবে যা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উপকারী।

# আনাস বিন নাদর (রাঃ)- ১

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশটি আর প্রয়োগ করা হয়নি। যখন তারা উহুদ পর্বত থেকে নেমে আসে তখন এটি মুসলিম বাহিনীর পিছনের অংশকে উন্মোচিত করে দেয়। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা বেড়ে যায় যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করা হয়েছে বলে দাবি করা শোনা যায়। এর ফলে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাদের শক্তি এবং অনুপ্রেরণার কারণে শহিদ হয়েছিলেন বলে আশা হারান। কিন্তু একজন সাহাবী আনাস বিন নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করলেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেলেও মহান আল্লাহ চিরজীবী এবং মৃত্যুবরণ করতে পারবেন না। তাই তাদের উচিত মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আনাস বিন নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 29-31-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারীরিকভাবে আজ মুসলমানদের মধ্যে নেই, ইসলামের প্রকৃত দূত হয়ে তিনি যে জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তার জন্য তাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এটি অর্জনের

সর্বোত্তম উপায় হল মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর পছন্দের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। ইসলাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা এই দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। যখন তারা উপকারী জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তার উপর কাজ করেছিল তখন বহির্বিশ্ব তাদের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল। এর ফলে অগণিত মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। দুর্ভাগ্যবশত, আজকে অনেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের দেখানো শুধুমাত্র একজনের চেহারা, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা। এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার একটি দিক মাত্র। পবিত্র কুরআনে আলোচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবলম্বন করা এবং তাঁর ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় অংশ। শুধুমাত্র এই মনোভাব নিয়েই বহির্বিশ্ব ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ অবলোকন করবে। একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে ইসলামিক চেহারা গ্রহণ করা শুধুমাত্র বহির্বিশ্বকে ইসলামকে অসম্মান করার কারণ করে। তাদের এই অসম্মানের জন্য দায়ী করা হবে কারণ তারা এর কারণ। তাই একজন মুসলমানের উচিত ইসলামের বাহ্যিক রূপের পাশাপাশি ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃত দূত হিসেবে আচরণ করা।

উপরন্তু, এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, মুসলমানদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে যে তারা বিচারের দিনে এই ভূমিকা পালন করেছে কি না। একজন বাদশাহ যেভাবে তাদের কূটনীতিক ও প্রতিনিধির উপর ক্রুদ্ধ হবেন যদি তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহান আল্লাহও সেই মুসলিমের উপর ক্রুদ্ধ হবেন যারা ইসলামের দূত হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

# উবাইদা হা বিন হারিস (রাঃ)- ১

বদরের যুদ্ধের সময়, উবাইদাহ (রা.) একটি দ্বন্দ্বে অংশ নিয়েছিলেন যেখানে তিনি তার প্রতিপক্ষকে মারাত্মকভাবে আহত করেছিলেন কিন্তু নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। যখন তাকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি নিশ্চিত করেন যে তিনি একজন শহীদ। তিনি মারা যাওয়ার আগে উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছিলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের নিম্নোক্ত কবিতাটি তাঁর জন্য বেশি প্রযোজ্য ছিল: “আমরা তাকে রক্ষা করব। নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতক্ষণ না আমরা আহত হই এবং তাঁর চারপাশে মৃত হয়ে পড়ি। আমাদের নিজেদের সন্তান ও স্ত্রীদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।” ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 500-501- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

*"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"*

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

*"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."*

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মাদ ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

# যায়েদ বিন দাথিনা (রাঃ)- ১

যায়েদ, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার মক্কার একজন অমুসলিমকে বন্দী করে বিক্রি করা হয়েছিল, যে তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিল, যাকে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের সময় নিহত হয়েছিল। বদরের। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে, আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি চান যে তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে স্থান পরিবর্তন করতে পারেন, যাতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়? তার জায়গায়। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিলেন যে, তিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ে কাঁটা বিদ্ধ করার চেয়ে নিজের মৃত্যুদণ্ড পছন্দ করবেন। আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তখন মন্তব্য করেন যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবাসতে দেখেননি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 508-509- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বাসের প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 165 নম্বর, উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি তখনই ঈমানের মাধুর্য আস্বাদন করবে যখন সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসবে। . সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত আরেকটি হাদিস, 168 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এই সত্যের কারণে মুসলমানরা সবাই দাবি করে যে তারা মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালবাসে। কিন্তু এটি একটি দাবি যা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা আবশ্যক। অন্যথায় মহান আল্লাহর কাছে এর কোনো মূল্য থাকবে না।

ভালোবাসার প্রথম নিদর্শন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে, কেউ যদি মহান আল্লাহকে ভালোবাসে এবং তাঁর ভালোবাসা ও ক্ষমা কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই বাস্তবিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মোহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"*

এর অর্থ হল একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুকরণ করার চেষ্টা করতে হবে, তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর ঐতিহ্যকে তাদের জীবনে প্রয়োগ করে। তাদের অবশ্যই তার আদেশ পালন করতে হবে এবং তার নিষেধ এড়িয়ে চলতে হবে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

*“...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন তা নাও; এবং তিনি আপনাকে যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাকুন..."*

একজনকে তার ঐতিহ্য থেকে বাছাই করা উচিত নয় এবং শুধুমাত্র তাদের আচরণে প্রয়োগ করা উচিত যখন এটি তাদের জন্য উপযুক্ত। যে ব্যক্তি এটি করে সে কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার দাবি করছে। এই ভুল মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন হল যে, একজন ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত কর্মের অগ্রাধিকার পরিবর্তন করে । উদাহরণস্বরূপ, তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মকে অগ্রাধিকার দেবে, যা তাঁর অন্যান্য কর্মের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 5363 নম্বর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর পরিবারকে বাড়ির কাজে সাহায্য করতেন কিন্তু নামাজের সময় হলে তিনি ইমামতি করতে চলে যেতেন। মসজিদে জামাতের নামাজ। যদি কেউ তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করে কিন্তু বৈধ অজুহাত ছাড়া জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে উপস্থিত না হয় তবে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না। এর কারণ তারা কর্মের অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস করেছে। মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ঘরের কাজে সাহায্য করার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়। এবং যদি একজন ব্যক্তি এই অগ্রাধিকারটি পুনরায় সাজায় তবে তারা তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না। নিজের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা নিঃসন্দেহে একটি উত্তম কাজ কিন্তু তারা যদি এমন আচরণ করে তাহলে তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি অনুসরণ করছে না, যদিও তা মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মুসলমানদের বুঝতে হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা অত্যাবশ্যক, এর মানে এই নয় যে মুসলমানদের সৎ কাজ করা বন্ধ করা উচিত। এর অর্থ হল তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

# খুবায়েব বিন আদী (রাঃ)- ১

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার বন্দী করা হয়েছিল এবং মক্কার একজন অমুসলিমকে বিক্রি করা হয়েছিল, যে তার আত্মীয়ের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিল, যে খুবায়ব রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের সময় নিহত হয়েছিলেন। বদরের। খুবায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু, যেদিন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল সেদিন নিজেকে পরিষ্কার করার জন্য একটি ক্ষুর অনুরোধ করেছিলেন। একজন নারী ক্রীতদাসী তার ছোট ছেলেকে খুবায়বের কাছে পাঠিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যাকে তাদের ঘরে ক্ষুর দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি একটি ভুল করেছেন এবং ভয়ে ছিলেন খুবাইব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শিশুটিকে হত্যা করতে পারেন। তিনি শিশুটিকে তার কোলে বসে থাকতে দেখেন এবং তিনি শিশুটিকে তার হাতে তুলে দেন এবং মন্তব্য করেন যে তিনি কখনই একটি শিশুর ক্ষতি করবেন না। সেই দিন, তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় তিনি দুটি চক্র প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যা তাকে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ইসলাম ত্যাগ করার আশায় তারা তাকে নির্যাতন করে, কিন্তু সে অটল থাকে। অবশেষে, মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 509-510- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও খুবায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু অমুসলিমদের প্রতি তাঁর সদাচরণ বজায় রেখেছিলেন।

সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের

মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

# কাতা আদাহ বিন নুমান (রহঃ)- ১

উহুদের যুদ্ধের সময়, কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শরীরকে মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, তাঁকে লক্ষ্য করে তীরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য। কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর তীরের আঘাত ঠেকাতে তাঁর মুখমন্ডল ব্যবহার করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁর একটি চোখ তার সকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতে তাঁর বরকতময় সালভিয়া লাগিয়ে চোখের সকেটে ফিরিয়ে দিলেন এবং এর পুনরুদ্ধারের জন্য দোয়া করলেন। চোখটি তাত্ক্ষণিকভাবে নিরাময় করা হয়েছিল এবং তার বাকি জীবনের জন্য তার দুটি চোখের চেয়ে ভাল হয়ে উঠেছে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 538- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92 এর সাথে সংযুক্ত:

*“তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।*

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যার অর্থ, তারা তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি ধারণ করবে, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক

হয়। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এটি প্রত্যেকটি দোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানরা তাদের খুশির জিনিসগুলিতে তাদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে যা দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডে তাদের শারীরিক শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি, তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটি উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে, লোকেরা এমন জিনিসগুলিতে চেষ্টা করতে পেরে খুশি যা তারা কামনা করে যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন হয় না যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় করতে হবে এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হবে তবুও কতজন আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এইভাবে চেষ্টা করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে উচুঁ? কতজন স্বেচ্ছায় নামাজ পড়ার জন্য তাদের মূল্যবান ঘুম ছেড়ে দেয়?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উৎসর্গ করবে। কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত.

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় গমন করে ইসলাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এই সময়ে মহান আল্লাহ তার হৃদয়ে ইসলামের আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করেছিলেন এবং তাকে তা চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তারপর তিনি উল্লেখ করেন যে কিভাবে তিনি আরবের দেশগুলোকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যদিও এই অমুসলিমরা তাদের দেশে যা করেছে তা নিন্দনীয় ছিল এবং তার মনে হয়েছিল যেন তিনি তাদের মধ্যে নন। . তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে তিনি জানতেন যে ইসলাম নামক সত্যটি শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে তাই তিনি মদিনার দিকে যাত্রা করার এবং ইসলাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 323-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমস্ত বয়সের অনেক লোক তাদের জীবনের মধ্যে থেকে এই ধরণের শূন্যতা অনুভব করে। কেউ কেউ এই অনুভূতিকে মধ্য-জীবনের সংকটের সাথেও সংযুক্ত করে। একজন ব্যক্তি যিনি এটি অনুভব করেন প্রায়শই তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং তাদের জীবনে একটি বিশাল শূন্যতা অনুভব করে যদিও তারা অনেক কিছুর অধিকারী হতে পারে এবং অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ এই লোকেরা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করছে না যা হল মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, যাতে তারা সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে এবং উপাসনা করতে পারে। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যার সর্বশেষ মোবাইল ফোনের মালিক যার এখনও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি ত্রুটির কারণে এটি তার প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় যা ফোন কল করা। এই অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি যতই ভাল হোক না কেন মালিক সর্বদা এটির ক্ষেত্রে একটি শূন্যতা অনুভব করবেন কারণ

ফোনটি তার অস্তিত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করে না। একইভাবে, একজন ব্যক্তি তাদের জীবনে শূন্যতা অনুভব করবে যদিও তার কাছে অনেক পার্থিব জিনিস থাকে। এই অনুভূতি মুসলিম এবং অমুসলিমদের প্রভাবিত করে। এটা স্পষ্ট যে কেন অমুসলিমরা এইরকম অনুভব করে কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ থেকে আরও দূরে থাকতে পারে না তাই তারা যাই অর্জন করুক না কেন তারা তাদের জীবনে এই শূন্যতা অনুভব করে। এটি সেই সমস্ত মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটে যারা এমনকি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে পারে কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা এই শূন্যতা অনুভব করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা আরবি ভাষাও বোঝে না তাই কেবল উপাসনা করলে এই শূন্যতা পূরণ হয় না। কেউ এই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য চেষ্টা করবে যা হল মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, যাতে তারা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য ও উপাসনা করতে পারে।

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রহঃ)- ২

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার খালিদ রা.-কে একটি অভিযানের নেতা হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন, যার মধ্যে আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিবাদ ছিল এবং এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে আসেন, যিনি রায় দেন। খালিদ, আম্মার (রাঃ) এর সমালোচনা করেন, এবং এর ফলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাকে সতর্ক করেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা আম্মারকে অপছন্দ করেন এমন কাউকে অপছন্দ করেন, এবং যে ব্যক্তি আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তায়ালা তাকে অভিশাপ দেন। যখন আম্মার, খালিদ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, জমায়েত ছেড়ে চলে গেলেন, তাকে অনুসরণ করলেন এবং তাকে খুশি করার চেষ্টা করতে লাগলেন যতক্ষণ না তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 102-103- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খালিদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, স্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর গভীর আন্তরিকতা এবং আনুগত্যকে নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের

নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়ীনাহ, আয়াত 5।

*"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"*

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

*"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"*

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির

জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) – ৩

তাঁর খিলাফতকালে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, যাকে ভন্ড নবী তুলাইহা আল আসদী এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, যারা একটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বল তুলাইহা তাইয় গোত্রকে তার ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানায় এবং তারা প্রাথমিকভাবে তাদের অনেক সৈন্যকে তার অভিযানে যোগদানের জন্য পাঠিয়েছিল। আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, আদী বিন হাতেম, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এই গোত্রের কাছে, একটি গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তাদের ধর্মত্যাগ না করতে রাজি করানো যায়। তারা শেষ পর্যন্ত তার উপদেশ গ্রহণ করে এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তুলাইহাতে যোগ দিতে যে যোদ্ধারা বেরিয়েছিল তাদের ফেরত ডাকবে। যখন খালিদ শেষ পর্যন্ত আদির সাথে দেখা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন পরেরটি তাইয় গোত্রের উপর আক্রমণ বন্ধ রাখতে প্রাক্তনকে রাজি করাতে সক্ষম হয়, যদিও তাদের প্রাথমিক পদক্ষেপের ফলে কিছু সাহাবী মারা যায়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। খালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, প্রতিশোধের জন্য তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে পারতেন কিন্তু পরিবর্তে তিনি তিন দিন অপেক্ষা করতে রাজি হন। এই সময়ের মধ্যে তাইয় গোত্রের সৈন্যরা, যারা প্রথমে তুলাইহাতে যোগদানের জন্য বেরিয়েছিল , তারা ফিরে আসে এবং তারা সবাই আদী বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে খালিদ ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেয়, আল্লাহ খুশি হন। তাদের ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 430-437- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে খালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাইয় গোত্রকে আক্রমণ করার ক্ষমতা ছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। অতএব, একটি বিপজ্জনক এবং সহিংস পরিস্থিতি পুনর্মিলন এবং শান্তির মধ্যে পরিণত হয়েছিল।

জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা বোঝার এবং তার উপর কাজ করার জন্য মুসলমান যারা অনেক সৎ কাজ করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্রোধের সাথে কিছু খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং অসুবিধা, যেমন তর্ক-বিতর্ক, ঘটতে পারে কারণ লোকেরা জিনিসগুলি চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই আগে আসে যখন তারা জানে যে তাদের কথা বা কাজ পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে ভাল এবং উপকারী।

যদিও, একজন মুসলমানের এখনও সৎকাজ সম্পাদনে বিলম্ব করা উচিত নয়, তবুও তাদের সেগুলি সম্পাদন করার আগে কিছু চিন্তা করা উচিত। এর কারণ হল একটি সৎ কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর শর্ত ও শিষ্টাচার কারোর তাড়াহুড়ার কারণে পরিপূর্ণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করার পরেই একজনকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কেবল তাদের পাপগুলিকে কম করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াবে, তবে তারা তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং মতানৈক্যের মতো সমস্যাগুলিকে কমিয়ে দেবে।

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) – ৪

তাঁর খিলাফতকালে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, যাকে ভন্ড নবী তুলাইহা আল আসদী এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, যারা একটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বল তুলাইহা তাইয় গোত্রকে তার ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানায় এবং তারা প্রাথমিকভাবে তাদের অনেক সৈন্যকে তার অভিযানে যোগদানের জন্য পাঠিয়েছিল। আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, আদী বিন হাতেম, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এই গোত্রের কাছে, একটি গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তাদের ধর্মত্যাগ না করতে রাজি করানো যায়। তারা শেষ পর্যন্ত তার উপদেশ গ্রহণ করে এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তুলাইহাতে যোগ দিতে যে যোদ্ধারা বেরিয়েছিল তাদের ফেরত ডাকবে। যখন খালিদ শেষ পর্যন্ত আদির সাথে দেখা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন পরেরটি তাইয় গোত্রের উপর আক্রমণ বন্ধ রাখতে প্রাক্তনকে রাজি করাতে সক্ষম হয়, যদিও তাদের প্রাথমিক পদক্ষেপের ফলে কিছু সাহাবী মারা যায়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। খালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, প্রতিশোধের জন্য তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে পারতেন কিন্তু পরিবর্তে তিনি তিন দিন অপেক্ষা করতে রাজি হন। এই সময়ের মধ্যে তাইয় গোত্রের সৈন্যরা, যারা প্রথমে তুলাইহাতে যোগদানের জন্য বেরিয়েছিল , তারা ফিরে আসে এবং তারা সবাই আদী বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে খালিদ ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেয়, আল্লাহ খুশি হন। তাদের

তখন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধর্মত্যাগকারী দুটি আরব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল: বনু আসাদ এবং বনু কাইস। তাইয় গোত্রের বনু আসাদের সাথে শান্তির একটি পুরানো চুক্তি ছিল এবং তাই তারা অবিলম্বে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়নি এবং তাই খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করেছিল, যদি তারা তার পরিবর্তে বনু কায়েসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ

করতে পারে। তিনি তাদের অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন, যদিও আদি, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর লোকেদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কারণ তিনি তাদের দাবি করেছিলেন যে তারা যেই হোক না কেন ইসলামকে সকল শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৪৪৩-৪৪৪-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, সঠিক আহ্বান জানিয়েছিলেন কারণ তিনি তাইয় উপজাতিকে এমন একটি আপোষমূলক অবস্থানে রাখতে চান না যেখানে তারা আবার ধর্মত্যাগ করতে পারে। তারা স্পষ্টতই একটি চঞ্চল লোক ছিল, তাই এটি ঘটার সম্ভাবনা ছিল বাস্তব এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে, যদি তারা যুদ্ধের সময় তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

খালিদ, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস না করে নমনীয় পদ্ধতিতে কাজ করেছিলেন। এটি গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের বিষয়ে অটল থাকা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু অধিকাংশ পার্থিব বিষয়ে একে বলা হয় একগুঁয়েমি, যা দোষারোপযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে বা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার

করছে এবং এই কারণে তারা জেদীভাবে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে এই বিশ্বাস করে যে তারা যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ তারা হেরেছে এবং অন্যরা যারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে তারা জিতেছে। এটা নিছক শিশুসুলভ।

প্রকৃতপক্ষে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকবে তবে পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, যতক্ষণ না এটি পাপ নয়, তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় এটি আসলে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের জীবনে অন্যরা তাদের পরিবর্তন করতে চান, যেমন তাদের আত্মীয়রা। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হ'ল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের উচিত তার চেয়ে ভাল পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্কে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ ভালোর জন্য একজনের চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রকৃত শক্তি লাগে।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায় যা তাদের জীবন থেকে শান্তি সরিয়ে দেবে। এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে তারা সবসময় শান্তির এক স্টেশন থেকে

অন্য জায়গায় চলে যায়। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে তবে অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলে তারা পরিবর্তন করেছে তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

উপসংহারে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পাপ সংঘটিত হয় না একজন ব্যক্তির উচিত মানিয়ে নিতে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি পায়।

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রহঃ) – ৫

তার খিলাফতকালে, আবু বক্কর খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ভন্ড নবী তুলাইহা এবং তার অনুসারীদের সাথে লড়াই করার জন্য। যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে খালিদ, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তুলাইহাকে একটি ছোট কিন্তু আশ্চর্যজনক বার্তা পাঠান। চিঠিতে লেখা ছিল: "প্রকৃতপক্ষে, আমি এমন একদল লোকের সাথে আপনার কাছে এসেছি যারা মৃত্যুকে ভালবাসে ঠিক আপনার জীবনকে ভালবাসে।" যুদ্ধ শুরু হলে, অবশেষে তুলাইহার বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি নিজের জীবনের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর জীবনী আবু বকর আস সিদ্দীক, পৃষ্ঠা ৪৪৬-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বার্তাটি স্পষ্টভাবে একটি বড় কারণ নির্দেশ করে যে কেন মুসলমানরা অপরাজেয় ছিল। যেহেতু তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তার অধিকারী ছিল, তারা জানত যে হয় তারা যুদ্ধে জয়লাভ করে পুরস্কার ও পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করবে অথবা মহান আল্লাহর রহমতে তারা নিহত হবে এবং জান্নাত লাভ করবে। পরকালের জন্য তাদের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনের মূল্য দিয়েও ইসলামের উপর অটল থাকতে প্ররোচিত করেছিল। দৃঢ় ঈমানের মূলে থাকা এই দৃঢ়তা হারানোর কারণেই ইসলামি জাতির শক্তি বছরের পর বছর ক্ষয়ে গেছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই এমন একটি দিন আসবে যখন অন্যান্য জাতি মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করবে এবং যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হবে। বিশ্বের কাছে তুচ্ছ মনে করা। মহান আল্লাহ অন্যান্য জাতির অন্তর থেকে

মুসলমানদের ভয় দূর করবেন। বস্তুজগতের প্রতি মুসলিম জাতির ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে এটি ঘটবে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তখনও সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন অথচ মুসলমানরা আজ সংখ্যায় অনেক বেশি, বিশ্বে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নেই। এর কারণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছেন, দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগের চেয়ে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন । অথচ বর্তমানে মুসলমানদের অধিকাংশই বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাপের মূল হল জড় জগতের ভালবাসা। কারণ যে কোন পাপ সংঘটিত হয় তা ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয়। বস্তুগত জগতকে চারটি দিকে বিভক্ত করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু। এই জিনিসগুলির অত্যধিক সাধনা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ভাগ্যের প্রতি ভালবাসা থেকে অবৈধ সম্পদ উপার্জন করা। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, সম্পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি ভালোবাসা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক, তার চেয়েও বেশি ধ্বংসকারী দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ছেড়ে দিলে। যখনই মানুষ জড় জগতের এই দিকগুলোর আধিক্য অন্বেষণ করে তা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন এটি ঘটে তখন মহান আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায় যা কষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে না।

যদিও, কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে যে বস্তুজগতের অতিরিক্ত জিনিসের অনুসরণ করা ক্ষতিকারক নয় এটি এমন একটি বিষয় যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে অনেক হাদিসে সতর্ক করেছেন যেমন সহীহ বুখারি, 3158 নম্বরে পাওয়া যায়। তিনি সতর্ক করেছিলেন। যে তিনি মুসলমানদের জন্য

দারিদ্রকে ভয় করতেন না। তার আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা এই জড় জগতের আধিক্যের পিছনে ছুটবে, যেমন অতিরিক্ত সম্পদ, এবং এর ফলে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই হাদীসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, এটাই ছিল অতীতের জাতিসমূহের আচরণ।

বস্তুগত জগত যেহেতু সীমিত, এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায় তাহলে এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যেমন অন্যদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা। তারা একে অপরের যত্ন নেওয়া বন্ধ করবে কারণ তারা জড়জগতকে সংগ্রহ এবং মজুদ করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এবং তারা সহীহ বুখারি, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে প্রদত্ত উপদেশের বিরোধিতা করবে, যেটি পরামর্শ দেয় যে মুসলমানদের একটি শরীরের মতো আচরণ করা উচিত যখন শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হয় তখন শরীরের বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা একজন মুসলিমকে অন্যদের জন্য ভালবাসা বন্ধ করতে চালিত করবে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য, কারণ তারা পার্থিব বিষয়ে তাদের সহ-মুসলমানদের ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই প্রতিযোগিতায় অটল থাকা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে বস্তুজগতের স্বার্থে ভালবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং রোধ করবে, যা সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। আবু দাউদ, নম্বর 4681। এই প্রতিযোগিতা হল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং আজকের অনেক মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য।

মুসলমানরা যদি একবার ইসলামের শক্তি ও প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে চায়, তাহলে তাদের এই জড় জগতের আধিক্য অর্জন ও সঞ্চয় করার চেষ্টার চেয়ে

আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি একটি পৃথক স্তর থেকে ঘটতে হবে যতক্ষণ না এটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে।

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রহঃ)- ৬

যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে বিপজ্জনক মিথ্যা নবী ছিলেন মুসায়লিমা, মিথ্যাবাদী। খলিফা আবু বক্কর খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠালেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। মুসায়লিমার কিছু অনুসারী যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মিথ্যাবাদীকে বন্দী করা হয়। খালিদ, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তাদের নেতার সাথে কথা বলে তাকে ইসলামের সত্যতা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, মুসায়লিমা, মিথ্যাবাদী, যে কবিতাটি রচনা করেছেন তা তাঁর কাছে পবিত্র কুরআন পাঠ করে অকেজো আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন নেতা খালিদকে দিতে ব্যর্থ হন, তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, অবশেষে বললেন, “তাহলে মহান আল্লাহই আপনার বিরুদ্ধে আমাদের জন্য যথেষ্ট। এবং তিনি তাঁর ধর্মকে সম্মান করবেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাঁর বিরুদ্ধে যে তোমরা যুদ্ধ করছ, যদিও এটি তাঁরই ধর্ম যা তোমরা (ধ্বংস করতে) চাইছ।” ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 490-492- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি খালিদ রা.-এর দৃঢ় বিশ্বাসকে তুলে ধরে। তিনি তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেননি এবং মিথ্যাবাদী মুসাইলিমাকে চ্যালেঞ্জ করেননি, তার উন্নত কৌশল, জনশক্তি এবং অস্ত্রের উপর নির্ভর করে বরং তিনি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে মিথ্যাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। একটি নির্ভরতা যার মূল ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। ঈমানের নিশ্চিততা অর্জনের জন্য ইসলামি জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। এর মাধ্যমে তারা সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠবে, ঠিক যেমনটি খালিদ রা.

সকল মুসলমানের ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয় । যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমানের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলমান বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণরূপে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

*"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"*

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন

তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রহঃ)- ৭

রোমান সাম্রাজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য খলিফা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক সিরিয়া যাওয়ার নির্দেশ পাওয়ার পর, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক থেকে সিরিয়ায় যাওয়ার জন্য একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। , যাতে রোমানরা সতর্ক না হয়, যারা তাদের সীমানা পাহারা দিচ্ছিল। দীর্ঘ ও কঠিন যাত্রার প্রস্তুতির জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পর তিনি মন্তব্য করেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য একজন মুসলমানের সাথে থাকে ততক্ষণ তাদের কোনো অসুবিধায় তাদের বিরক্ত করা উচিত নয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬০৫-৬০৬-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উভয় দিকই পূরণ করেছিলেন। প্রথমটি হল মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করা। এবং দ্বিতীয়টি হল আত্মবিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস করা যে পরিস্থিতির ফলাফল, যা সর্বদা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম হবে।

মুসলমানরা প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কিভাবে তারা মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থা গড়ে তুলতে এবং শক্তিশালী করতে পারে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি করার একটি প্রধান উপায় হল মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এর কারণ এই যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অবাধ্য, সে সর্বদা আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, তাদের সাহায্য করবে না যা তার প্রতি তাদের আস্থাকে দুর্বল করে দেয়। অথচ, আনুগত্যকারী মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, তারা যেহেতু

তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, মহান আল্লাহ অবশ্যই তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের প্রতি সাড়া দেবেন, যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থা শক্তিশালী হবে।

উপরন্তু, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতি তাদের উপলব্ধি অনুযায়ী সাড়া দেন। অবাধ্য ব্যক্তির অবাধ্যতার কারণে সর্বদা মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থাকবে। যদিও, একজন আনুগত্যকারী মুসলমান সর্বদা তাদের আনুগত্যের কারণে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করবে। এই চিন্তাশক্তি মহান আল্লাহর প্রতি একজন মুসলমানের বিশ্বাসকে দুর্বল বা শক্তিশালী করতে পারে। আনুগত্যশীল মুসলিম বিশ্বাস করে যে যদি তারা একটি ব্যবসায়িক চুক্তির তাদের দিকটি পূরণ করে তবে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারও একই কাজ করবে। অনুরূপভাবে, একজন আনুগত্যশীল মুসলিম বিশ্বাস করে যে তারা যেমন মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন তাদের সারা জীবন বিশেষ করে, অসুবিধার মধ্যে সাহায্য করার মাধ্যমে। যদিও, যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়িক চুক্তির তাদের পক্ষ পূরণ করে না সে বিশ্বাস করবে না বা আশা করবে না যে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার তাদের পক্ষ পূরণ করবে। একইভাবে, একজন অবাধ্য ব্যক্তি বিশ্বাস করবে না যে মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন কারণ তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্থা রাখা এবং তার আনুগত্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। একজন যত বেশি আনুগত্য করবে তত বেশি তারা তাঁর উপর আস্থা রাখবে। তারা যত কম আনুগত্য করবে তত কম তারা তাঁর উপর আস্থা রাখবে।

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) – ৮

সিরিয়া অভিযানের সময়, মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতারা খলিফা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুমতি নিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তের কাছাকাছি ইয়ারমুকের ভূমিতে পশ্চাদপসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। আবু বক্কর খালিদ বিন ওয়ালিদ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সমস্ত সেনাবাহিনীর নেতা হিসাবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নেতাদেরকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু তাদের মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলিও তুলে ধরতে তার পথের বাইরে চলে গিয়েছিলেন, যাতে তারা খালিদকে নিয়োগের জন্য বিচ্ছিন্ন বোধ না করে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি যেমন চাননি তাঁর এবং তাঁর মুসলিম ভাইদের মধ্যে কোনো নেতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টি হোক। কিন্তু যেহেতু এই নেতারা ছিলেন মহান সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন, তারা তাঁর নেতৃত্বকে উন্মুক্ত অস্ত্র দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬৬১-৬৬৪-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তারা এইভাবে আচরণ করেছিল যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একত্রিত হয়েছিল, পার্থিব কারণে নয়।

সময়ের সাথে সাথে লোকেরা প্রায়শই বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে তাদের একসময়ের শক্তিশালী সংযোগ হারায়। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না

হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যেখানে, বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

*"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."*

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রহঃ)- ৯

ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, একজন রোমান সেনাপতি জারজাহ আলাপচারিতার জন্য খোলা যুদ্ধের ময়দানে খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের এমন কিছু শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন যা সম্পর্কে তিনি অনিশ্চিত ছিলেন। কিছু মৌলিক বিষয় শোনার পর, যেমন সাম্যের গুরুত্ব, তিনি খালিদের সাথে মুসলিম শিবিরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৭-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জারজাহ জটিল বা গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি যা তাকে বিস্মিত করেছিল এবং তাকে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে বোঝানোর জন্য কোন অলৌকিক ঘটনাও দেখানো হয়নি, তবুও তিনি সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে তার বিশ্বাস, আচরণ এবং জীবনধারা পরিবর্তন করেছিলেন। এর কারণ তিনি আন্তরিকতার সাথে সত্যের সন্ধান করতে এসেছেন। যখন কেউ এই ঘোষণা করে আন্তরিকতা অবলম্বন করে যে তারা সত্যকে গ্রহণ করবে এবং তাদের সাধ্যমত তা অনুসরণ করবে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, তখন এমনকি সরলতম সত্য, অন্যদের দ্বারা উপেক্ষিত সত্যগুলিও তাদের সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে আসে, চেরি-পিকিং মনোভাব নিয়ে এবং শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিকে গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে যা তাদের সন্তুষ্ট করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এমন বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে সে কখনই সঠিকভাবে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, যদিও সে মুসলিম হয়। এই আন্তরিকতার কারণেই ইতিহাসের অনেক মানুষ গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নয় বরং সহজতম জিনিসের মুখোমুখি হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই আন্তরিকতা মুসলমানদের অবশ্যই গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এটি ছাড়া ইসলামকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)- ১০

উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতকালে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যান। তার শেষ কথায় অন্তর্ভুক্ত ছিল: "...আমি অমুক এবং অমুক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমার শরীরে এমন কোন স্থান নেই যেটা তরবারির আঘাত পায়নি বা তীর বা বর্শা দিয়ে বিদ্ধ হয়নি, তবুও আমি এখানে আছি, উট মরে আমার বিছানায় মরে। কাপুরুষেরা কখনো উন্নতি না করুক। আমি মৃত্যু (শহীদ) চেয়েছিলাম যেখানে এটি চাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এটি কেবলমাত্র আমার নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 115-116- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর অসীম এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি যদি একজন ব্যক্তির উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাদের তা করতে চাননি। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রে কারো ক্ষতি করতে পারে না। এর অর্থ একমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেন তা মহাবিশ্বের মধ্যে ঘটে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই উপদেশটি ওষুধের মতো উপায় ব্যবহার ত্যাগ করার ইঙ্গিত দেয় না, তবে এর মানে হল যে কেউ উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ সেগুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করেছেন, তবে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহই সকল কিছুর ফলাফল নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অনেক অসুস্থ ব্যক্তি যারা ওষুধ খান এবং তাদের অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তারা অন্য যারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয় না। এটি ইঙ্গিত করে যে আরেকটি কারণ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে, তা হল মহান আল্লাহর ইচ্ছা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

*"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমরা কখনই আঘাত করব না..."*

যিনি এটি বোঝেন তিনি জানেন যে তাদের প্রভাবিত করে এমন কিছু এড়ানো যেত না। এবং যে জিনিসগুলি তাদের মিস করেছে সেগুলি কখনই পাওয়া যেত না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেষ ফলাফল যাই হোক না কেন তা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাদের ধৈর্য ধরে থাকা উচিত এবং সত্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম নির্বাচন করেছেন যদিও তারা ফলাফলের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

যখন কেউ এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে তখন তারা সৃষ্টির উপর নির্ভর করা বন্ধ করে দেয় যে তারা জন্মগতভাবে তাদের ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। পরিবর্তে, তারা মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সমর্থন ও সুরক্ষা কামনা করে। এটি একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দিকে

পরিচালিত করে। এটি একজনকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

স্বীকার করা , মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝার একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয় যার কোন শেষ নেই এবং এটি কেবলমাত্র অতিমাত্রায় বিশ্বাস করার বাইরে চলে যায় যে মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। যখন এটি কারও হৃদয়ে স্থির হয় তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর উপর আশা করে, তারা জানে যে একমাত্র তিনিই তাদের সাহায্য করতে পারেন। তারা কেবল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করবে এবং আনুগত্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পেতে বা কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্যের আনুগত্য করে। একমাত্র মহান আল্লাহই এটি প্রদান করতে পারেন তাই কেবলমাত্র তিনিই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যের আনুগত্য পছন্দ করে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে যে এই অন্যটি তাদের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা তাদের ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। যা কিছু ঘটে তার উৎস হল আল্লাহ, মহান, তাই মুসলমানদের শুধুমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা উচিত। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

*“আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন- কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না..."*

উল্লেখ্য যে, এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উৎসাহিত করে, বাস্তবে মহান আল্লাহকে মান্য করা। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

*"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."*

# খালিদ বিন ওয়ালিদ (রহঃ) – ১১

উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতকালে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং লোকেরা তাঁর জন্য প্রচুর শোক প্রকাশ করেছিল। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে লোকেরা তার জন্য কাঁদতে দেওয়া উচিত, যতক্ষণ না তারা বকবক করছে (পাপপূর্ণ বক্তৃতায় জড়িত)। তিনি এই বলে শেষ করলেন যে, খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পছন্দের জন্য, কান্নাকারীদের কাঁদতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 116-117- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 3127 নম্বর, সতর্ক করে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে প্রিয়জনকে হারানোর মতো কঠিন সময়ে কান্না করা অনুমোদিত নয়। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায় তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284

নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নাতি যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্নার জন্য বা তাদের হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে যদি তারা মহান আল্লাহর পছন্দের ব্যাপারে তাদের অধৈর্যতা প্রদর্শন করে এমন শব্দ উচ্চারণ করে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হারাম জিনিসগুলি হল কান্না, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা দুঃখে মাথা ন্যাড়া করা। যারা এইভাবে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর সতর্কবাণী। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। এইভাবে কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে যদি মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয় তবে তারাও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 18:

*"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না..."*

# আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)- ১

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার তাঁর মা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু সম্পদ চাইতে পাঠিয়েছিলেন, কারণ তারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছিলেন। তিনি যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলেন এবং বসলেন, তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে ফিরলেন এবং তাঁকে বললেন, যে ব্যক্তি স্বাধীন হতে চায়, মহান আল্লাহ , তাদের স্বাধীন করে তুলবে। যারা চাওয়া থেকে বিরত থাকতে চায়, মহান আল্লাহ তাদের বিরত রাখতে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি তাদের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে চায়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট। যে ব্যক্তি একটি উকিয়াহ (প্রায় 40টি রৌপ্য মুদ্রা) ধারণ করার সময় অন্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করে সে খুব বেশি দাবি করা হচ্ছে। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করেছিলেন যে তার উটের মূল্য তার চেয়েও বেশি এবং তাই তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত ছিলেন। সুনানে আন নাসায়ী, 2596 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6470 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকবে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ধৈর্য্য ধারণের চেষ্টা করবে তাকে মহান আল্লাহ ধৈর্য দান করবেন। আর যার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট তাকে স্বাবলম্বী করা হবে। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে ধৈর্যের চেয়ে বড় উপহার আর নেই।

প্রয়োজনে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনো ক্ষতি নেই তবে একজন মুসলমানের এই অভ্যাস করা উচিত নয় কারণ এতে আত্মসম্মান নষ্ট হতে পারে

। এটি বিপজ্জনক হতে পারে কারণ যে ব্যক্তি আত্মসম্মান হারায় তার পাপ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যরা তাদের সম্পর্কে যা চিন্তা করে তার যত্ন নেওয়া বন্ধ করে দেয়।

উপরন্তু, সাহায্যের জন্য অন্যদের দিকে ফিরে যাওয়ার আগে একজন মুসলিমকে তাদের দেওয়া সমস্ত উপায় ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে, মহান আল্লাহ তাকে মানুষের স্বাধীনতা দান করবেন। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ধৈর্যের জোর দিতে হবে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি মহান আল্লাহকে জানেন, তিনি ধৈর্যশীল মুসলিমকে একটি অগণিত পুরস্কার দেবেন, এই সত্যটি সম্পর্কে অজ্ঞ তার চেয়ে ধৈর্যশীল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে অভাবী নয় এবং জিনিসের জন্য লোভী নয়। এটি তখন ঘটে যখন কেউ মহান আল্লাহ কর্তৃক যা দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হয়, যা অর্জিত হয় যখন একজন সঠিকভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিকে যা সর্বোত্তম দান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

এই ব্যক্তি সত্যিকারের ধনী যেখানে সর্বদা জিনিসের জন্য লোভী এবং অভাবী সে অনেক সম্পদের অধিকারী হলেও দরিদ্র। এটি সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, ধৈর্য অবলম্বন করা জরুরী কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিটি উপাদানে প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। সহজ কথায়, ধৈর্য ছাড়া পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা সম্ভব নয়।

# আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ভূমিতে পৌঁছলে তিনি একটি খুতবা দেন। তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে তিনি ইসলামের পূর্বে লোকেরা যে সুদ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল তা বাতিল করে দিয়েছিলেন কারণ এটি অবৈধ ছিল। তিনি প্রথম যে সুদের অভিযোগ বাতিল ঘোষণা করেছিলেন তা ছিল তাঁর নিজের চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 210-211-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে

সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

উপরন্তু, আর্থিক সুদ একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে যে পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে তা বোঝায়। পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় অনেক ধরনের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল যে বিক্রেতা একটি নিবন্ধ বিক্রি করেছিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল, এই শর্তে যে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু নিবন্ধের দাম বাড়িয়ে দেবে। আরেকটি হল যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি পরিমাণ অর্থ ধার দেন এবং শর্ত দেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপটি ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সুদের হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সময়ে সুদের হার বাড়বে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য এই ধরনের লেনদেন।

যারা এটি বিশ্বাস করে তারা বৈধ বিনিয়োগ এবং আর্থিক স্বার্থ থেকে অর্জিত লাভের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যদি ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ হালাল হয় তবে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন হারাম বলে গণ্য হবে? তারা যুক্তি দেয় যে একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে এর থেকে লাভ করে। এমন পরিস্থিতিতে কেন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ পরিশোধ করবেন না? তারা চিনতে ব্যর্থ হয় যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনো উদ্যোগই লাভের পরম গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটা ঠিক নয় যে একা অর্থদাতাকে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির যে কোনও

সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটা ন্যায়ের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনো নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না যেখানে তাদের সম্পদ ধার দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা আইটেম থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা আইটেম তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায়সঙ্গতভাবে ঘটে না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের দেওয়া ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ধার করা তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি যদি ধার করা তহবিল প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোন লাভ হবে না। এমনকি যদি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তবে একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়েরই সুযোগ থাকে। তাই একটি সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির লাভ এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ ব্যবসা আর্থিক সুদের সমান নয়।

উপরন্তু, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদ যেভাবে কাজ করে তার কারণে ঋণ পরিশোধ করার পরেও তাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পরিমাণ প্রায়ই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক চাপ অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরনের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরা আরও ধনী হয় যখন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও বাহ্যিকভাবে আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করলে একজন ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি অনেক রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভাল এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা অর্জন করতে পারত যদি তারা আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার কারণে তারা তাদের মূল্যবান বেআইনি সম্পদ ব্যয় করতে পারে যার ফলে তাদের আনন্দদায়ক উপায়ে এটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে ততই তাদের লোভ অর্থে পরিণত হয়, তাদের পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারা দিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য বিষয়ে যাবে এবং তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা হালাল ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে থাকা অনুগ্রহ হারিয়েছে। এমনকি এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও বেআইনি সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আখেরাতের ক্ষতি আরো সুস্পষ্ট। হাশরের দিন তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ হারামের মধ্যে নিহিত কোনো ভালো কাজ যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান করা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কোথায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিত লাগে না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পূর্বেরটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে পরেরটি তার পতনের দিকে নিয়ে যায়। স্বভাবগতভাবে স্বার্থ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা

এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। এটি সম্পদের পূজার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে সহানুভূতি ও ঐক্য বিনষ্ট করে। সুতরাং এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দাতব্য হল উদারতা এবং করুণার ফলাফল। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার কারণে সমাজের ইতিবাচক বিকাশ ঘটবে যার ফলে সবাই উপকৃত হবে। এটা স্পষ্ট যে, যদি এমন একটি সমাজ থাকে যার ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে তাদের লেনদেনে স্বার্থপর হয়, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সরাসরি বিরোধী হয়, সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর নির্ভর করে না। এমন সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবর্তে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাড়তে বাধ্য।

উপসংহারে বলা যায়, মানুষ যখন তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করবে এবং তারপর তাদের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ দিয়ে দাতব্য উপায়ে ব্যয় করবে বা পারস্পরিকভাবে বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেবে তখন এমন সমাজে ব্যবসা, শিল্প ও কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং সেখানে উৎপাদন অনেক বেশি হবে সেই সমাজের তুলনায় যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সংকুচিত হয়।

## আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)-২

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিশ্চিত করেছেন যে তাঁর সাথে যারা আসত তারা সর্বদা উপকারী বিষয় নিয়ে কথা বলত। তিনি এর জন্য এতটাই স্বীকৃত হয়েছিলেন যে আব্বাস তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি প্রায়শই খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যেতেন, তাঁর সামনে কাউকে গীবত না করার জন্য। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৯৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত ও অপবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

গীবত করা হল যখন কেউ তাদের পিঠের পিছনে এমনভাবে সমালোচনা করে যা তাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে যদিও এটি সত্য। যদিও, অপবাদ গীবত করার মতই, তবে উক্তিটি সত্য নয়। এই পাপগুলি প্রধানত বক্তৃতা জড়িত কিন্তু অন্যান্য জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন হাতের সংকেত ব্যবহার করা। এগুলো বড় পাপ এবং গীবতকে পবিত্র কুরআনে মৃত লাশের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

*“...এবং একে অপরকে গুপ্তচরবৃত্তি বা গীবত করবেন না। তোমাদের কেউ কি মৃত অবস্থায় তার ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তুমি এটা ঘৃণা করবে..."*

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই গুনাহগুলি একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে থাকা বেশিরভাগ পাপের চেয়েও খারাপ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার গুনাহসমূহ, যদি পাপী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ একজন গীবতকারী বা নিন্দাকারীকে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচারের দিন গীবতকারী/নিন্দাকারীর ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শিকারের পাপগুলি তাদের গীবতকারী/নিন্দাকারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে গীবতকারী/নিন্দাকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেবলমাত্র গীবত করা বৈধ হয় যখন একজন অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করে এবং রক্ষা করে বা যদি একজন ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষের সাথে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের সমাধান করে, যেমন একটি আইনি মামলা।

এসব বড় পাপের কুফল সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে গীবত ও অপবাদ পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র এমন শব্দগুলি উচ্চারণ করা উচিত যা তারা আনন্দের সাথে ব্যক্তির সামনে বলবে সম্পূর্ণরূপে জেনে যে তারা এটিকে আক্রমণাত্মক উপায়ে নেবে না। তৃতীয়ত, একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্বন্ধে কেবলমাত্র শব্দ উচ্চারণ করা যদি অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে এই বা অনুরূপ শব্দগুলি বললে তাদের আপত্তি না থাকে। অর্থ, তারা অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আন্তরিকভাবে করা হলে তা অন্যের গীবত ও অপবাদ থেকে বিরত থাকবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই বৈশিষ্ট্যটিও উত্তম সাহচর্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালবাসার একটি প্রধান চিহ্ন হল যখন কেউ তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে না, তারা যা দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কীভাবে আচরণ করুক না কেন। একজন মানুষ যেমন খুশি হয় যখন তার প্রিয় পার্থিব সাফল্য লাভ করে, চাকরির মতো, তারাও তার প্রিয়জনের পরকালের সাফল্য কামনা করবে। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরবর্তী জগতে, তাহলে তারা তাদের ভালোবাসে না।

একজন সত্যিকারের প্রেমিক তাদের প্রেয়সীকে ইহকাল বা পরকালে কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখে ও তা সহ্য করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে পরিহার করা যায়। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়তমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। কোন ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যকে তার নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলমানের মূল্যায়ন করা উচিত যে তাদের জীবনে যারা তাদেরকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে, নাকি না। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের সত্যিকারের ভালবাসে না। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"*ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।*"

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ১

তাঁর খিলাফতের সময়, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, যারা ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাদের বয়স বা সামাজিক পটভূমি নির্বিশেষে তাদের কাছে রাখতেন। এক সাহাবী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক মজলিসে আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের উপস্থিতির সমালোচনা করেছিলেন, কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে তিনি বসার জন্য খুব কম বয়সী ছিলেন। তাদের সাথে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার পবিত্র কুরআনের 110 নসর অধ্যায়ের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। সমাবেশ থেকে কয়েকজন তাদের মতামত দেন, অন্যরা নীরব ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন, যার সাথে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একমত হন। এটি সহীহ বুখারী, 4294 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞানী লোকদের প্রতি গভীর উপলব্ধি করতেন এবং সর্বদা তাদের সাহচর্য কামনা করতেন। মুসলমানদের অবশ্যই এই লোকদের একজন হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি একটি ভৌত পথ নির্দেশ করে যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞানের সন্ধান করে। এটি জ্ঞানের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যার কাছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং কীভাবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। উপরন্তু, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই বিশ্বের একটি শহরে তার অবস্থান এবং এটির দিকে নিয়ে যাওয়া পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভ করা যায় না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনে যেমন তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ।

কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলমানের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করার উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন প্রদর্শন, তারা যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় তবে সে জাহান্নামে যাবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন

গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

*"... অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."*

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ২

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বেশি সহনশীল কাউকে দেখেননি। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 564- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

*"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"*

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."*

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

# আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ৩

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখে দুটি রেখা ছিল যা তাঁর কান্নার কারণে হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 637- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই দলগুলির মধ্যে একটি হল এমন ব্যক্তি যে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে, নির্জনে এবং কাঁদে। প্রথমত, এই প্রতিক্রিয়াটি নির্জনতার মধ্যে ঘটে তা মুসলিম অর্থের আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়, তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই প্রতিক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি কারণের কারণে হতে পারে যার মধ্যে একজনের অগণিত আশীর্বাদের উপলব্ধি অন্তর্ভুক্ত যা তারা মঞ্জুর করা হয়েছে যদিও তারা তাদের ভুলভাবে ব্যবহার করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অভাব দেখায়। মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে একজনের উপলব্ধি, যখন তিনি সৃষ্টির কাছ থেকে তাদের পাপ গোপন করেন। একজন মুসলমান ক্রমাগত আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে, এমনকি যখন তারা পাপ করে।

একজন মুসলমানের প্রতিফলন এবং তাদের নিজস্ব কাজের মূল্যায়ন যা তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করে। একজনের উপলব্ধি যে তারা কেবল মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে ক্ষমা এবং জান্নাত লাভ করবে, তাদের সৎ কাজের কারণে নয়, যা সহীহ বুখারি, 6467 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। প্রতিক্রিয়া তখনই ঘটে যখন কেউ সত্যিকারের এই জড় জগত, পরকাল, মৃত্যু, বিচার দিবস এবং তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করে। যে এ বিষয়ে গাফিলতি করবে সে কখনই এ পরিণতি অর্জন করতে পারবে না।

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ৪

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার তাঁর জিহ্বাকে ধরে রাখলেন এবং ভালো কথা বলার নির্দেশ দিলেন যাতে তা সওয়াব লাভ করে এবং মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকে যাতে এটি নিরাপত্তা লাভ করে। তার কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি মন্তব্য করেন যে বিচারের দিন একজন ব্যক্তি অন্য কিছুর চেয়ে তাদের জিহ্বা দ্বারা বেশি রাগান্বিত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 642- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয় যা জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, সংখ্যা 2314।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের

সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার কারণ হবে। উপরন্তু, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ । চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে একজনের জীবন থেকে কথার দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যারা খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের কর্ম এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কাজের মূল্যায়ন থেকে বিরত রাখবে যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

পরিশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়শই পার্থিব বিষয় এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

# আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-৫

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে যখন তাদের কাছে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন তারা ঠিক কেন এর আয়াত নাযিল হয়েছিল তা জেনে এটি তেলাওয়াত করেছিল। যাইহোক, তাদের পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবে না জেনেই কেন বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে। লোকেরা তখন তাদের ব্যাখ্যায় ভিন্ন হবে এবং এটি তাদের একে অপরের মধ্যে লড়াইয়ের কারণ হতে পারে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 261- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকারী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের শিক্ষাগুলি মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে

অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ৬

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় কারণ তাঁকে অদম্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৮২ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ

হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল , যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় । মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ৭

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে একজন পাপী যেন তাদের পাপের শাস্তি থেকে মুক্ত না হয়, কারণ এই মনোভাব মূলের চেয়েও বড় পাপ। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 912 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তার জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করেন না যে এটির যোগ্য নম্রতার কারণে। পরিবর্তে তিনি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। যে মুসলমান এটি বুঝতে পারে সে কখনই মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়বে না, তবে সীমা অতিক্রম করবে না এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করবে না, তাদেরকে কখনই শাস্তি দেবে না। তারা বুঝতে পারে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয় যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই এই ঐশী নাম একজন মুসলমানের মধ্যে আশা ও ভয়ের সৃষ্টি করে। একজন মুসলমানের উচিত এই বিলম্বকে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য এবং ভাল কাজের দিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলমানের উচিত এই স্বর্গীয় গুণাবলীর উপর কাজ করা উচিত মানুষের সাথে নম্র হয়ে বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা যেমন তারা মহান আল্লাহকে তাদের উদাসীনতার মুহুর্তে তাদের সাথে নম্র হতে চায়। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের নমনীয় হওয়া উচিত নয় যে পাপের শাস্তি বিলম্বিত হয় তা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে তাদেরও নম্রতায় অবিচল থাকতে হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

*“এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।”*

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ৮

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মানুষকে মহান আল্লাহর বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আদেশের প্রতি অটল থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তিনি যে কোনো স্বেচ্ছাসেবী কর্মের মাধ্যমে এই ধরনের কর্তব্যের পরিপূরক করেন, কেননা সেগুলি হল আল্লাহর অধিকার। তাদের উপর মহিমান্বিত. ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 916 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে একজন মুসলমান কেবল তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই তাঁর নিকটবর্তী হতে পারে। এবং তারা স্বেচ্ছায় সৎ কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে।

এই বর্ণনা মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথম দলটি আল্লাহর নিকট তাদের ফরয দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, যেমন ফরয নামায, এবং মানুষের প্রতি সম্মান, যেমন ফরয সদকা ইত্যাদি। মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে এর সারমর্ম করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেনীর যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা প্রথম দল থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের বাধ্যবাধকতাই পালন করে না বরং স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজে প্রচেষ্টা চালায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এটাই মহান আল্লাহর

নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি এটি ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে সে এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেষ্টা না করে সাধুত্ব লাভের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি এই দাবি করে সে কেবল মিথ্যাবাদী। সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর যখন পবিত্র হয় তখন দেহের বাকি অংশও পবিত্র হয়। এটি সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং একজন ব্যক্তি যদি সৎ কাজ যেমন তার ফরয কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তার শরীর অপবিত্র যার অর্থ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ও অপবিত্র। এই ব্যক্তি কখনই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করা যায়। যে কেউ তার ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে স্বেচ্ছামূলক সৎকাজ সম্পাদন করতে বেছে নেয় তাকে শয়তান বোকা বানিয়েছে কারণ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ও কর্ম ব্যতীত কোন পথই মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হবে না। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাই] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

ধার্মিক মুসলমান যারা দ্বিতীয় উচ্চ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারাও যারা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে। এই মনোভাব তাদের স্বেচ্ছাসেবী ধার্মিক কাজ সম্পাদনের উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। এই দলটিই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা, ঘৃণা, দান এবং

বন্ধ করে তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, যখন কেউ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে এবং স্বেচ্ছায় সৎকাজ সম্পাদনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তখন মহান আল্লাহ তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বরকত দেন যাতে তারা সেগুলিকে তাঁর আনুগত্যে ব্যবহার করে। এই নেক বান্দা খুব কমই পাপ করবে। দিকনির্দেশনার এই বৃদ্ধি 29 অধ্যায় আল আনকাবুত, 69 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

*"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."*

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তখন হয় যখন একজন মুসলমান কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে। যারা এই স্তরে পৌঁছেছে সে তাদের মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যে যখন তারা কথা বলে তারা মহান আল্লাহর জন্য কথা বলে, যখন তারা চুপ থাকে তারা মহান আল্লাহর জন্য নীরব থাকে। যখন তারা কাজ করে তখন তারা তার জন্য কাজ করে এবং যখন তারা এখনও থাকে তারা তার জন্য। এটি একেশ্বরবাদের একটি দিক এবং মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, এই মুসলিমের দোয়া পূর্ণ হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা

দেওয়া হবে। যারা হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করে তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাদের প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত নয়। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা অন্য কেউ একজন ব্যক্তিকে জিনিস প্রদান করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে এবং সেগুলি অর্জন করার জন্য তাদের ভাগ্য থাকে।

এই হাদিসটি উপসংহারে বলতে গেলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য কেবলমাত্র তাঁর নির্দেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তের প্রতি ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ এবং উভয় জগতের সফলতার একমাত্র পথ।

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ৯

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যখন প্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ধাতব মুদ্রার আকারে তৈরি করা হয়েছিল, তখন শয়তান সেগুলিকে ধরে তার চোখের উপর রেখেছিল এবং বলেছিল যে এগুলো তার হৃদয়ের ফল। এবং তার চোখের আনন্দ। তাদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে অত্যাচারী ও কাফের হওয়ার দিকে ধাবিত করবেন এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবেন। তিনি যোগ করেছেন, সমস্ত জাগতিক জিনিসের বাইরে যদি লোকেরা কেবল তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে তবেও তিনি খুশি হবেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 924 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে ।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের বিশ্বাস নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্খা করে, ঠিক যেমন খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকারটি হল যখন একজন ব্যক্তি সম্পদের প্রতি চরম ভালবাসা রাখে এবং তা বৈধ উপায়ে অর্জনের জন্য ক্লান্তি ছাড়াই চেষ্টা করে। এমন আচরণ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষণ নয় কারণ একজন মুসলমানের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বিধান তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের দায়িত্বে অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত। যে শরীর সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি পরিশ্রম করবে যে তারা এটি উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং এটিকে অন্য লোকেদের উপভোগ করার জন্য রেখে যাবে যদিও তারা এর জন্য দায়ী হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তারা এখনও মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই অর্জন করুক না কেন তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, প্রকৃত দরিদ্র, এমনকি যদি তাদের অনেক সম্পদ থাকে।

একমাত্র লোভ যা উপকারী তা হল সত্যিকারের সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যথা, সৎকর্মের জন্য নিজের প্রত্যাবর্তনের দিনের জন্য প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয় প্রকারের ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা প্রথম প্রকারের মতই কিন্তু তা ছাড়াও এই ধরনের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার যেমন ফরজ সদকা পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিসে, 6576 নম্বর, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা হারাম জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি যে সম্পদের অধিকারী নয়

তার জন্য চেষ্টা করে যা অসংখ্য বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন, লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসাইতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 3114, সতর্ক করে যে চরম লোভ এবং সত্যিকারের বিশ্বাস একজন সত্যিকারের মুসলমানের হৃদয়ে কখনই একত্রিত হবে না।

কোনো মুসলমান যদি এ ধরনের লালসা অবলম্বন করে তাহলে একজন অশিক্ষিত মুসলমানের জন্যও এর চরম বিপদ স্পষ্ট। এটি তাদের ঈমানকে ধ্বংস করবে যতক্ষণ না সামান্য ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট না থাকে ঠিক যেমনটি আলোচিত প্রধান হাদিসটি সতর্ক করে যে একজনের বিশ্বাসের এই ধ্বংসটি ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক। এই মুসলমান তাদের মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের সামান্য বিশ্বাস হারানোর ঝুঁকি নেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ১০

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আল্লাহর ঘর, কাবার দিকে তাকিয়ে বললেন যে, মহান আল্লাহ তা পবিত্র করেছেন, সম্মান করেছেন এবং বরকত দিয়েছেন। কিন্তু একজন মুমিন মহান আল্লাহর কাছে এর চেয়েও পবিত্র। এটি সালিহ আহমাদ আশ-শামীর, মাওয়ায়েজ আল সাহাবাহ, পৃষ্ঠা 553-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ৬৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি ও সম্মান পবিত্র।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় যে, সফলতা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ আল্লাহর অধিকার, যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট ভাল নয়।

একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলমান সেই ব্যক্তি যে নিজের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের জন্য তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে অন্যদের ক্ষতি না করা জরুরী।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যের সম্পত্তিকে সম্মান করতে হবে এবং অন্যায়ভাবে সেগুলি অর্জন করার চেষ্টা করবেন না, উদাহরণস্বরূপ, একটি আইনি মামলায়। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিস, 353 নম্বরে সতর্ক করা হয়েছে যে যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে জাহান্নামে যাবে, যদিও তাদের অর্জিত জিনিসটি একটি গাছের ডালের মতো নগণ্য হয়। মুসলমানদের উচিত অন্যের সম্পত্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা এবং তাদের মালিককে খুশি করার উপায়ে ফিরিয়ে দেওয়া।

গীবত বা অপবাদের মতো কাজ বা কথার মাধ্যমে একজন মুসলমানের সম্মান লঙ্ঘন করা উচিত নয়। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে, কারণ এটি তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, অন্যেরা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে অন্যের নিজের, সম্পত্তি বা সম্মানের প্রতি অন্যায় করা এড়াতে হবে। যেমন একজন নিজের জন্য এটি পছন্দ করে তাদের অন্যদের জন্য এটি পছন্দ করা উচিত এবং তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা উচিত। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত মুমিনের চিহ্ন।

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ১১

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পূর্বসূরিদের মতোই তাকওয়া অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর গভর্নরদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি যে লোকদের নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন তাদের অনেকেই তাদের ধার্মিকতার অর্থের কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করার ভয় করত, যেমন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি সিরিয়ায় হোমসের গভর্নরশিপ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 57-58- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর।

তাকওয়া বলতে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি অন্যদের সাথে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত করে যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

ধার্মিকতার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক শুধু হারাম নয়। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর যেটা বেআইনীর কাছাকাছি, তার মধ্যে পড়া তত সহজ। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করে এবং শুধুমাত্র হালাল জিনিস ব্যবহার করে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে।

সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা এক আকস্মিক পদক্ষেপে নয় ধীরে ধীরে ঘটেছে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার অর্থ, যে কথার কোনো উপকার হয় না বা পাপও হয় না, তা প্রায়শই গীবত, মিথ্যা ও অপবাদের মতো খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক বক্তৃতা না করে প্রথম পদক্ষেপটি এড়িয়ে যায় তবে সে মন্দ কথা এড়িয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত পূর্বে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা, যার একটি শাখা হল নিরর্থক ও সন্দেহজনক বিষয়গুলিকে এড়িয়ে চলার ভয়ে যে তারা হারামের দিকে নিয়ে যাবে।

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ১২

আলী ইবনে আবু তালিব, একবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন মানুষ যা পাওয়ার কথা ছিল না তা মিস করতে মন খারাপ করবে। এবং তিনি যা মিস করতে পারেননি তা পেয়ে তিনি খুশি। অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত আখেরাতের ব্যাপারে যা অর্জন করেছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং তারা যা হারিয়েছে তার জন্য তার অনুশোচনা করা উচিত। তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি প্রাপ্ত করে তার জন্য একজনের উল্লাস করা উচিত নয় এবং তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি হাতছাড়া করে তার জন্য তাদের দুঃখ করা উচিত নয়। মৃত্যুর পরে কী হবে তা নিয়ে তাদের আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 580- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি জিনিস যা একজন ব্যক্তিকে মানসিক চাপ এড়াতে সাহায্য করতে পারে তা হল একটি ভারসাম্যপূর্ণ মনের অবস্থা গ্রহণ করা। এটি তখনই যখন কেউ তাদের আবেগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যে তারা নিজেকে চরম মানসিক অবস্থা অনুভব করতে দেয় না কারণ এটি প্রায়শই চাপ এবং মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে। পবিত্র কুরআনের 57 অধ্যায়ে আল হাদিদ, আয়াত 23 এ ইঙ্গিত করা হয়েছে:

*" যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য গর্বিত না হন..."*

ইসলাম কাউকে আবেগ দেখাতে নিষেধ করে না কারণ এটি মানুষের একটি অংশ। কিন্তু এটি মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার পরামর্শ দেয় যেখানে কেউ এক চরম আবেগ থেকে অন্য আবেগে না যায়। কঠিন পরিস্থিতিতে দু: খিত হওয়া গ্রহণযোগ্য তবে একজনকে হতাশ হওয়া উচিত নয়, যা চরম দুঃখ, কারণ এটি প্রায়শই বিষণ্নতার মতো অন্যান্য মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে। এবং সুখী হওয়া গ্রহণযোগ্য তবে একজনকে অতিরিক্ত সুখী হওয়া উচিত নয়, উল্লাস করা, কারণ এটি প্রায়শই উভয় জগতে পাপ এবং অনুশোচনার কারণ হতে পারে। একজন মুসলমানের উচিত কঠিন সময়ে তাদের কাছে থাকা অগণিত আশীর্বাদগুলিকে স্মরণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা অর্জনের চেষ্টা করা যা চরম দুঃখকে বাধা দেয়, যেমন হতাশা। এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের মনে রাখা উচিত যে তাদের খুশি করার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং যদি তারা এটির অপব্যবহার করে বা এর সাথে যুক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে তারা এর জন্য শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে। এটি একজনকে অত্যধিক সুখী হতে বাধা দেবে, যেমন উল্লাসিত।

মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা সর্বদা সর্বোত্তম যা চরম মেজাজের নেতিবাচক প্রভাবকে প্রতিরোধ করে। এটি একজন মুসলিমকে প্রকৃত মানসিক শান্তি এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ১৩

তাঁর খিলাফতের সময়, আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, বিদ্রোহীদেরকে মুসলমানদের মূল অংশে ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের সাথে বিতর্ক করার অনুমতি দিলেন।

বিদ্রোহীরা আলী (রাঃ) এর সাথে তিনটি সমস্যা বলে দাবি করেছিল। প্রথমটি ছিল যে তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি তার এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে সালিশের রায় মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, যখন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে বিচার একমাত্র তাঁরই। দ্বিতীয়টি হল তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যেমন আয়েশা, তালহা, আয জুবায়েরের দল এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী, তবুও তিনি (তাদের অস্ত্র ব্যতীত) কোন যুদ্ধ লুঠ নেননি। অথবা তাদের কাছ থেকে বন্দী। যদি তারা কাফের হতো তাহলে তার উচিত ছিল যুদ্ধের মাল ও বন্দী করা। যদি তারা বিশ্বাসী হতো, তাহলে প্রথমেই তার তাদের সাথে যুদ্ধ করা উচিত ছিল না। তাদের তৃতীয় সমস্যাটি ছিল যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এবং মুয়াবিয়ার মধ্যকার সালিশী দলিল থেকে তাঁর খলিফা এবং মুমিনদের কমান্ডার উপাধি মুছে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে সমস্ত বোকামী বিষয়ের উত্তর দিয়েছেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, মহান আল্লাহর ফয়সালা অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে মানুষকে প্রয়োগ করতে হবে। তিনি প্রমাণ হিসাবে নিম্নলিখিত আয়াতগুলি তেলাওয়াত করেছিলেন: অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 95:

*“ হে ঈমানদারগণ, ইহরাম অবস্থায় খেলাধুলা করো না। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে- জরিমানাটি কোরবানির পশুর সমান যা সে হত্যা করেছে, যেমনটি তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা বিচার করা হয়েছে..."*

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 35:

*“ আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে মতবিরোধের আশঙ্কা কর, তবে তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিসকারী এবং তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিসকারী পাঠাও। যদি তারা উভয়েই সমঝোতা চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে তা ঘটাবেন..."*

তাদের দ্বিতীয় বিষয়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি তাদের বলেছিলেন যে যতদিন তারা মুসলিম ছিলেন ততদিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদের মা ছিলেন এবং তাকে বন্দী দাসী হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয়। কোন বিবেকবান মানুষ এটা মেনে নেবে না। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 6:

*"নবী মুমিনদের নিজেদের চেয়ে বেশি যোগ্য এবং তাঁর স্ত্রীরা তাদের মা..."*

অমুসলিমরা এতে আপত্তি করলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সোল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে হুদাইবিয়ার চুক্তি থেকে আল্লাহর রাসূলের উপাধি মুছে ফেলেন। তিনি তার নাম লিখতে চেয়েছিলেন। তিনি শান্তির স্বার্থে চুক্তিটি সম্পূর্ণ করার জন্য এটি করেছিলেন। যদি তিনি এটি করেন, তাহলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এবং মুয়াবিয়ার মধ্যকার সালিসের দলিল থেকে তাঁর উপাধি মুছে ফেলার ক্ষেত্রে তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করছেন।

এর ফলে প্রায় দুই হাজার বিদ্রোহী তাদের বিদ্রোহ থেকে অনুতপ্ত হয় কিন্তু বাকিরা তাদের সুস্পষ্ট গোমরাহী ও পার্থিব জিনিস যেমন জমিনে ধন-সম্পদ ও কর্তৃত্ব লাভের লোভের উপর অটল থাকে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, শুধুমাত্র আত্মরক্ষায় তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন কারণ তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের সেই অধিকার প্রদান করবেন যা কোন মুসলমানের প্রাপ্য যতক্ষণ না তারা ইসলামের আইন ভঙ্গ না করে বা অবিশ্বাসের স্পষ্ট লক্ষণ দেখায় না। তিনি তাদের রক্তপাত না করার জন্য, মানুষকে আতঙ্কিত বা রাস্তায় লুটপাট না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন। অন্যথায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। বিদ্রোহীরা তাদের সাথে মতানৈক্যকারী মুসলমানদেরকে কাফের বলে গণ্য করায়, যাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ তারা তাদের জন্য হালাল মনে করেছিল, তারা মুসলমানদের হত্যা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে শুরু করে।

তারা আলীকে অনুরোধ করেছিল, মুয়াবিয়ার সাথে সালিশ না করার জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যদিও তারা আগে থেকেই এতে সম্মত হয়েছিল। আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি তার কথার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাননি এবং সালিশ করা ছিল সঠিক কাজ। এই বিদ্রোহীরা তারা যে শহরগুলিতে বাস করত সেগুলি ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছিল

এবং ইরাকের নাহরাওয়ানে বাহিনীতে যোগ দেয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 260-264 এবং 268-273 এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই বিদ্রোহীরা ছিল একনিষ্ঠ উপাসক কিন্তু অত্যন্ত অজ্ঞ এবং সামান্য ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ছিল। ফলস্বরূপ, তারা সহজেই তাদের দুষ্ট নেতাদের দ্বারা এবং পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের মন্দ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্ব। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-105:

*"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের (তাদের) কর্মের ব্যাপারে অবহিত করব? তারা এমন লোক যাদের পার্থিব জীবনে পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।" তারাই যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত ও তাঁর সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাস করে, ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। এবং আমরা কিয়ামতের দিন তাদের কোন ওজন [গুরুত্বপূর্ণ] নির্ধারণ করব না।"*

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

*"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."*

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র। এর অর্থ এই যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং পাপ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- ১৪

আবদুল্লাহ (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন এবং তাকে দাফন করা হচ্ছিল তখন একটি সাদা পাখি তার কাফনে প্রবেশ করে এবং লোকেরা খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তার দাফনের সময় লোকেরা অদৃশ্য আবৃত্তি 89 আল ফজর, 27-30 আয়াত থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল:

*"হে নিশ্চিন্ত আত্মা। তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও, সন্তুষ্ট এবং [তাঁকে] সন্তুষ্ট করে। এবং আমার [নেক] বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"*

কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 567-568- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান তখনই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে, যখন তারা তাঁর এবং তাঁর আদেশের প্রতি সন্তুষ্ট হয়। ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে কেউ এটি অর্জন করতে পারে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ জিনিস বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের ভাগ্যের সাথে ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করতে সাহায্য করতে পারে এবং এটি যে

অসুবিধাগুলি নিয়ে আসে। একজন ব্যক্তি আনন্দের সাথে একটি তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করেন যা তাদের ডাক্তার তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পছন্দের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে এই বিশ্বাস করে যে তাদের ডাক্তার জানেন যে তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল কি। এটি সত্য যদিও তারা শুধুমাত্র মানুষ এবং ত্রুটি প্রবণ। তবুও, অনেক মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার উপর এই একই স্তরের আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয় , যদিও তাঁর জ্ঞান অসীম এবং তাঁর পছন্দগুলি সর্বদা জ্ঞানী। মুসলমানদের উচিত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করা এবং এটি যে সমস্যা নিয়ে আসে ঠিক সেভাবে তারা অভিযোগ না করে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো। তাদের বোঝা উচিত যে তারা যে সমস্যা এবং অসুবিধার মুখোমুখি হয় তা তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয় যদিও তারা তাদের মধ্যে থাকা জ্ঞানগুলি বুঝতে বা পর্যবেক্ষণ না করে ঠিক যেমন তারা আনন্দের সাথে গ্রহণ করা তিক্ত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা যে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে তার পিছনের বিজ্ঞানটি তারা কখনই বুঝতে পারে না, একটি সময় অবশ্যই আসবে, ইহকাল হোক বা পরকালে, যখন তারা যে তিক্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তার পিছনের জ্ঞান তাদের কাছে প্রকাশিত হবে। তাই একজন মুসলমানের উচিত এই সময়টা ধৈর্য সহকারে জেনে রাখা যে শীঘ্রই সব প্রকাশ পাবে। এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা অসুবিধা মোকাবেলা করার সময় একজনের ধৈর্য বাড়াতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

# ফাদল ইবনে আব্বাস (রা.)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিনায় পশু কোরবানির স্টেশনে পৌঁছেছিলেন তখন তাঁর ছোট চাচাতো ভাই ফাদল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর উটের পিঠে আরোহণ করেছিলেন। এক তরুণী মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন। তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তিনি শারীরিকভাবে তার চাচাতো ভাইয়ের মাথাটি যুবতীর কাছ থেকে সরিয়ে দেন যাতে তিনি তাকে দেখতে না পারেন। যখন তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি একজন যুবক এবং মহিলাকে একে অপরের কাছাকাছি দেখেছেন এবং তিনি তাদের সাথে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে শয়তানকে বিশ্বাস করতে পারেন না। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 265-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রলোভন এড়াতে মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নত করতে শেখা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজনকে সর্বদা তাদের জুতার দিকে তাকাতে হবে তবে এর অর্থ হল তাদের চারপাশে অপ্রয়োজনীয় বিশেষ করে সর্বজনীন স্থানে তাকানো এড়ানো উচিত। তাদের উচিত অন্যের দিকে তাকানো এড়ানো এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা। একজন মুসলিম যেমন পছন্দ করে না যে কেউ তার বোন বা কন্যার দিকে তাকাবে তার অন্য লোকের বোন এবং কন্যাদের দিকে তাকানো উচিত নয়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 30:

*“মুমিন পুরুষদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি[1] কম করে এবং তাদের গোপনাঙ্গ হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র..."*

যখনই সম্ভব একজন মুসলমানের বিপরীত লিঙ্গের সাথে একা সময় কাটানো এড়ানো উচিত যদি না তারা এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যা বিবাহ নিষিদ্ধ করে। সহীহ বুখারী, 1862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই পরামর্শ দিয়েছেন।

মুসলমানদের পোশাক পরিধান করা এবং শালীন আচরণ করা উচিত। শালীনভাবে পোশাক পরা অপরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এড়ায় এবং বিনয়ী আচরণ করা একজনকে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা একটি অবৈধ সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেমন বিপরীত লিঙ্গের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা বলা।

অবৈধ সম্পর্ক এড়ানোর আশীর্বাদ বোঝা তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার আরেকটি উপায়। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিহ্বা ও সতীত্ব রক্ষাকারীকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। জামি আত তিরমিযী, 2408 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কে জড়ানোর শাস্তির ভয়ে একজন মুসলমানকে সেগুলি এড়াতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করছে তার থেকে ঈমান চলে যাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4690 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাস্তবে, একজন মুসলমানের অবৈধ সম্পর্কের প্রয়োজন নেই যেহেতু ইসলাম বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তাদের প্রায়ই রোজা রাখা উচিত কারণ এটি একজনের ইচ্ছা এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সহীহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

# ফাদল ইবনে আব্বাস (রা.)-২

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। কুরবানীর দিন সকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চাচাতো ভাই ফাদল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর জন্য কিছু নুড়ি সংগ্রহ করতে বললেন যা মিনায় জামারাতকে পাথর ছুঁড়তে ব্যবহৃত হয়। . ফাদল, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ছোট নুড়ি বেছে নিয়েছিলেন যা একটি গুলতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেগুলি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁর পছন্দে খুশি হয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজনকে বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ এটা ধর্মের বাড়াবাড়ি যা পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 267-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 39 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ধর্ম সহজ এবং সোজা। এবং একজন মুসলমানের নিজের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো উচিত নয় কারণ তারা এটি মেনে চলতে সক্ষম হবে না।

এর অর্থ হল একজন মুসলমানকে সর্বদা একটি সহজ ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন যাপন করা উচিত। ইসলাম মুসলমানদেরকে সৎকর্ম সম্পাদনে নিজেদের অতিরিক্ত বোঝার দাবি করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সরলতার শিক্ষা দেয় যা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। একজন মুসলমানের উচিত সর্বপ্রথম তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা যা নিঃসন্দেহে তার শক্তির মধ্যে

রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ করার জন্য একজন মুসলমানকে তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। পবিত্র কুরআনের 286 নং আয়াতে আল বাকারাহ 2 অধ্যায়ে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে:

*"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."*

পরবর্তীতে, তাদের উচিত তাদের দিনের কিছু সময় ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য বের করা যাতে তারা তাদের শক্তি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর আমল করতে পারে। এটি মহান আল্লাহর প্রেমকে আকর্ষণ করে, যা সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যদি একজন মুসলমান এই আচরণে অবিচল থাকে তবে তাদের এমন করুণা প্রদান করা হবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই এই বিশ্বের বৈধ আনন্দ উপভোগ করার সময় পাবে।

এভাবেই একজন মুসলিম নিজের জন্য সহজ করে তোলে। এবং যদি তাদের উপর নির্ভরশীল থাকে, যেমন শিশু, তাহলে তাদের উচিত তাদের একই শিক্ষা দেওয়া, যাতে তাদের জন্য জিনিসগুলিও সহজ হয়। নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া জিনিসগুলিকে কঠিন করে তোলে এবং একজনকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে পারে। এবং অত্যধিক শিথিল করা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তুলবে কারণ অলসতার মাধ্যমে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত হারাবে।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১

তাঁর খিলাফতকালে, উসমান ইবনে আফফান, আব্দুল্লাহ বিন উমরকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একজন বিচারক হিসাবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাকে বলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেছিলেন যে বিচারক তিন প্রকার; একজন পরিত্রাণ লাভ করবে আর বাকি দুইজন জাহান্নামে যাবে। যারা অন্যায়ভাবে বা অজ্ঞতাবশত রায় দেয় তারা জাহান্নামে থাকবে এবং যে জ্ঞান ও ন্যায়ের সাথে বিচার করবে সে রক্ষা পাবে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 99-100- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও এই ঘটনাটি বিচারকদের নিয়ে আলোচনা করে, তবে এটি অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

কেউ কেউ অদ্ভুত মনোভাব গ্রহণ করেছে। যখন তাদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা সত্য স্বীকার না করে এমন একটি উত্তর দেয় যার সত্যের খুব কম বা কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ করে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে এটি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। একজন মুসলিম ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য শাস্তি পেতে পারে যা অন্যরা কাজ করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ, মহান বা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জিনিস আরোপ করেছে। এসব লোকের কারণে ইসলামের সাথে অদ্ভুত আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি জড়িয়ে গেছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত সত্য থেকে এক বিরাট

বিচ্যুতি। প্রকৃতপক্ষে, অনেক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি মুসলমানদের ইসলামের অংশ বলে বিশ্বাস করে গ্রহণ করেছে এই অজ্ঞ মানসিকতার কারণে।

এই লোকেরা বিশ্বাস করে যে যদি তারা কেবল স্বীকার করে যে তারা কিছু জানে না তবে তারা অন্যদের কাছে বোকা বলে মনে হবে। এই মানসিকতা নিজেই অত্যন্ত মূর্খ কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন যাতে অন্যরা বিপথগামী না হয়। প্রকৃতপক্ষে, ধার্মিক পূর্বসূরিরা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকে গণনা করতেন যে এইভাবে আচরণ করেছিল বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসাবে এবং যে তাদের কাছে উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাকে মূর্খ হিসাবে গণ্য করেছিল।

এই মনোভাব প্রায়শই প্রবীণদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যারা প্রায়শই তাদের সন্তানদেরকে তাদের অজ্ঞতা স্বীকার না করে এবং সত্য জানে এমন একজনের কাছে নির্দেশ না দিয়ে দুনিয়া ও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দেন। প্রবীণরা যখন এইভাবে কাজ করে তখন তারা তাদের নির্ভরশীলদের সঠিকভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে এবং যদি তারা কিছু জানেন না তবে তাদের তা স্বীকার করা উচিত কারণ এটি তাদের পদমর্যাদাকে কোনভাবেই হ্রাস করবে না। যদি কিছু হয় আল্লাহ, মহান, এবং মানুষ তাদের সততা প্রশংসা করবে.

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ২

যখনই আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মালিকানাধীন কোন কিছুর সাথে সংযুক্ত হতেন তখনই তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা দান করে দিতেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৭৮৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92 এর সাথে সংযুক্ত:

*"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।*

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যার অর্থ, তারা তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি ধারণ করবে, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এটি প্রত্যেকটি দোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানরা তাদের খুশির জিনিসগুলিতে তাদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে যা দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডে তাদের শারীরিক

শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি, তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটি উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে, লোকেরা এমন জিনিসগুলিতে চেষ্টা করতে পেরে খুশি যা তারা কামনা করে যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন হয় না যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় করতে হবে এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হবে তবুও কতজন আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এইভাবে চেষ্টা করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে উচুঁ? কতজন স্বেচ্ছায় নামাজ পড়ার জন্য তাদের মূল্যবান ঘুম ছেড়ে দেয়?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উৎসর্গ করবে। কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত.

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-3

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো কোন কিছুকে অভিশাপ দেননি। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৪৩ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিশাপ হল যখন কেউ মহান আল্লাহর কাছে রহমতের জন্য প্রার্থনা করে, যাকে অন্য কিছু থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কে অভিশপ্ত এবং তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য তা একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। তাই এই বোকা অভ্যাস পরিহার করা উচিত। যে ব্যক্তি এর যোগ্য নয় তাকে অভিশাপ দেওয়া একটি জঘন্য কাজ এবং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমত কামনা করে, অন্য কারো কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে স্পষ্ট করেছেন যে, একজন প্রকৃত মুমিন অভিশাপ দেয় না। যেসব মুসলমানদের অভিশাপ দেওয়ার অভ্যাস আছে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা এতটাই অপছন্দ করেন যে, বিচারের দিন তারা সাক্ষী ও সুপারিশকারী হতে বঞ্চিত হবে। মহান আল্লাহ শেষ দিবসে বাকি সৃষ্টির কাছে তাদের প্রদর্শন করা অপছন্দ করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6610 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবশেষে, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6652, একজন মুমিনকে অভিশাপ দেওয়ার তীব্রতা তুলে ধরে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, একজন মুমিনকে অভিশাপ দেওয়া তাদের হত্যার শামিল।

এমনকি যদি কেউ অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য হয় তবে তা পরিহার করা এবং তার পরিবর্তে এমন শব্দ উচ্চারণ করা নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের কাজ যা মহান আল্লাহকে খুশি করবে, যেমন তাঁর স্মরণ।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ৪

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন তাঁর বান্দাদের সৎকাজের জন্য প্রচেষ্টা করতেন, যেমন মসজিদে অতিরিক্ত সময় কাটাতেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে মুক্ত করে দিতেন। যখন তাকে বলা হয়েছিল যে তার চাকররা তাকে কেবল প্রতারণা করছে কারণ তারা তার অভ্যাস জানে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে খুশি এমন কাজে অন্যদের দ্বারা প্রতারিত হতে পেরে তিনি সন্তুষ্ট। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 188- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কারণে এই আচরণ করেছিলেন।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য

কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যীনাহ, আয়াত 5।

*"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"*

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

*"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"*

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের

ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-৫

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আবদুল্লাহ (রাঃ) তখনই বাড়িতে খেতেন যখন কোন দরিদ্র ব্যক্তি বা এতিম তার সাথে যোগ দিতেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 216- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ মানুষকে তারা যা করে তাই দান করেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেউ যদি মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তবে তিনি তাদের স্মরণ করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

*"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."*

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ানো ঠিক একই রকম। যে ব্যক্তি এই নেক আমল করবে তাকে জান্নাতের খাবার খাওয়ানো হবে এবং যে অন্যকে পান করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাত থেকে পান করানো হবে। জামি আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামের সর্বোত্তম ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 6236 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, অন্যকে খাওয়ানো এবং অন্যদেরকে সদয় কথা বলে অভিবাদন করা ইসলামের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

মুসলমানদের উচিত এই সৎ কাজের উপর কাজ করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অন্যদের বিশেষ করে দরিদ্রদের নিয়মিত খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এটি একটি আশ্চর্যজনক কাজ যার জন্য খুব বেশি সম্পদের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকে খাওয়ানো, যদিও তা অর্ধেক খেজুর ফলই হয়, কারণ সহীহ বুখারি, 1417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে এটি তাদের থেকে রক্ষা করবে। বিচার দিবসে জাহান্নামের আগুন। এটি মানুষকে এই সৎ কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অজুহাত দেয় না।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ৬

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং কোনো সম্পদ জমা করতেন না। তাকে একবার মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে 4000 হাজার মুদ্রা উপহার দেওয়া হয়েছিল, অন্য কারো কাছ থেকে 4000 মুদ্রার আরেকটি উপহার, অন্য কারো কাছ থেকে 2000 মুদ্রার আরেকটি উপহার এবং একটি শাল। পরের দিন নাগাদ তিনি শাল সহ সমস্ত গরীবদের দান করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 261- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, দুনিয়ার ধনী ব্যক্তিরা পরকালে গরীব হবে যদি না তারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করে তবে এই লোক সংখ্যায় অল্প। .

এর অর্থ এই যে, অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ ভুলভাবে ব্যয় করে, অর্থাৎ হয় নিরর্থক জিনিসের জন্য যা তাদের আখিরাতে কোন উপকার করে না, অথবা তারা এমন পাপ কাজে ব্যয় করে যা উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় অথবা তারা ব্যয় করে। ইসলামের অপছন্দের মত হালাল জিনিসের উপর যেমন অপব্যয় বা অযথা। এসব কারণে বিচারের দিন ধনীরা গরীব হয়ে যাবে কারণ তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং এমনকি তাদের উপর শাস্তিও দেওয়া হবে।

উপরন্তু, যারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পদ তাদেরকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাই তারা পরকালে খালি হাতে গরিব হিসেবে পৌঁছাবে। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি তার জন্য দায়বদ্ধ থাকা অবস্থায় অন্যদের ভোগের জন্য সম্পদ রেখে যাবে।

পরিশেষে, ধনীরা যেমন তাদের সম্পদ অর্জন, মজুদ, রক্ষা এবং বৃদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, এটি তাদের সৎ কাজ করা থেকে বিভ্রান্ত করে যা বিচার দিবসে কাউকে ধনী করে তোলে। বাস্তবে, এটিকে হারানো তাদের দরিদ্র করে তুলবে।

এটা মনে রাখা জরুরী, সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করা মানে শুধু দাতব্য দান করা নয় বরং এর মধ্যে অযথা বা অপব্যয় না করে তাদের প্রয়োজনীয় এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এই ব্যক্তি দুনিয়া ও পরকালে ধনী হবে। এবং এই মনোভাব অনেক সম্পদ থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। যেকোন পরিমাণ সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একজন ব্যক্তি ধনী হতে পারে যদিও তার কাছে সামান্য সম্পদ থাকে। বাস্তবে, এই ব্যক্তি তাদের সম্পদ তাদের সাথে পরকালে নিয়ে যায় এবং এই মনোভাব তাদের অবসর সময় দেয় যা তাদেরকে সৎ কাজ করতে দেয় যা পরকালে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ৭

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ, মহানবী (সা.)-এর পর সর্বকালের সর্বোত্তম দল, তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট। তারা যে শারীরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় পর্যবেক্ষণ করেছেন তা অবশ্যই একটি বিষয়। কিন্তু যে কেউ তাদের জীবন এবং তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে জানে সে বোঝে যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই অনন্য এবং মহান কাজের চেয়েও বেশি কিছু।

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে জড়িত একটি হাদীসে দেখানো হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমের ৬৫১৫ নম্বরে পাওয়া যায়। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সওয়ার ছিলেন। মরুভূমিতে তার পরিবহনে যখন তিনি একজন বেদুইনকে দেখতে পেলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদুইনকে অভিবাদন জানালেন, বেদুঈনের মাথায় তার পাগড়ী রাখলেন এবং বেদুইনকে তার বাহনে আরোহণের জন্য জোর দিলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছিল যে তিনি বেদুইনকে যে সালাম দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল কারণ বেদুইনরা মহান সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। , তাকে অভিবাদন। তবুও, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যান এবং বেদুইনদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন যে, তিনি এটা করেছেন শুধুমাত্র কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করতে পারে এমন একটি সর্বোত্তম উপায় হল তাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা। পিতামাতার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন যে, বেদুঈনের পিতা তাঁর পিতার বিশ্বস্ত সেনাপতি উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন।

এই ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তারা কেবল বাধ্যতামূলক দায়িত্বই পালন করেনি এবং সমস্ত পাপ পরিহার করেনি বরং তাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় সুপারিশ করা সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছে। তাদের আত্মসমর্পণ তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বেদুইনকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন কারণ তার করা কোনো কাজই এখনও বাধ্যতামূলক ছিল না, অনেক মুসলিম যারা এই অজুহাত ব্যবহার করবে তার বিপরীতে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যেভাবে করেছিলেন সেভাবে কাজ করেছিলেন। .

ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের অভাবই মুসলমানদের ঈমানকে দুর্বল করে দিয়েছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং অন্যান্য সৎ কাজ থেকে দূরে সরে যায়, যেমন স্বেচ্ছায় দাতব্য, যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী বলে দাবি করে যে কাজগুলি বাধ্যতামূলক নয়। সকল মুসলমান পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে শেষ হতে চায়। কিন্তু তাদের পথ বা পথে না চললে এটা কিভাবে সম্ভব? কোন মুসলমান যদি তাদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ অনুসরণ করে তাহলে তারা কিভাবে তাদের সাথে মিলিত হবে? তাদের সাথে শেষ করতে তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে যেমনটি তারা করেছিল, তার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-৮

আবদুল্লাহ, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার একজন ব্যক্তিকে এমন পোশাক পরার পরামর্শ দিয়েছিলেন যা মূর্খ লোকেদের উপহাস করতে বা বুদ্ধিমান লোকদের সমালোচনা করতে না পারে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 723- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1999 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

ইসলাম একজন মুসলিমকে নিজেদের সুন্দর করার জন্য শক্তি, সময় এবং অর্থ উৎসর্গ করতে নিষেধ করে না কারণ এটি তাদের শরীরের অধিকার পূরণ বলে বিবেচিত হতে পারে। সহীহ বুখারী, 5199 নং হাদিসে এটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মূল জিনিসটি যা এই পদ্ধতিতে কাজ করাকে অপছন্দনীয় বা এমনকি পাপ কাজ করার সাথে পার্থক্য করে তা হল যখন কেউ নিজেকে সুন্দর করার সময় অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি করে। এটি নির্ধারণ করার একটি ভাল উপায় হল যে নিজেকে সুন্দর করে তোলার ফলে কখনোই আল্লাহ, মহান বা লোকদের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা উচিত নয় যা ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া পূরণ করা সম্ভব নয়। এবং বাস্তবে একজনের শারীরিক চেহারা সংশোধন করা যাতে তারা পরিষ্কার এবং স্মার্ট দেখায় তা ব্যয়বহুল নয় এবং এটি খুব বেশি সময় বা প্রচেষ্টাও নেয় না।

উপরন্তু, এটা বোঝা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত সৌন্দর্য যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন তা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অর্থ, চরিত্রের সাথে যুক্ত । এই সৌন্দর্য উভয় জগতেই টিকে থাকবে যেখানে সময়ের সাথে সাথে একজনের বাহ্যিক সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে। তাই বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে এই সত্যিকারের সৌন্দর্য অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য যাতে তারা তাদের চরিত্র থেকে হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং উদারতার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার হক আদায়ে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে সাহায্য করবে এবং তাদের সাহায্য করবে। মানুষের অধিকার পূরণে, যেমন তাদের নির্ভরশীলদের।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ৯

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে জ্ঞান তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 207- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমটি পবিত্র কুরআন এবং দ্বিতীয়টি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার

নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

*"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"*

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

*"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."*

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মাদ ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

জ্ঞানের চূড়ান্ত অংশ হল স্বীকার করা যখন কেউ কিছু জানে না।

কেউ কেউ অদ্ভুত মনোভাব গ্রহণ করেছে। যখন তাদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা সত্য স্বীকার না করে এমন একটি উত্তর দেয় যার সত্যের খুব কম বা কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ করে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে এটি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। একজন মুসলিম

ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য শাস্তি পেতে পারে যা অন্যরা কাজ করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ, মহান বা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জিনিস আরোপ করেছে। এসব লোকের কারণে ইসলামের সাথে অদ্ভুত আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি জড়িয়ে গেছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত সত্য থেকে এক বিরাট বিচ্যুতি। প্রকৃতপক্ষে, অনেক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি মুসলমানদের ইসলামের অংশ বলে বিশ্বাস করে গ্রহণ করেছে এই অজ্ঞ মানসিকতার কারণে।

এই লোকেরা বিশ্বাস করে যে যদি তারা কেবল স্বীকার করে যে তারা কিছু জানে না তবে তারা অন্যদের কাছে বোকা বলে মনে হবে। এই মানসিকতা নিজেই অত্যন্ত মূর্খ কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন যাতে অন্যরা বিপথগামী না হয়। প্রকৃতপক্ষে, ধার্মিক পূর্বসূরিরা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকে গণনা করতেন যে এইভাবে আচরণ করেছিল বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসাবে এবং যে তাদের কাছে উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাকে মূর্খ হিসাবে গণ্য করেছিল।

এই মনোভাব প্রায়শই প্রবীণদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যারা প্রায়শই তাদের সন্তানদেরকে তাদের অজ্ঞতা স্বীকার না করে এবং সত্য জানে এমন একজনের কাছে নির্দেশ না দিয়ে দুনিয়া ও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দেন। প্রবীণরা যখন এইভাবে কাজ করে তখন তারা তাদের নির্ভরশীলদের সঠিকভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার

আগে এবং যদি তারা কিছু জানেন না তবে তাদের তা স্বীকার করা উচিত কারণ এটি তাদের পদমর্যাদাকে কোনভাবেই হ্রাস করবে না। যদি কিছু হয় আল্লাহ, মহান, এবং মানুষ তাদের সততা প্রশংসা করবে.

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১০

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন যে তিনি মুসলমান হওয়ার পর থেকে কখনও পেট ভরে খাননি। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮০৪ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুষম খাদ্যের গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি পরামর্শ দেন যে একজনের পেটকে তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। প্রথম অংশটি খাবারের জন্য, দ্বিতীয়টি পানীয়ের জন্য এবং শেষ অংশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে।

এটি অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের পেটে পৌঁছানোর আগে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের আচরণ।

মানুষ যদি এই পরামর্শে কাজ করে তাহলে তারা শারীরিক ও মানসিক উভয় রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। আসলে, অনেক জ্ঞানী মানুষের মতে অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হল বদহজম।

হৃদয়ের প্রতি সামান্য খাবারই কোমল হৃদয়, নম্রতা এবং কামনা-বাসনার দুর্বলতা ও ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়। ভরা পেটের ফলে অলসতা সৃষ্টি হয় যা ইবাদত ও অন্যান্য সৎকর্মে বাধা দেয়। এটি ঘুমকে প্ররোচিত করে যার ফলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং এমনকি বাধ্যতামূলক রাতের নামাজও মিস করে। এটি প্রতিফলনকে বাধা দেয় যা একজনের কাজের মূল্যায়নের চাবিকাঠি এবং সেইজন্য একজনের চরিত্রকে আরও ভাল করার জন্য পরিবর্তন করে। যার পেট ভরা সে দরিদ্রদের ভুলে যায় এবং তাই তাদের সাহায্য করার সম্ভাবনা কম। এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব একটি কঠিন হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করে। কঠিন হৃদয়ের অধিকারী কেয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে না। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

*"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"*

যে ব্যক্তি কেবল তাদের পেটের জন্য উদ্বিগ্ন সে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যেমন ধর্মীয় জ্ঞান শেখা এবং আমল করা। মুসলমানদের জানা উচিত যে, কিয়ামতের দিন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হবে সে। এটি জামে আত তিরমিযী, 2478 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই, মুসলমানদের উচিত সুষম খাদ্য গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা যাতে তারা আলোচিত নেতিবাচক প্রভাবগুলি এড়াতে পারে যা নিঃসন্দেহে তাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করবে।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১১

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার মানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা আজ যা করতে পারে তার উপকারের জন্য তারা যা আগামীকাল তাদের মৃত্যুর পর কাটাবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৩২ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে

ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

*“সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"*

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১২

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে তিনি জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করবেন বা জাহান্নামে জ্বলতেও পারবেন, তারপর এক চুমুক ওয়াইন পান করবেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৪০ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, একজন মুসলমানকে কখনই অ্যালকোহল সেবন করা উচিত নয় কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের শরীরের ক্ষতি হয়, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যেমন তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

*"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"*

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করার বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, ৬৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা প্রচার করা জান্নাত লাভের চাবিকাঠি। তবুও, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মুসলমানদের পরামর্শ দেয় যে কেউ নিয়মিত মদ্যপান করে এমন কাউকে সালাম না করার জন্য। অ্যালকোহল

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটিকে দশটি ভিন্ন উপায়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহল নিজেই, যিনি এটি তৈরি করেন, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি ক্রয় করে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি পান করে এবং যে এটি ঢেলে দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত কিছু নিয়ে

কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১৩

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কেন কিছু না কিনেও বাজারে নিয়মিত ভ্রমণ করেন। তিনি যা করবেন তা হল প্রত্যেক মুসলমানকে তিনি শান্তির ইসলামী অভিবাদন দিয়ে পাশ দিয়ে যাবেন। তিনি উত্তরে বললেন, তিনি কেবলমাত্র সকলের কাছে শান্তির শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাজারে গিয়েছিলেন। অতএব, মানুষের উচিত তারা যাকে পাশ দিয়ে যায় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৫৬ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 12 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের মধ্যে পাওয়া একটি ভাল গুণের পরামর্শ দিয়েছেন। যথা, চেনা ও অপরিচিত লোকেদের কাছে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভাল বৈশিষ্ট্যের উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকাল মুসলমানরা প্রায়শই কেবল তাদের চেনেন তাদের কাছে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেয়। এটি সবার কাছে ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মানুষের মধ্যে ভালবাসার দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করে। প্রকৃতপক্ষে, এই বৈশিষ্ট্যটি সহীহ মুসলিম, 194 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

একজন মুসলমানের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তারা অন্যদের কাছে প্রসারিত শান্তির প্রতিটি শুভেচ্ছার জন্য ন্যূনতম দশটি পুরষ্কার পাবে এমনকি

অন্যরা তাদের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেও। সুনানে আবু দাউদ, 5195 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত শান্তির ইসলামী অভিবাদনকে সঠিকভাবে পূরণ করা উচিত অন্যদের প্রতি তাদের অন্যান্য বক্তৃতা ও কর্মে এই শান্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রেখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুসলমান এবং মুমিনের সংজ্ঞা।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১৪

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে আন্তরিকতা সহজেই স্বীকৃত ছিল এবং যে কেউ তাঁর কথাবার্তা ও কর্মে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা চিনতে পারতেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৫৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

*"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."*

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

*"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."*

## আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১৫

যখন কেউ আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলো যে, ঈমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর কারো (মন্দ) কাজ তাদের ক্ষতি করতে পারে কিনা? তিনি উত্তরে বললেন, তাদের উচিত মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করা এবং আত্মবিভ্রম পরিহার করা। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৬২ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই আত্ম-বিভ্রম বলতে বোঝায় নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য ইসলামী শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদিস রয়েছে, যা মানবজাতিকে উপদেশ দেয় যে, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহর বান্দা ও শেষ রসূল, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবেন। এরকম একটি উদাহরণ সহীহ বুখারী, 128 নম্বরে পাওয়া যায়।

এই হাদিসগুলোর তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করবে সে হয় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে অথবা তারা তাদের পাপের পরিমাণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ

করবে যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি সহীহ বুখারী, 7510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ না করেই জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তাদের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ঘোষণা করতে হবে না বরং এর শর্ত ও বাধ্যবাধকতাও তাদের পালন করতে হবে। ঈমানের সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে জান্নাতের চাবি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দরজা খোলার জন্য একটি চাবির দাঁত প্রয়োজন। জান্নাতের চাবিকাঠির দাঁত হল এর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এগুলো ছাড়া মানে, দাঁত ছাড়া চাবি জান্নাতের দরজা খুলবে না। এটা অনেক হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত যা নির্দেশ করে যে জান্নাতে প্রবেশের জন্য একজনকে ইসলামের শর্ত ও কর্তব্য পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 1397 নম্বর, ইঙ্গিত করে যে সাক্ষ্যকে অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলির আকারে কর্ম দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যেমন ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সাক্ষ্যের প্রথম অংশটি হল, মহান আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এর অর্থ হল, মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি মান্য করতে হবে এবং কখনই অবাধ্য হবে না। যখন কেউ মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তাদের এমন কিছু মান্য করা উচিত নয় যা তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহই তাদের মালিক এবং তারা কেবল তাঁর দাস। কিন্তু যে মুহূর্তে কেউ এমন কিছু মান্য করে যা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, তখন তারা তাঁর একত্বের উপর তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করেছে যা আল জাথিয়াহ, 23 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

*"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."*

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছে যে যে কেউ পাপ করে সে প্রকৃতপক্ষে শয়তানের উপাসনা করে যেমন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে তার আনুগত্য করেছে। অধ্যায় 36 ইয়াসিন, আয়াত 60:

*"হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে শয়তানের ইবাদত না করার নির্দেশ দেইনি - [কারণ] সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"*

যে মুসলমানরা তাদের আকাঙ্ক্ষা, অন্যের আকাঙ্ক্ষা এবং শয়তানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে মান্য করে, তারা সত্যই মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই মুসলমানদের উভয় জগতে মহান আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এই মুসলিমরা কার্যত ইসলামের সাক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করেছে কারণ তারা তাদের মৌখিক এবং অভ্যন্তরীণ দাবিকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আন্তরিক পদক্ষেপের সাথে সমর্থন করেছে। যখন কেউ তার রেওয়ায়েত অনুযায়ী কাজ করে তখন তারা সাক্ষ্যের দ্বিতীয় দিকটি পূরণ করে, যথা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বান্দা ও চূড়ান্ত রাসূল। সহীহ বুখারি, 128 নম্বর হাদিসে এই মুসলিমদের উল্লেখ করা হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

যে ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে ইসলামের ঘোষণা দেয় এবং অভ্যন্তরীণভাবে তা গ্রহণ করে সে নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম কিন্তু মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি তাদের সত্যিকারের আন্তরিক বিশ্বাস তাদের গুনাহ অনুসারে হ্রাস পায়।

সাক্ষ্যের উপর সত্যিকারের আমল করার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন। এটি পরামর্শ দেয় যে এটি একজন ব্যক্তির ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি তখনই হয় যখন একজন মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তিনি যা ঘৃণা করেন তা পছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন। যেহেতু এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য, সুনানে ইবনে মাজা, 2333 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মুসলমানদেরকে তাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

ইসলামি শিক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাকে ঘৃণা করা এবং অপছন্দ করা একজন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার অনুসরণ এবং মহান আল্লাহর উপর তাদের আনুগত্য করার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। এই মনোভাব মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসকে কমিয়ে দেয়।

নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই মানসিকতা গ্রহণ করা ইসলামের সাক্ষ্যের সত্য বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 24:

*"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছ, বাণিজ্য যাতে তোমরা পতনের আশঙ্কা কর, এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট, তা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করুন, অতঃপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করেন এবং আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"*

যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, সে প্রান্তে তাঁর ইবাদত করে। অর্থ, যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি হয় তখন তারা খুশি হয় কিন্তু যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা ক্রোধে তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

*“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"*

সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে এবং বিশ্বাসের সাক্ষ্যের উপর কাজ করার বিষয়ে জানায়, যা পরবর্তী পৃথিবীতে জাহান্নামের আগুন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটি হল প্রথমে তাদের সমস্ত শর্ত এবং শিষ্টাচারগুলি পূরণ করার সাথে সাথে সঠিকভাবে বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করা। অতঃপর স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এর সাথে যোগ করতে হবে, যার মধ্যে সর্বোত্তম হল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য। এটি মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসার দিকে পরিচালিত করে এবং মহান আল্লাহকে তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে ক্ষমতায়িত করে যাতে তারা কেবল তাঁরই আনুগত্য করে। এই সত্য ও আন্তরিক আনুগত্যই ঈমানের সাক্ষ্যের পরিপূর্ণতা। এটি সেই সুস্থ হৃদয় যার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ভালবাসা এবং পার্থিব কামনা-বাসনা ও জড় জগতের ভালবাসা মুক্ত। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

*"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"*

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান পাপ করা থেকে মুক্ত হয়ে যায় তবে এর অর্থ হল তারা তাদের থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় যখন তারা খুব কমই পাপ করে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ও মৌখিকভাবে ইসলামের সাক্ষ্য ঘোষণা করা নয় বরং তাদের অবশ্যই তাদের কর্মে তা দেখাতে হবে কারণ এই পৃথিবীতে প্রকৃত সফলতা অর্জনের এবং পরের দুনিয়াতেও শাস্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় এটি। .

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১৬

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা লোকদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা, মহান আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা, একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সমর্থন করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্যথায়, তারা কখনই মহান আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করতে পারবে না এবং যদি তারা ব্যাপকভাবে নামাজ ও রোজা রাখে তবুও তারা ঈমানের মিষ্টি স্বাদ পাবে না। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৬৬ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলমানের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা উত্তম তা কামনা করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায়ে সমর্থন করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."*

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালবাসা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার একটি দিক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল যে মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে ঘৃণা করা উচিত কারণ মানুষ মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। বরং একজন মুসলমানের উচিত সেই গুনাহকে অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় তা পরিহার করা এবং অন্যদেরকেও এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া, কারণ এই সদয় আচরণ তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কিছু অপছন্দ না করা, যেমন একটি কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজনের

অপছন্দের প্রমাণ এই যে, তারা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে তখন তা কখনই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। অর্থ, কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনোই কোনো গুনাহের কারণ হবে না কারণ এটি প্রমাণ করে যে কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজেদের স্বার্থে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা। এটি প্রতিটি আশীর্বাদকে বোঝায় যা একজন অন্যকে দিতে পারে, যেমন শারীরিক এবং মানসিক সমর্থন শুধুমাত্র সম্পদ নয়। যখন কেউ দেয় তখন তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তা করবে যার অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে, যেমন আন্তরিক পরামর্শ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কারও অনুগ্রহ গণনা না করে অন্যদের সাথে এই দোয়াগুলি দেওয়া এবং ভাগ করা অন্তর্ভুক্ত কারণ এটি প্রমাণ করে যে তারা গ্রহণ করার জন্য দিয়েছে। অন্যদের থেকে কিছু। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 9:

*"[বলেছি, "আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখের [অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য]। আমরা তোমাদের কাছে পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা চাই না।"*

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিরত থাকা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের কাছে থাকা নিয়ামত যেমন ধন-সম্পদ, মহান আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় বিষয়গুলিতে অন্যদের থেকে আটকে রাখা। কে

তাদের কাছ থেকে কিছু অনুরোধ করছে এই মুসলমান তা পর্যবেক্ষণ করবে না বরং তারা কেবল অনুরোধের পিছনে কারণটি মূল্যায়ন করবে। যদি কারণটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তারা আশীর্বাদ বন্ধ করে দেবে এবং কার্যকলাপে অংশ নেবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

*"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."*

এর মধ্যে রয়েছে গীবত করা বা ক্রোধ প্রকাশের মতো মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় নয় এমন বিষয়ে কথাবার্তা ও কাজ বন্ধ রাখা। এই মুসলিম তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলবে না এবং কাজ করবে না এবং শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতে অগ্রসর হবে যখন এটি মহান আল্লাহকে খুশি করবে, অন্যথায়, তারা অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং বিরত থাকবে।

উপসংহারে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা বিশ্বাসের পরিপূর্ণতার দিকে পরিচালিত করে কারণ এগুলি একজনের আবেগের উপর ভিত্তি করে এবং তাই নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। যে ব্যক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণে ধন্য হবে সে ইসলামের অন্যান্য দায়িত্ব পালনকে সহজ মনে করবে। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

## আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১৭

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে আজ, মানুষের প্রতি আনুগত্য শুধুমাত্র স্বার্থপর জাগতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে এবং এই জাতীয় রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমর্থন তার লোকেদের সমস্যা ছাড়া কিছুই নিয়ে আসে না। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৬৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."*

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য

না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভণ্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ১৮

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ঈমানের মর্মে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ থেকে দূরে থাকবে। এটি সালিহ আহমাদ আশ-শামীর, মাওয়ায়েজ আল সাহাবাহ, পৃষ্ঠা 387- এ আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে যা নিজের ঈমান ও সম্মান রক্ষার জন্য এড়িয়ে চলা উচিত।

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং বেশিরভাগ হারাম জিনিস, যেমন মদ পান করা সম্পর্কে সচেতন। তাই এগুলো মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে তাই তাদের উচিত সে অনুযায়ী কাজ করা। অর্থ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ দায়িত্ব পালন করুন এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। অন্য সব বিষয় যা বাধ্যতামূলক নয় এবং সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাই পরিহার করা উচিত। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন কেউ স্বেচ্ছাকৃত কাজ করেনি বরং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন কেন তারা একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ করেছে। অতএব, স্বেচ্ছামূলক কাজ ত্যাগ করলে পরকালে কোন পরিণতি হবে না যেখানে স্বেচ্ছামূলক কাজ করা হবে শাস্তি, পুরস্কার বা ক্ষমা। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটির উপর আমল করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনেক সমস্যা ও বিতর্কের সমাধান

করবে এবং প্রতিরোধ করবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ সন্দেহজনক বা এমনকি নিরর্থক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় তখন এটি তাকে বেআইনীর এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রায়ই নিরর্থক এবং অকেজো বক্তৃতা দ্বারা পূর্বে হয়। তাই সন্দেহজনক ও অনর্থক বিষয় এড়িয়ে চলা একজন মুসলমানের ঈমান ও সম্মানের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) -১৯

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তি জ্ঞানের উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাবে যতক্ষণ না তারা তাদের উপরের ব্যক্তির প্রতি হিংসা না করে। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, 1/218।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে হিংসা ভাল কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

হিংসা করা একটি গুরুতর এবং বড় পাপ কারণ হিংসাকারীর সমস্যা অন্য ব্যক্তির সাথে নয় বাস্তবে এটি মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনিই সেই নিয়ামত যিনি ঈর্ষা করা হয় তাকে দিয়েছেন। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বরাদ্দ এবং পছন্দের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ একটি ভুল করেছেন যখন তিনি তাদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ বরাদ্দ করেছিলেন।

কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন হিংসাকারী আশীর্বাদ না পেলেও মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে

নেওয়ার চেষ্টা করে। হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং মালিকের আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই প্রকারটি পাপ নয়, এটি অপছন্দনীয় বলে বিবেচিত হয় যদি হিংসা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং যদি তা ধর্মীয় আশীর্বাদের উপর হয় তবে প্রশংসনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যায় সে হল সেই ব্যক্তি যে বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং ব্যয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যেতে পারে সেই ব্যক্তি যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন এবং অন্যকে তা শেখান।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত হিংসা করা ব্যক্তির প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ২০

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকির এক তৃতীয়াংশ। ইবনু আবদ রাব্বিহ এর আল ইকাদ আল ফরিদ, 1/197 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলমানের প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হল মহান আল্লাহর সাথে, যা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। লোকেদের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই রাখা উচিত যদি না একজনের কাছে একটি বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন পিতামাতা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধুমাত্র শিশুদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উত্সাহিত করে যে প্রতারক হওয়া একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারী, 2227 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে হবেন যে তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপরে বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে। যার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ আছেন, তিনি শেষ বিচারের দিন কিভাবে সফল হতে পারেন?

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- ২১

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন যে, একজন ব্যক্তি দৃঢ় ঈমানের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা এই সত্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দেখছেন। সালিহ আহমাদ আশ-শামীর, মাওয়ায়েজ আল সাহাবাহ, পৃষ্ঠা 400- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক দৃষ্টি তার আকার বা অবস্থান নির্বিশেষে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে। উপরন্তু, মহান আল্লাহ সৃষ্টির কর্মের সাক্ষী। তিনি তাদের বাহ্যিক শারীরিক কর্ম এবং ভিতরের লুকানো উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। কিছুই তার ঐশ্বরিক দৃষ্টি এড়াতে পারে না.

তাই একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করা, যাতে তারা ঐশী দৃষ্টির প্রতি নিরন্তর সজাগ থাকে এমন স্তরে পৌঁছানোর জন্য। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই স্তরটিকে ঈমানের উৎকর্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন কেউ ঐশ্বরিক দৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হয় তখন এটি তাদের পাপ থেকে বিরত রাখে এবং সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করে।

একজন মুসলমানের উচিত তাদের নিজের আত্মার একজন তত্ত্বাবধায়ক হওয়া এবং তারা যেন গাফেল না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিজেকে ক্রমাগত বিবেচনা করা। যেহেতু পাপের প্রধান কারণ হলো গাফিলতি। যে ব্যক্তি নিজেদেরকে আমলে

নিবে সে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা সহজ পাবে। যে ব্যক্তি নিজেকে এভাবে দেখে না সে বুঝতে না পেরে পাপ করবে। একজন মুসলমানকেও নিশ্চিত করা উচিত যে তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সমস্ত লোকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের পরামর্শ দেবে কারণ এটি তাদের উপর মহান আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)- 22

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের উপর অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন যে, তার ভাইকে ক্ষুধার্ত রেখে তৃপ্ত হওয়া উচিত নয়। তার ভাইকে কাপড় ছাড়া রেখে যাওয়ার সময় তাকে পোশাক পরা উচিত নয় এবং তার জন্য তার সম্পদ ব্যয় করার জন্য লোভ করা উচিত নয়। সালিহ আহমাদ আশ-শামীর, মাওয়ায়েজ আল সাহাবাহ, পৃষ্ঠা 400- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। এটি সমস্ত মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য, তারা সম্পর্কযুক্ত হোক বা না হোক এবং তারা একে অপরকে চেনে বা না জানুক। পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে মুসলমানদের অনেক অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সেগুলি শিখতে ও পূরণ করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি অধিকার তালিকাভুক্ত করেছেন একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের পাওনা।

প্রথমত, তারা শান্তির সালামের জবাব দিতে হবে যদিও উত্তর তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একজন মুসলমানকে তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের প্রতি শান্তি ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে শান্তির ইসলামী অভিবাদন পূর্ণ করতে হবে। এটাই হলো শান্তির ইসলামি অভিবাদনের প্রকৃত অর্থ।

একজন মুসলমানের উচিত অসুস্থ মুসলমানদের শারীরিক ও মানসিক সহায়তা প্রদানের জন্য দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করা। সমস্ত অসুস্থ মুসলমানের সাথে দেখা করা কঠিন হবে তবে প্রতিটি মুসলমান যদি অন্তত তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে যান তবে বেশিরভাগ অসুস্থ ব্যক্তি এই সহায়তা পাবেন। সকল প্রকার নিরর্থক বা পাপপূর্ণ কথাবার্তা এবং কাজ এড়িয়ে চলতে হবে যেমন, পরচর্চা করা, অন্যথায় একজন মুসলমান আশীর্বাদের পরিবর্তে পাপ অর্জন করবে।

একজন মুসলমানের যখন সম্ভব তখন অন্য মুসলমানদের জানাজায় যোগদান করা উচিত কারণ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অতএব, যত বেশি মুসলমান উপস্থিত থাকবেন তত ভাল। যেমন একজন চায় যে অন্যরা তাদের জানাজায় অংশ নেবে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করবে তাদেরও অন্যদের জন্য এটি করা উচিত। এই বিশেষ কাজটি একজন মুসলমানের জন্য একটি ভাল অনুস্মারক যে তারাও শেষ পর্যন্ত মারা যাবে। আশা করা যায়, এটি তাদের আচরণকে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করবে যাতে তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করার মাধ্যমে তাদের নিজের মৃত্যুর জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের খাবার এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত যতক্ষণ না কোনো বেআইনি বা অপছন্দনীয় কার্যকলাপ সংঘটিত না হয়, যা এই দিনে এবং যুগে খুবই বিরল। লক্ষণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কিছু মুসলমান সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয় যেখানে বেআইনি বা অপছন্দনীয় জিনিসগুলি ঘটে এবং তাদের কাজকে সমর্থন করার জন্য এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য খোদায়ী শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা উচিত নয় কারণ এটি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং খোদায়ী শাস্তির আমন্ত্রণ।

পরিশেষে, প্রধান হাদিসটি মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়ে উপদেশ দিয়ে শেষ হয় যে, যারা হাঁচি দেওয়ার পর মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে তার জন্য দোয়া করতে।

সহীহ বুখারী, ২৭১৪ নং হাদিসে পাওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ।

প্রথমত, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলকে ভালো পরামর্শ দেওয়া উচিত। সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি স্পষ্টভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেভাবে উপদেশ দেওয়া যেভাবে তারা তাদের উপদেশ দিতে চায়। একজনের খারাপ অনুভূতি তাদের এই দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া উচিত নয় কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ পরামর্শ দেয় সে দেখতে পাবে যে লোকেরা তাদের ভুল পরামর্শ দেয়। আন্তরিক উপদেশ প্রদান করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, জামে আত তিরমিযী, 1925 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এই দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। প্রার্থনা হিসাবে। সত্য যে আন্তরিকভাবে অন্যদের উপদেশ এই বাধ্যতামূলক কর্তব্যের সাথে স্থাপন করা হয়েছে এর গুরুত্ব তুলে ধরে। তাই একজন মুসলমানকে কখনোই এই সত্যকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তি, ধর্ম নির্বিশেষে, এমন জিনিস পেতে ভালবাসে যা তাদের উপকার করবে এবং ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্য মুসলমানদের জন্য তা পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। অন্যদের কাছে উপলব্ধ যেকোনো উপায়ে তারা নিজের জন্য পছন্দ করে এমন জিনিসগুলি পেতে চেষ্টা করে এটিকে একজনের কর্মের মাধ্যমে দেখানো উচিত। একজন মুসলমানের কেবল তাদের কথার মাধ্যমে এই দাবি করা উচিত নয়।

সকল মুসলমানের আরেকটি অধিকার হল, তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা উচিত। এটি একে অপরের প্রতি করুণাময় হওয়ার একটি দিক যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 29:

*" মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; এবং তার সাথে যারা... নিজেদের মধ্যে করুণাময়..."*

প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান অন্যের জন্য প্রার্থনা করে তখন তারা নিজেরাই এর দ্বারা উপকৃত হয়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 6927 নম্বর, যখন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানদের জন্য গোপনে প্রার্থনা করে তখন একজন ফেরেশতা তাদের জন্য প্রার্থনা করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল একজন মুসলমানের উচিত অন্য মুসলমানদের জন্য তা পছন্দ করা এবং ঘৃণা করা যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আন্তরিক বিশ্বাসের শর্ত করেছেন।

একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের বৈধ আনন্দে খুশি হওয়া উচিত এবং আশা করা উচিত যে এটি তাদের জন্য স্থায়ী হয়। অন্য মুসলমান যখন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তাদের দুঃখিত হওয়া উচিত এবং তাদের সাহায্য করা উচিত, এমনকি যদি এটি তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাই হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মুসলমানরা একটি দেহের মত। শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হলে বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়।

একজন মুসলমান কখনই অন্য মুসলিম বা অমুসলিমকে তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা উচিত নয় কারণ জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদত্ত মুসলমানের সংজ্ঞা এটিই। , সংখ্যা 2627। প্রকৃতপক্ষে, মানুষকে নিজের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা একটি দাতব্য কাজ যা একজন ব্যক্তি নিজের জন্য করে। সহীহ মুসলিম, 250 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি নিজের জন্য একটি দাতব্য কাজ কারণ এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করে।

অন্যান্য মুসলমানদের অধিকারের মধ্যে রয়েছে তাদের পথ থেকে যেকোনো বাধা দূর করা। এতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি রূপক বাধা রয়েছে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 6670 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তিকে এমন একটি গাছ অপসারণ করার জন্য জান্নাত দেওয়া হবে যেটি সহ-মুসলিমদের দ্বারা ব্যবহৃত পথকে বাধা দিচ্ছিল।

এটা একজন মুসলমানের অধিকার যে, অন্য মুসলমানরা যখন তাদের উপর নিপীড়িত হয় তখন তাদের সাহায্য করে যেমন, আর্থিক সাহায্য, এবং যারা নিপীড়ন করে তাদের এই আচরণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে সাহায্য করে। এটি সহীহ বুখারি, 6952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, উপদেশ শুধুমাত্র তখনই দেওয়া উচিত যখন উপদেষ্টা জালিমের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে।

একজন মুসলমানকে পার্থিব কারণে তিন দিনের বেশি অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি নেই। এটি অনেক হাদিসে স্পষ্ট করা হয়েছে যেমন জামি আত তিরমিযী, 1932 নম্বরে পাওয়া একটি। অন্য মুসলমানের কাছ থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এমন একটি গুরুতর বিষয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সতর্ক করেছিলেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1740 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দেন যারা অন্য মুসলমানকে ত্যাগ করেছে যতক্ষণ না তারা পুনর্মিলন করে।

আরেকটি অধিকার হল, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে অহংকারপূর্ণ আচরণ করবে না। পরিবর্তে, তাদের নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত যা সর্বদা স্নেহ এবং সমাজের মধ্যে প্রেমের বিস্তারের দিকে পরিচালিত করে। সুনানে আবু দাউদ, 4895 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে, অহংকার এবং অহংকার শুধুমাত্র সামাজিক বাধা এবং সমাজের বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করে। যদি কোন মুসলমানের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা হয় তবে তাদের একইভাবে উত্তর দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের ধৈর্য এবং ক্ষমা করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে অন্যের প্রতি বিনয়ী হওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য। সুনানে আন নাসাই, 1415 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি কখনোই গরীব ও অভাবীদের সাথে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য হাঁটা অপছন্দ করবেন না।

একজন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমানদের সম্পর্কে গুজব বা গসিপের প্রতি কখনই মনোযোগ না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি হয় সম্পূর্ণ অসত্য বা কল্পকাহিনীর সাথে মিশ্রিত কয়েকটি তথ্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, এমনকি কারো অশুভ ইচ্ছা পূরণের জন্য সত্যকেও প্রেক্ষাপটের বাইরে মোচড় দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত যা বলা হয়েছে তা উপেক্ষা করা এবং পরচর্চাকারীকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত। তাদের কখনই অন্যদের কাছে পরচর্চার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয় বা অন্যদের কাছে পরচর্চাকারীর উল্লেখ করা উচিত নয়। এটা গোপন করে তাদের আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ উভয় জগতে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে কখনই অন্য মুসলমানদের গীবত করা বা অপবাদ দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি বড় পাপ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 290 নম্বর, সতর্ক করে যে গল্প বহনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

একজন মুসলমানের কর্তব্য যে কোনো দুর্দশা থেকে অন্য মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য তাদের সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এটি করবে সে

কিয়ামতের দিন কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। একই হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমের আর্থিক ভার লাঘব করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয় জগতেই উপশম করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত তাদের প্রতি সদয় হওয়া যারা তাদের কাছে ঋণী।

অন্য মুসলমানদের উপর একজন মুসলমানের আরেকটি অধিকার হলো, কোনো মুসলমান যদি অন্য কোনো মুসলমানের ওপর অন্যায় করে এবং তারপর তাদের কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করতে হবে। এর ফলে মহান আল্লাহ তাদের পাপের শিকারকে ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 6592 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করে, সে আরও সম্মানিত হবে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানদের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা উচিত যা জামি আত তিরমিযী, 1921 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ, বড়দের সম্মানের সাথে এবং ছোটদের সাথে করুণার সাথে আচরণ করা উচিত। এই হাদিসটি সতর্ক করে যে, যারা এ ধরনের আচরণ করে না তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 357

নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহকে সম্মান করার একটি অংশ হল বয়স্কদের সম্মান দেখানো। সকল মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টিরই অংশ, তাই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সম্মান করা আসলে সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান করা, অর্থাৎ মহান আল্লাহ।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে তারা যা দেয় তাই তারা পাবে। জামে আত তিরমিযী, 2022 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখন একজন যুবক একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে তার বয়সের কারণে সম্মান ও সম্মান করে, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে তাদের সম্মান করার জন্য কাউকে নিয়োগ করবেন।

অন্য মুসলমানদের প্রতি একজন মুসলমানের পাওনা আরেকটি অধিকার হল, যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ পরিহার করা হয় ততক্ষণ তাদের সাথে প্রফুল্ল থাকা। প্রকৃতপক্ষে, অন্য মুসলমানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাদের হাসি দেওয়া একটি দাতব্য হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 1956 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহজ আচরণ করা যায়, অন্য মুসলমানদের প্রতি নরম ও মৃদু আচরণ করা হয় তাকে জামে আত তিরমিযী, 2488 নং হাদিসে জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারি, 7512 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে এটি এমন একটি আমল যা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এটির উপর আমল করে তাকে জান্নাতে একটি সুন্দর কক্ষের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে জামে আত তিরমিযী, 1984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

অন্য মুসলমানদের মধ্যে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমস্যা সংশোধন করা মুসলমানদের দায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2509 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, এটি করা স্বেচ্ছায় নামায, রোজা বা দানের চেয়ে উত্তম।

অন্য মুসলমানের উপর একজন মুসলমানের আরেকটি অধিকার হলো, তার দোষ-ত্রুটি গোপন করা। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমের দোষ ঢেকে দেবেন যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের দোষ গোপন করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 2546 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যের পাপ উপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু এর অর্থ হল তাদের মৃদুভাবে এবং গোপনে পাপীকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং অন্যদের কাছে তাদের পাপের কথা উল্লেখ না করার পরামর্শ দেওয়া উচিত। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদেরকে অনুরূপ পাপ না করতে শেখাতে চায় তবে তাদের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা এবং মানুষের নাম না করে অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া। এর একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত অন্যের দোষত্রুটি স্ক্রীন করা যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের ত্রুটি এবং অন্য সকলের ভুল স্ক্রীন করেন।

একজন মুসলমানকে সবসময় এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে যা অন্য মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও সন্দেহের জন্ম দেয়। এটি তাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য যা সন্দেহজনক অন্যরা করতে পারে যেমন গীবত এবং অপবাদ। অন্য মুসলমানদের কাছে এই সুরক্ষা প্রসারিত করা তাদের জন্য ভাল ভালবাসার

একটি অংশ যেমন একজন নিজের জন্য ভাল পছন্দ করে। সহীহ বুখারী, 3101 নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার রাতে তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলেন। একই সাথে দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ডেকে জানিয়েছিলেন যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করছেন, অপরিচিত মহিলা নয়। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে একটি ভুল চিন্তাও তাদের মাথায় আসেনি। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সমস্ত মুসলমানদের শেখানোর জন্য শুধুমাত্র এই পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে অন্য মুসলমানদের চিন্তাভাবনা রক্ষা করার জন্য সন্দেহজনক হিসাবে দেখা যেতে পারে এমন কোনও কার্যকলাপকে স্পষ্ট করা উচিত।

এটি আরেকটি ধার্মিক বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত। অন্য মুসলমানদের খারাপ বোধ না করার জন্য যখন কেউ বৈধ কাজগুলি এড়িয়ে চলে তখন এটি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্বামী প্রকাশ্যে তার বোনের মতো অন্যান্য মুসলমানদের সামনে তার স্ত্রীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন না। যদিও, এটি সম্পূর্ণরূপে বৈধ কিন্তু তার বোনের সামনে এটি করা তার খারাপ অনুভব করতে পারে বিশেষ করে যদি তার স্বামী তার সাথে এমন কিছু না করে। এটি একটি উচ্চ স্তরের মহৎ চরিত্র যা বাধ্যতামূলক নয় বরং একটি মহান গুণ।

অন্য মুসলমানদের উপর মুসলমানদের আরেকটি অধিকার আছে যে, তাদেরকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন দিয়ে বরণ করা উচিত। এর মধ্যে এমন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যারা একজন চেনেন এবং যাদের একজন মুসলিম জানেন না। অনেক হাদীসে এ নেক আমল করার গুরুত্ব ও ফজিলত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে ইবনে মাজাহ 68 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, অন্য মুসলমানদের কাছে শান্তির শুভেচ্ছা জানানোর সাথে জান্নাতে প্রবেশের যোগসূত্র রয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 86:

*" এবং যখন তোমাকে সালাম দেওয়া হয়, তখন [প্রতিদানে] তার চেয়ে উত্তম দ্বারা সালাম কর অথবা [অন্তত] [অনুরূপভাবে] প্রত্যাবর্তন কর..."*

জামি আত তিরমিযী, 2706 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান যখন অন্য মুসলমানের সাথে দেখা করে এবং যখন তারা তাদের ছেড়ে যায় তখন শান্তির শুভেচ্ছা জানানো উচিত।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, শান্তির ইসলামিক অভিবাদন একটি ইঙ্গিত যে একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ শব্দ দিয়ে একজন মুসলমানকে স্বাগত জানাতে হবে না বরং প্রতিটি কথোপকথনের সময় তাদের অবশ্যই সদয় শব্দ বজায় রাখতে হবে। উপরন্তু, শান্তির এই বিস্তার একজন মুসলমানের কর্মের মাধ্যমে দেখানো উচিত নয় শুধু কথার মাধ্যমে। এটি অন্যদের কাছে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন প্রসারিত করার প্রকৃত অর্থ।

একজন মুসলমানেরও উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা, অন্য মুসলমানরা যখন তাদের প্রতি সালাম জানায় তখন তাদের সাথে করমর্দন করে। প্রকৃতপক্ষে, যে মুসলমানরা এটি করে এবং তাদের কথোপকথনের সময় যে কোনও পাপ এড়িয়ে চলে তাদের পৃথক হওয়ার আগে তাদের ছোট ছোট গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 5212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অন্য মুসলমানদের যতটা সম্ভব অধিকার রক্ষা করা সকল মুসলমানের কর্তব্য, তারা পাপ না করে বা নিজেদের ক্ষতি না করে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের উচিত অন্যান্য মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করা যা প্রায়শই তাদের পিঠের পিছনে গীবত এবং অপবাদের আকারে লঙ্ঘিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের ইজ্জত রক্ষা করবে সে বিচারের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

যদি অন্য মুসলমান খারাপ আচরণ করে তবে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখা অন্য মুসলমানদের কর্তব্য। উপরন্তু, তাদের উচিত তাদের ব্যক্তিগতভাবে তাদের চরিত্র পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া। জনসমক্ষে এটি করা তাদের বিব্রতকর অবস্থার কারণ হতে পারে এবং এটি একজন মুসলমানের কর্তব্য যে অন্য মুসলমানদের বিব্রত না করা। এছাড়াও, যে ব্যক্তি বিব্রত হয় সে সম্ভবত রাগান্বিত হয়ে উঠবে এবং তাই তাদের দেওয়া ভাল উপদেশ গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম।

# হুদাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ)- ১

যখন খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি শহর শাসন করার জন্য প্রেরণ করেন, তখন তিনি একটি গাধার পিঠে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে রওয়ানা হন। কিছু সময় পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মদিনায় ফেরত ডেকে আনলেন এবং হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাস্তায় লুকিয়ে রইলেন। হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনা থেকে যেই সরল অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। এটা দেখে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর ভাই বলে ডাকলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 580-581- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সরল প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটায়।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন

মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

# হুদাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ)-২

হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, একবার মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতে সতর্ক করেছিলেন, অন্যথায় মহান আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন। অতঃপর তিনি নিকৃষ্ট লোকদের কর্তৃত্ব প্রদান করবেন এবং সর্বোত্তম মানুষের দোয়া কবুল হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 656- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনই পরিত্যাগ করবে না। একজন মুসলমানকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই

ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদের 2928 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

# হুদাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) – ৩

হুদাইফা, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি চান যে কেউ তার দায়িত্বগুলি পরিচালনা করবেন যাতে তিনি মহান আল্লাহর সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে লোকদের থেকে দূরে রাখতে পারেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 660- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কীভাবে নাজাত অর্জন করতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

উল্লেখিত জিনিসগুলির মধ্যে একটি হল যে কোনও ব্যক্তি অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হবেন না। এইভাবে আচরণ করা সময় নষ্ট করে এবং মৌখিক ও শারীরিক উভয় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যদি কেউ সত্যিই আন্তরিকভাবে প্রতিফলিত করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের বেশিরভাগ পাপ এবং তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতার কারণে হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে এটি সর্বদা অন্যের দোষ ছিল তবে এর অর্থ যদি কেউ অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এড়িয়ে যায় তবে তারা কম পাপ করবে এবং কম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এটি তাদের ইসলামিক শিক্ষাগুলিকে আরও শিখতে এবং তার উপর কাজ করার সময়কে খালি করবে যা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উপকারী।

# হুদাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) – ৪

হুদাইফা বিন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে লোকেরা যা জানে তার চেয়ে তারা যা দেখবে তাকে প্রাধান্য দেবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৭২১ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথে বড় বাধা হল ঈমানের দুর্বলতা। এটি একটি দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়, যেমন নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া, অন্যকে ভয় করা, মানুষের আনুগত্যকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপরে রাখা, এর জন্য চেষ্টা না করে ক্ষমার আশা করা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত। বৈশিষ্ট্য ঈমানের দূর্বলতার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হল যে এটি একজনকে পাপ করতে দেয়, যেমন ফরজ কর্তব্যে অবহেলা করা। ঈমানের দুর্বলতার মূল কারণ ইসলামের অজ্ঞতা।

ঈমানকে মজবুত করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। সময়ের সাথে সাথে তারা অবশেষে বিশ্বাসের নিশ্চিততায় পৌঁছে যাবে যা এত শক্তিশালী যে এটি একজন ব্যক্তিকে সমস্ত পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দায়িত্ব পালন করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস অধ্যয়ন করলে এই জ্ঞান পাওয়া যায়। বিশেষ করে, যে শিক্ষাগুলো আনুগত্যকারীদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং যারা মহান আল্লাহর অবাধ্য তাদের জন্য শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করে। এটি একজন মুসলমানের হৃদয়ে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের আশা তৈরি করে যা মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে একটি টান এবং ধাক্কা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মতো কাজ করে।

স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টির উপর প্রতিফলন করে কেউ তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে। সঠিকভাবে করা হলে এটি স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ব, মহান এবং তাঁর অসীম ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মুসলমান রাত ও দিন নিয়ে চিন্তা করে এবং তারা কতটা নিখুঁতভাবে সুসংগত হয় এবং তাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য জিনিসগুলি তারা সত্যই বিশ্বাস করবে যে এটি কোনও এলোমেলো জিনিস নয় যার অর্থ, এমন একটি শক্তি রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে সবকিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে। এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। উপরন্তু, যদি কেউ রাত এবং দিনের নিখুঁত সময় নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। একাধিক ঈশ্বর থাকলে প্রত্যেক ঈশ্বরই রাত ও দিন তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটতে চান। এটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ একজন ঈশ্বর সূর্যের উদয় হতে চাইতে পারেন যেখানে অন্য ঈশ্বর রাত্রি অব্যাহত রাখতে চান। মহাবিশ্বের মধ্যে পাওয়া নিখুঁত নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, নাম আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

*"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."*

আরেকটি জিনিস যা একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে তা হল সৎকর্মে অবিচল থাকা এবং সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকা। বিশ্বাস যেহেতু কর্ম দ্বারা সমর্থিত বিশ্বাস তাই পাপ সংঘটিত হলে এটি দুর্বল হয়ে যায় এবং যখন ভাল কাজ করা হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে আন নাসাই, 5662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমান যখন মদ পান করে তখন সে বিশ্বাসী হয় না।

# হুদাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ)-৫

হুদাইফা বিন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে একজন মুনাফিক সেই ব্যক্তি যে ইসলাম কী তা বর্ণনা করতে পারে যদিও সে তা পালন করে না। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৭৪১ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কুফরী হতে পারে ইসলামকে আক্ষরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা কর্মের মাধ্যমে, যার মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করা জড়িত, যদিও কেউ তাকে বিশ্বাস করে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি একজন অসচেতন ব্যক্তিকে অন্য একটি সিংহের কাছ থেকে সতর্ক করা হয় এবং অসচেতন ব্যক্তি নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেয় তবে তারা এমন একজন বলে বিবেচিত হবে যিনি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করেছিলেন কারণ তারা সতর্কতার ভিত্তিতে তাদের আচরণকে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, যদি অসচেতন ব্যক্তি সতর্ক করার পরে কার্যত তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে, তবে লোকেরা সন্দেহ করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সতর্কীকরণে বিশ্বাস করে না এমনকি যদি অসচেতন ব্যক্তিটি তাদের প্রদত্ত সতর্কতায় মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করে।

কিছু লোক দাবি করে যে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য তাদের অন্তরে রয়েছে এবং তাই তাদের বাস্তবিকভাবে এটি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূর্খ মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের অধিকারী যদিও তারা ইসলামের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো অন্তর পবিত্র হয় তখন তার শরীর পবিত্র হয় যার অর্থ তার কর্ম সঠিক হয়। কিন্তু কারো হৃদয় কলুষিত হলে

শরীর কলুষিত হয় যার অর্থ তাদের কাজ হবে কলুষিত ও ভুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে সে কখনো বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা বাস্তবিকভাবে তাদের প্রমাণ ও প্রমাণ যা বিচার দিবসে জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকাটা একজন ছাত্রের মতোই নির্বোধ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে তাদের জ্ঞান তাদের মনে আছে তাই তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এটি লিখতে হবে না। নিঃসন্দেহে এই ছাত্রটিও একইভাবে ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে বিচার দিবসে উপনীত হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, যদিও তাদের বিশ্বাস থাকে। তাদের হৃদয়

# হুদাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ)- ৬

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশটি আর প্রয়োগ করা হয়নি। যখন তারা উহুদ পর্বত থেকে নেমে আসে তখন এটি মুসলিম বাহিনীর পিছনের অংশকে উন্মোচিত করে দেয়। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই বিভ্রান্তির সময় কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, ভুলবশত অন্য একজন সাহাবী, আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করেন। তাঁর পুত্র হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি উহুদেও উপস্থিত ছিলেন যা ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিন্তু কখনও সাহাবীদের বিরুদ্ধে তা ধরেননি, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন এবং বহু বছর পরে তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত এই সদিচ্ছা বজায় রেখেছিলেন। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 46-এ আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারি, 3824 নম্বরেও লিপিবদ্ধ আছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

*"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"*

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."*

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

# হুদাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) – ৭

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে, দুটি মুসলিম বাহিনী, একটি সিরিয়ার এবং অন্যটি ইরাকের, একবার তাদের সামগ্রিক নেতা কে হবেন তা নিয়ে বিতর্কে পড়েছিল। এই বিরোধ প্রায় সহিংসতায় পরিণত হয়েছিল কিন্তু হুদাইফা বিন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহাবীগণ, যারা উপস্থিত ছিলেন তারা উভয় পক্ষের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটিয়ে রক্তপাত রোধ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা 255-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 4 আন নিসা, 114 শ্লোকের সাথে সংযুক্ত:

*"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।*

এই আয়াতে মহান আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন যে, অন্যদের সাথে কথা বলার সময় মানুষের কীভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তারা নিজের এবং অন্যদের জন্য উপকৃত হয়। প্রথমটি হল যখন মুসলমানরা একত্রিত হয় তখন তাদের আলোচনা করা উচিত কিভাবে অন্যদের উপকার করা যায় যা সম্পদ এবং শারীরিক সাহায্যের আকারে দাতব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি একজন মুসলিম একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় না থাকে তবে এটি

তাদের সাহায্য করার সমান পুরস্কার অর্জনের একটি চমৎকার উপায়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6800, পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যকে ভাল কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে যেন সে নিজেই ভাল কাজ করেছে। যদি কেউ অসুবিধায় কাউকে সাহায্য করতে না পারে বা অন্যকে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে না পারে তবে তারা অন্তত অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা ফেরেশতাদের প্রার্থনাকারীর জন্য প্রার্থনা করতে বাধ্য করে। সুনান আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই মানসিকতা দলটিকে অভাবী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে যা তাদের মানসিক সহায়তা প্রদান করে। এটি একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে এবং তাদের কষ্ট মোকাবেলা করার সময় তাদের শক্তির একটি নতুন মোড প্রদান করে। লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে যখন কেউ একজন অভাবী ব্যক্তির পরিস্থিতি উল্লেখ করে তখন তাদের উদ্দেশ্য তাদের প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করা উচিত। সময় কাটানোর জন্য এবং তাদের উপহাসের লক্ষ্যে পরিণত করা কখনই উচিত নয়।

আশীর্বাদ লাভের দ্বিতীয় উপায় হল যখন কেউ বৈধ কোন বিষয়ে কথা বলে যা ইহকাল বা পরকালে কারো উপকারে আসে। এই দিকটির মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো কাজ করার এবং মন্দ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া।

এই আয়াতে উল্লিখিত তৃতীয় দিকটি হল একটি গঠনমূলক মানসিকতার সাথে অন্যদের সাথে কথোপকথন করা যা মানুষকে ধ্বংসাত্মক মানসিকতার অধিকারী করার পরিবর্তে ইতিবাচক উপায়ে একত্রিত করে যা সমাজের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। যদি একজন ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসার উপায়ে একত্রিত করতে না পারে তবে তারা ন্যূনতম যা করতে পারে তা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না। এমনকি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হলে এটি একটি ভাল কাজ

হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এটি সহীহ বুখারী, 2518 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই বিরোধী মুসলমানের মধ্যে মিলন স্বেচ্ছায় নামায ও রোযার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সমাজের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি ভালো জিনিসই ছিল এই ধার্মিক মনোভাবের ফল যেমন স্কুল, হাসপাতাল ও মসজিদ নির্মাণ।

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজন মুসলমান তখনই এই আয়াতে উল্লিখিত মহান পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করবে। প্রতিটি ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নয় তাদের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে পুরস্কৃত করা হবে। এটি সহীহ বুখারী, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অকৃত্রিম মুসলিম দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে যে তারা তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

# হুদাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) – ৮

ইয়ামামার যুদ্ধের পর , যার ফলে অনেক মুসলিম হতাহত হয়েছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেছিলেন, উমর ইবনে খাত্তাব খলিফা, আবু বক্কর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ভয়ে পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করতে উত্সাহিত করেছিলেন। যাতে পবিত্র কুরআনের মুখস্থকারীরা মারা যেতে থাকে বা যুদ্ধে শহীদ হলে আয়াতগুলি হারিয়ে যেতে পারে। এর আগে পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো কোনো একটি বইয়ে ছিল না, বরং সেগুলো হয় মুখস্থ করা হতো বা বিভিন্ন বস্তুর ওপর লেখা হতো, যেমন পাথর, যা বিভিন্ন মানুষের দখলে ছিল। প্রাথমিকভাবে, আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি এমন কিছু করতে চাননি যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন উমর অটল ছিলেন, তখন আবু বক্কর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য এটিই সর্বোত্তম পদক্ষেপ। আবু বক্কর জায়েদ বিন সাবিতকে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কপিটি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে থেকে যায়, যতক্ষণ না তিনি মারা যান, তারপর তা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবং অবশেষে তাঁর কন্যা এবং মুমিনদের মা হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করা হয়। তার সাথে সন্তুষ্ট সহীহ বুখারীর ৭১৯১ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত পর্যন্ত, মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআন পাঠ করা জায়েয ছিল বিভিন্ন উপভাষা অনুযায়ী। সাতটি ভিন্ন উপভাষায় প্রকাশিত। এটি এর আবৃত্তিতে নমনীয়তার জন্য অনুমতি দেয়। কিন্তু আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের সময় হুযায়ফাহ ইবনে ইয়ামান

রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া ও ইরাক থেকে আগত সৈন্যদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে এই পার্থক্যগুলি বিশেষ করে অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারে, কারণ তারা আপত্তি করতে পারে যে তেলাওয়াতের পদ্ধতির সাথে তারা পরিচিত ছিল না। তাই তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে আসেন এবং মুসলিম জাতিকে একটি তেলাওয়াতে জড়ো করার অনুরোধ করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার পর এতে সম্মত হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের কেউই তার সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। তিনি পবিত্র কুরআনের ভৌত কপি পাঠালেন যা মুমিনদের মা হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিল; এই সংস্করণের কপি তৈরি; এবং তাদেরকে সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্য জুড়ে প্রেরণ করেন এবং তাদের তিলাওয়াতের পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন, যা ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর গোত্র কুরাইশদের পাঠের পদ্ধতি। এটি সহীহ বুখারী, 4987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পবিত্র কুরআন পৌঁছে দেওয়ার জন্য মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাই মুসলমানদের অবশ্যই সর্বদা পবিত্র কুরআনকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ করে তাদের প্রচেষ্টাকে সম্মান করতে হবে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

*"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"*

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং

শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

উপরন্তু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্মকাণ্ড ইসলামে ঐক্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

*"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."*

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে

নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

# আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। . যখন তিনি ধু আল সালালসিলে পৌঁছেছিলেন তখন তিনি শত্রুর নম্বরটি নোট করেছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি বার্তা পাঠান, যাতে শক্তিবৃদ্ধির অনুরোধ করা হয়। তিনি আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রা.) এর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বাহিনী যখন ধু আল সালালসিলে পৌঁছায় তখন তাদের নেতৃত্ব কে দেবে তা নিয়ে উভয় বাহিনী দ্বিমত পোষণ করে এবং ঘোষণা করে যে প্রতিটি বাহিনীকে আলাদাভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু আবু উবাইদা বিন জাররাহ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি ছিলেন উত্তম স্বভাবের এবং সহজ-সরল প্রকৃতির একজন মানুষ এবং তাই তিনি আমর বিন আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উভয় বাহিনীকে একত্রিত করার ইচ্ছামত আদেশ দিতে সম্মত হন। পুরুষদের এবং তর্ক এড়িয়ে চলুন. এ খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলে তিনি আবু উবাইদা বিন হাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর রহমতের জন্য দুআ করলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 370-372-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে

অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার

উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

*"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."*

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না

করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

# আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ)-২

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে একটি প্রতিনিধি দল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করেন। নাজরানের এই প্রতিনিধি দলটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাদের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এই ব্যক্তি হতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু উবাইদা বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বেছে নিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তিনিই সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার জাতির মধ্যে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 71-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

# আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) – ৩

তাঁর খিলাফতের সময়, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পূর্বসূরিদের মতোই নম্রতা অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর গভর্নরদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা অহংকার এড়াবে যা তাদের সমাজে দুর্বল বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেবে।

উদাহরণ স্বরূপ, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.) সিরিয়া অভিযানের নেতা ছিলেন, যখন একজন রোমান সৈন্য আলোচনার জন্য তার কাছে এসেছিল। রোমান সৈন্য তাকে তার লোকদের থেকে আলাদা করতে পারেনি, কারণ তারা সবাই একই রকম ছিল। রোমান সৈন্য অবশেষে তাকে মাটিতে বসে দেখতে পেল। তিনি যখন তার সরল আচার-ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন করলেন, তখন আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে, তিনি দুনিয়ার আরাম-আয়েশের অধিকারী নন, প্রকৃতপক্ষে, তিনি কেবল একটি ঘোড়া এবং একটি অস্ত্রের মালিক ছিলেন। তিনি আরো বলেন, যদি তার উপর বসার জন্য একটি কুশন থাকে তবে তিনি তা অন্য মুসলমানকে ব্যবহার করার জন্য দেবেন, কারণ তিনি মহান আল্লাহর কাছে তার চেয়ে উত্তম হতে পারেন। তিনি তখন রোমান সৈন্যকে স্মরণ করিয়ে দেন যে পৃথিবীতে হাঁটা (কোন প্রাণীর উপর চড়ার পরিবর্তে), মাটিতে বসে থাকা, মাটিতে খাওয়া এবং মাটিতে শুয়ে থাকা মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির মর্যাদাকে কম করে না। বরং মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তির সওয়াব বৃদ্ধি করেন এবং তাদের নম্রতার কারণে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 56-57- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যখন মহান

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ের সাথে জীবনযাপন করবে তখন তাকে মর্যাদায় উন্নীত করা হবে । এটি ঘটে কারণ নম্রতা মহান আল্লাহর দাসত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নম্রতার বিপরীত যা অহংকার শুধুমাত্র মালিকের জন্য, অর্থাৎ আল্লাহ, সর্বোত্তম, কারণ মানুষের যা কিছু আছে তা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং দান করা হয়েছে। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি অহংকার পরিহার করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে নম্রতা প্রদর্শন করে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব এবং উভয় জগতেই প্রকৃত মহিমার দিকে নিয়ে যায়।

# আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) – ৪

সিরিয়া অভিযানের সময়, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহকে খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট দ্বারা দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। এই খবর তাঁর কাছে পৌঁছলে, আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, তিনি দুনিয়াতে ক্ষমতার সন্ধান করেননি এবং তিনি যা চেয়েছিলেন তা পার্থিব লাভও নয়। তিনি আরও বলেন, এই পৃথিবীতে মানুষ যা দেখছে তা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে এবং শেষ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 271- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং পরকালের উত্তম গৃহ লাভের জন্য কাজ করতেন। এই মানসিকতা প্রাপ্ত হয় যখন কেউ এই জড় জগত ও পরকাল সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি এবং উপলব্ধি গ্রহণ করে।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয়

তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন।

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

# আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ)-৫

সিরিয়া অভিযানের সময়, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহকে খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট দ্বারা দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাই খালিদ বিন ওয়ালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। খালিদ, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, প্রতিস্থাপিত হওয়া নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না কিন্তু যারা শুনছেন তাদের অনুস্মারক হিসাবে, আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছেন যে তারা সকলেই মহান আল্লাহর আদেশ পালনকারী ভাই ছিল। আর যদি কোন মুসলমানের ভাইকে তার উপর নিযুক্ত করা হয়, তবে তা তার আধ্যাত্মিক বা পার্থিব বিষয়ে কোন ক্ষতি করবে না, বরং যে দায়িত্বে আছে তার প্রলোভনের কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বা সে যা প্রকাশ পেয়েছে তার কারণে তার পাপের মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। , যারা মহান আল্লাহ দ্বারা সুরক্ষিত ব্যতীত. ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 271- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটা স্পষ্ট যে হিংসা অনেক মুসলমানকে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ঘটবে বলে সতর্ক করেছেন। এটি অন্যান্য অনেক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, এটি মুসলমানদেরকে ভালো সমর্থন করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে বাধা দেয় তা নির্বিশেষে যেই করুক কেন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি অন্যদের সাহায্য করতে চায় না কারণ তারা বিশ্বাস করে যে সমাজে অন্য ব্যক্তির পদমর্যাদা তাদের নিজের থেকে বাড়বে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের চরিত্র থেকে হিংসা দূর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি জিনিস যা এই লক্ষ্যে সাহায্য করতে পারে তা হল

একজন ব্যক্তির যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া। মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে দেন না কারণ এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি পরিবর্তে প্রতিটি ব্যক্তির বিশ্বাসের জন্য সর্বোত্তম যা দেন। এটা বোঝা অন্যদের যা আছে তা নিয়ে ঈর্ষা দূর করতে পারে। কত মুসলমান সম্পদ অর্জন করেছে যা তাদের ঈমান নষ্ট করেছে? আর কয়জন মুসলমানকে বিচার দিবসে ক্ষমা করা হবে কারণ তারা ধৈর্য ধরে পরীক্ষা সহ্য করেছে? অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে যে এই জড় জগত সীমিত হওয়ায় এর ভিতরের জিনিসের প্রতি ঈর্ষা করা সহজ। কিন্তু একজন মুসলমান যদি পরকালের লক্ষ্য রাখে এবং এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে তাকে অগ্রাধিকার দেয় তবে তা তাদের থেকে ঈর্ষা দূর করবে। কারণ আখেরাতের আশীর্বাদ সীমাহীন তাই ঈর্ষান্বিত হওয়ার দরকার নেই কারণ এখানে ঘুরতে গেলে প্রচুর নেয়ামত আছে, সেগুলো কখনো শেষ হবে না। কিন্তু বিশ্বের মধ্যে পাওয়া সীমিত জিনিসগুলিকে যত বেশি লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা করবে তারা তত বেশি ঈর্ষান্বিত হবে।

# আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ)- ৬

সিরিয়া অভিযানের সময়, একটি মুসলিম সেনাবাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে যতক্ষণ না এর জনগণ এই শর্তে যে খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আসবেন এই শর্তে শহরের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়। তিনি রাজি হন এবং দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে জেরুজালেমে পৌঁছান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরের বাড়িতে থাকার জন্য জোর দিয়েছিলেন, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রা. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর, তাঁর গভর্নরদের সর্বদা পরীক্ষা করার অভ্যাস ছিল যে তারা সমাজের নেতা হিসাবে কীভাবে জীবনযাপন করে এবং আচরণ করে। যখন তিনি তার বাড়িতে প্রবেশ করলেন তখন তিনি একটি তলোয়ার, ঢাল এবং একটি জিন ছাড়া কিছুই দেখতে পাননি। তিনি যখন তার জীবনধারা নিয়ে প্রশ্ন করেন, তখন আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন যে, তার কাছে যা কিছু ছিল তা তাকে তার গন্তব্য অর্থাৎ পরকালের জন্য যথেষ্ট। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি ছাড়া দুনিয়া তাদের সবাইকে পরিবর্তন করেছে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 302-303- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর

মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

# আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) -৭

আবু উবাইদা বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজনের উচিত তাদের পুরানো পাপগুলোকে নতুন নেক আমল দ্বারা প্রতিস্থাপন করে মুছে ফেলা। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২০৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানকে একটি নেক আমলের সাথে পাপের অনুসরণ করা উচিত যাতে এটি পাপকে মুছে ফেলে। এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। যদি কেউ তাদের সৎ কাজের সাথে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করে তবে এটি ছোট বা বড় যে কোনও পাপ মুছে ফেলবে। কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করার একটি অংশ হল পাপের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সচেষ্ট হওয়া কারণ একটি সৎ কাজের সাথে তা অনুসরণ করার অভিপ্রায়ে পাপ করা একটি বিপজ্জনক বিপথগামী মানসিকতা। একজনকে পাপ না করার চেষ্টা করা উচিত এবং যখন সেগুলি ঘটে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

# আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) – ৮

আবু উবাইদা বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, তিনি যদি এমন কাউকে চিনতেন – যে কিনা ফর্সা হোক বা গাঢ় বর্ণের, স্বাধীন হোক বা দাস, বাগ্মী হোক বা অকথ্য – যে তার চেয়ে বেশি ধার্মিক। তিনি অবশ্যই তাদের ত্বকে থাকতে পছন্দ করবেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কিতাব আয যুহদ , সাদ/২৩০- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৷

এটি ইসলামে সমতার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

# আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ)- ৯

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের 17 তম বছরে, একটি বড় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দেশে, বিশেষ করে সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সিনিয়র সাহাবী, যেমন আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ এবং মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা গেছেন। তারা সকলেই মহান আল্লাহর প্রতি ধৈর্যশীল ও আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা আদেশ করেছিলেন তা সহজেই মেনে নেন।

আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যু শয্যা সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জনগণকে নামাজ কায়েম, ফরজ দান, রোজা, দান-খয়রাত, পবিত্র হজ্জ (হজ) ও ওমরা পালন, একে অপরের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখতে, একে অপরকে ভালবাসতে, শাসকদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার উপদেশ দেন। বস্তুজগতের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা যতদিন বেঁচে থাকুক না কেন তারা শেষ পর্যন্ত মারা যাবে তাই, সবচেয়ে চতুর ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক আনুগত্যশীল এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 424-426- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ এই উপদেশটি পূরণ করতে পারে যখন তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

কেউ সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা এই দোয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়।

উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্ণতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

# আবু দারদা (রাঃ)- ১

তাঁর খিলাফতকালে, উমর ইবনে খাত্তাব একবার আবু দারদাকে দেখতে গিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁকে দেখতে পেলেন যে তিনি সামান্য গৃহসজ্জার সাথে একটি খুব সাধারণ এবং সাধারণ বাড়িতে বসবাস করছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁকে নিয়মিত উপবৃত্তি পেতেন এবং সম্পদ কোথায় গেছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যখন মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) , তাদেরকে এই পৃথিবী থেকে একই পরিমাণ রিজিক নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন একজন সওয়ারী একটি সংক্ষিপ্ত যাত্রায়। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তারা কীভাবে পরিণত হয়েছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তিনি শেষ করলেন। ফলে তারা দুজনেই অনেকক্ষণ কাঁদলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 123- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6416 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার তাঁর সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই পৃথিবীতে অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসাবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিতেন যে, যখন একজন ব্যক্তি সন্ধ্যায় পৌঁছায় তখন তার সকালবেলা বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যদি তারা সকালে পৌঁছায় তবে সন্ধ্যায় তাদের বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যে একজন মুসলমানকে অসুস্থতার সম্মুখীন হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে এবং তাদের মৃত্যুর আগে তাদের জীবনের ভাল ব্যবহার করতে হবে।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে দীর্ঘ জীবনের জন্য তাদের আশাকে সীমিত করতে শেখায় যা আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ বস্তুজগতের জন্য নিজের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে কারণ এটি একজন মুসলমানকে বিশ্বাস করে যে তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর সময় আছে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের এই অস্থায়ী পৃথিবীকে তাদের স্থায়ী আবাস হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের এমন একজনের মতো আচরণ করা উচিত যে এটি ছেড়ে যেতে চলেছে, কখনও ফিরে আসবে না। এটি একজনকে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য অর্থাৎ পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার অধিকাংশ উৎসর্গ করতে এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্বের বাইরে বস্তুজগত লাভের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সীমিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই ধারণাটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 39:

*"...এই পার্থিব জীবন শুধুমাত্র [অস্থায়ী] ভোগ-বিলাস, এবং প্রকৃতপক্ষে, পরকাল - এটি [স্থায়ী] বন্দোবস্তের আবাস।"*

জামে আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে আলোচিত মূল হাদিসের অনুরূপ একটি হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এই পৃথিবীতে এমন একজন সওয়ার হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে ছায়ার নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। একটি গাছ এবং তারপর দ্রুত এগিয়ে যায়। এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতিকে নির্দেশ করার জন্য মহানবী (সা.) একে ছায়ার সাথে তুলনা করেছেন যা সকলেই জানেন, স্থায়ী বলে মনে হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বস্তুগত জগত কারো কারো কাছে এভাবেই দেখা দিতে পারে। তারা এমন আচরণ করে যেন পৃথিবী চিরকাল স্থায়ী হবে যেখানে বাস্তবে এটি দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে।

উপরন্তু, এই হাদিসে একজন আরোহীর কথা বলা হয়েছে, হেঁটে যাওয়া কাউকে নয়। এর কারণ হল একজন রাইডার পায়ে হেঁটে ভ্রমণকারীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম বিশ্রাম নেবে। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির থাকার সময় খুব কম। এটা সবার কাছে বেশ স্পষ্ট। এমনকি যারা বয়স্ক বয়সে পৌঁছেছে তারা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি ঝলকানি দিয়ে গেছে। তাই বাস্তবে, কেউ বার্ধক্যে উপনীত হোক বা না হোক জীবন কেবল একটি মুহূর্ত। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

*"যেদিন তারা এটা দেখবে, সেদিন এমন হবে, যেন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"*

প্রকৃতপক্ষে, বস্তুগত জগৎ একটি সেতুর মতো যাকে অতিক্রম করতে হবে এবং স্থায়ী বাড়ি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যেভাবে একজন মানুষ বাসস্টেশনকে তার বাসস্থান হিসেবে নেয় না জেনেও তারা সেখানে অল্প সময়ের জন্য থাকবে, একইভাবে, একজন ব্যক্তি অনন্ত পরকালে পৌঁছানোর আগে পৃথিবী একটি ছোট স্টপ।

যখন কেউ সারাজীবনের ছুটিতে একবার বেড়াতে যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা তাদের বিলাসবহুল গৃহস্থালী সামগ্রী যেমন একটি প্রশস্ত স্ক্রীন টেলিভিশনের উপর ব্যয় সীমিত করে এবং পরিবর্তে তাদের হোটেল যে পরিষেবাগুলি অফার করে তার সাথে কাজ করে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা বোঝে যে হোটেলে তাদের থাকার সময় সংক্ষিপ্ত হবে এবং শীঘ্রই তারা আর ফিরে যাওয়ার জন্য ছেড়ে যাবে না। এই মানসিকতা তাদের ছুটির গন্তব্যকে তাদের স্থায়ী বাড়ি হিসাবে নিতে বাধা দেয়। একইভাবে, মানুষকে এমন একটি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল যা অবশ্যই এটিকে তাদের স্থায়ী আবাসে পরিণত করবে না।

পরিবর্তে, তাদের পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে বিধান গ্রহণের জন্য যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী আবাস অর্থাৎ পরকালে পৌঁছাতে পারে।

যখনই একজন ব্যক্তি ভ্রমণের ইচ্ছা করেন তখনই তারা ভ্রমণকে আরামদায়ক এবং সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে পরকালের জন্য সর্বোত্তম বিধান হল তাকওয়া। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

*"...নিশ্চয়ই সর্বোত্তম রিযিক হল আল্লাহকে ভয় করা..."*

এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন। দুনিয়া থেকে পরকালের যাত্রা সম্পন্ন করার জন্য খাদ্যের মতো অন্যান্য বিধানের প্রয়োজন। তবে যে বিধানটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা হল তাকওয়া কারণ এটিই একমাত্র বিধান যা এই দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই কাউকে উপকৃত করবে। যদিও, খাদ্য, সম্পদ এবং বাসস্থানের মতো অন্যান্য সমস্ত প্রকারের বিধান শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই কারও উপকারে আসবে যদি না, এটি পরকালের জন্য নিবেদিত হয়, যেমন দান করা, তবে এটি আসলে তাকওয়ার একটি অংশ।

যেহেতু জড়জগৎ কোন ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান নয় তাই তাদের উচিত আলোচনার মূল হাদীসের উপর আমল করা এবং হয় অপরিচিত বা ভ্রমণকারীর মত জীবনযাপন করা ।

অপরিচিত হওয়ার প্রথম অবস্থা হল এমন কেউ যে তাদের হৃদয় ও মনকে তাদের অস্থায়ী বাড়িতে সংযুক্ত করে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করা যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী বাড়িতে অর্থাৎ পরকালে ফিরে যেতে পারে। এটি একজন কাজের ভিসায় বিদেশে বসবাসকারীর মতো। তাদের কাজের জায়গা তাদের বাড়ি নয়; শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের একটি জায়গা যাতে তারা এটি নিয়ে তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। এই ব্যক্তি কখনই বিচিত্র দেশকে তাদের বাড়ি হিসাবে গণ্য করবে না। পরিবর্তে, তারা কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় করে এবং তাদের সম্পদ সঞ্চয় করার দিকে মনোনিবেশ করে যাতে তারা যতটা সম্ভব সম্পদ তাদের আসল এবং স্থায়ী বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে পারে। যদি এই ব্যক্তি তাদের সমস্ত বা সিংহভাগ সম্পদ বিদেশে ব্যয় করে এবং খালি হাতে স্বদেশে ফিরে আসে তবে তারা নিঃসন্দেহে তাদের আত্মীয়দের দ্বারা দোষী বলে বিবেচিত হবে। কারণ তারা কাজের ভিসায় অন্য দেশে বসবাসের তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে, একজন মুসলমানের উচিত আখেরাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার বিধান অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করা। তাদের অন্যদের সাথে বস্তুজগতের বিলাসিতা করার জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের অনন্ত পরকালের বিধান অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মনোনিবেশ করতে হবে। যদি তারা তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য খুব বেশি প্রচেষ্টা করে তবে তারা অপ্রস্তুত এবং খালি হাতে পরকালে প্রবেশ করবে এবং তাই তারা তাদের মিশনে ব্যর্থ হবে যা মহান আল্লাহ তাদের অর্পণ করেছেন। একজন মুসলমানের নিজের সাথে সৎ হওয়া উচিত এবং প্রতিফলিত করা উচিত দিনের কত ঘন্টা তারা বস্তুগত জগতের জন্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই আত্ম-প্রতিফলন তাদেরকে দেখাবে যে তাদের সঠিক মানসিকতা আছে কি না এবং পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাস কতটা দৃঢ়। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

*“কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"*

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবজাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যখন তারা সবচেয়ে নিচু মানুষ ছিল এবং তাদের অধিকাংশই পাপপূর্ণ জীবনযাপন করছিল যার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সুস্পষ্ট দলীল সহ সত্যের পথে আহবান করেছেন। এর মধ্যে অনেকেই তার স্পষ্ট বাণী গ্রহণ করে তাকে অনুসরণ করে। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইসলাম অনেক জাতিকে জয় করবে এবং মুসলমানরা প্রচুর সম্পদ অর্জন করবে। কিন্তু তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যেন তারা বস্তুগত জগতের বিলাসিতা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। এই সতর্কতার একটি উদাহরণ সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) সতর্ক করেছেন যে, বস্তুজগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসের জন্য প্রতিযোগিতা করা মানুষকে ধ্বংস করবে। তাই তিনি মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব ও চাহিদা পূরণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনে সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দেন এবং এর পরিবর্তে পরকালের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি সবকিছুই সত্য হয়েছে। যখন বিশ্ব মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় তখন তাদের অধিকাংশই প্রতিযোগিতা, সংগ্রহ, মজুদ ও বস্তুজগতের আধিক্য উপভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে, তারা পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া ছেড়ে দেয় যেভাবে তাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। মাত্র কয়েকজন তার উপদেশ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব পূরণের জন্য বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন ছিল তা গ্রহণ করেছিল এবং অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করেছিল। এই ছোট দলটি, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিরা আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আঁকড়ে ধরেছিল, কারণ তারা কার্যত তাঁর পরামর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের অমনোযোগী হয়ে বস্তুজগতের পিছনে ছুটতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা দেয়।

দ্বিতীয় যে মানসিকতাটি মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত, আলোচনার মূল হাদীসে বলা হয়েছে তা হল একজন মুসাফির । এই ব্যক্তি এই জড় জগতকে তাদের বাসস্থান হিসাবে দেখেন না এবং পরিবর্তে তাদের প্রকৃত গৃহের অর্থ, পরকালের দিকে যাত্রা করেন। এই মানসিকতা একজন ব্যাক প্যাকারের মতো যে বিভিন্ন শহরে ঘুমিয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাদের কখনই তাদের বাড়ি বলে মনে করে না। তারা তাদের সাথে নিয়ে যায় একমাত্র বিধান যা তারা অর্থ বহন করতে পারে, প্রয়োজনীয় জিনিস। এটি তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। একজন ব্যাক প্যাকার কখনই অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করবে না জেনে যে এই জিনিসগুলি কেবল তাদের জন্য একটি বোঝা হবে। তারা নিরাপদে তাদের যাত্রা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করতে ব্যর্থ হবে না। একইভাবে, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান শুধুমাত্র এই জড় জগত থেকে কাজ এবং কথাবার্তার ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করে, যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। তারা এমন সব কাজ ও কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4104 নম্বর অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 7-8-এ পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই মনোভাবটি গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিয়েছিলেন। :

*“নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাকে তার জন্য শোভাময় করেছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম। এবং অবশ্যই, আমরা তার উপর যা আছে তা একটি অনুর্বর ভূমিতে পরিণত করব।"*

একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে দিন এবং রাত কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত পর্যায় যা মানুষ ভ্রমণ করে, পর্যায়ক্রমে, পরকালে পৌঁছানো পর্যন্ত।

তাই তাদের উচিত প্রতিটি পর্যায়কে সৎ আমলের মাধ্যমে পরকালে প্রেরণের মাধ্যমে ব্যবহার করা। তাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে যাত্রা খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং তারা পরকালে পৌঁছাবে। এমনকি যদি যাত্রাটি দীর্ঘ দেখায় তবে এটি শেষ পর্যন্ত একটি মুহুর্তের মতো মনে হবে তাই এটি অপ্রস্তুত থাকাকালীন এটি শেষ হওয়ার আগে এটিকে বাধ্যতার মুহূর্ত করা উচিত। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

*"যেদিন তারা এটা দেখবে, সেদিন এমন হবে, যেন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"*

প্রতিটা নিঃশ্বাসে তারা দুনিয়াকে পেছনে ফেলে পরকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও, কেউ নড়াচড়া করছে বলে মনে হতে পারে না কিন্তু বাস্তবে, দিন এবং রাত তাদের পরিবহন হিসাবে কাজ করে যা তাদের দ্রুত, বিরতি ছাড়াই, পরবর্তী পৃথিবীতে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে যেহেতু তারা মহান আল্লাহর বান্দা, শীঘ্রই একটি দিন আসবে যখন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে। তারা ফিরে গেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের থামানো হবে। অতএব, তাদের এই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভাল কিছু প্রস্তুত করা উচিত। তাদের উচিত মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু যদি তারা গাফিলতি অব্যাহত রাখে এবং প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয় তবে ইতিমধ্যে যা ঘটেছে এবং যা অবশিষ্ট রয়েছে তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরামর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া যা আলোচনার মূল হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রথম অংশে এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একজন মুসলমানকে বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল থাকবে যতক্ষণ না তারা যেকোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে। এমনকি যদি কেউ বহু বছর বেঁচে থাকে তবুও জীবনকে এক ঝলকানিতে চলে গেছে বলে মনে হয়। আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মুসলমানদেরকে বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন যে তারা সন্ধ্যায় পৌঁছালে তারা সকালে বেঁচে থাকবে। পার্থিব দায়িত্ব পালন এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করার মূল কারণ এই মানসিকতা। যেখানে দীর্ঘ জীবনের আশা করা বিপরীত অর্থের মূল কারণ, এটি একজনকে সৎকর্ম সম্পাদন এবং পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্বিত করে এবং এটি তাদের সেখানে থাকার বিশ্বাস রেখে জড়জগতকে সংগ্রহ ও জমা করতে উত্সাহিত করে। অত্যন্ত দীর্ঘ হবে।

উপরন্তু, আবদুল্লাহ বিন উমর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মুসলমানদের অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যের ভাল ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত, বেশীরভাগ মানুষ সুস্বাস্থ্যের মূল্য হারিয়ে ফেলার পরেই উপলব্ধি করে, যা সহীহ বুখারী, ৬৪১২ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করার অর্থ হল একজন মুসলমানকে তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে আনুগত্যে ব্যবহার করা উচিত। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, সৎ কাজ করার মাধ্যমে এবং পাপ থেকে বিরত থাকা এমন সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তারা ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে তা আর করতে পারে না। যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করবে তাকে তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় সৎকর্মের পুরস্কার দেওয়া হবে, এমনকি যখন তারা অসুস্থতার সম্মুখীন হয় এবং সেগুলি আর করতে পারে না। সহীহ বুখারী, 2996 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবহার করে না সে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই সম্ভাব্য পুরস্কার হারাবে। আসলে তাদের কাছে আফসোস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের চূড়ান্ত অংশ হল, একজন ব্যক্তির উচিত মৃত্যুর আগে তাদের জীবনের সদ্ব্যবহার করা। এর মধ্যে রয়েছে এমন সব জিনিস ব্যবহার করা যা সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ধন-সম্পদ, এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা যেমন ভালো কাজ থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলা। মুসলমানদের জন্য তাদের সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ, তারা দায়িত্ব নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার আগে, যা স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সাথে সাথে ঘটে থাকে, যেমন বিবাহ। এবং তাদের আর্থিক দায়িত্ব বৃদ্ধির আগেই তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা।

জামে আত তিরমিযী, 2403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর সময় সমস্ত লোকের জন্য অনুশোচনা হবে। সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আফসোস করবে যে, মৃত্যুর আগে তারা বেশি ভালো কাজ করেনি। পাপী ব্যক্তি আফসোস করবে যে তারা তাদের মৃত্যুর আগে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়নি। এই বিশ্বে লোকেদের প্রায়ই দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ, ড্রাইভিং পরীক্ষা পুনরায় করা, কিন্তু একবার একজন ব্যক্তি মারা গেলে সেখানে কোনো কাজ নেই। আফসোস তাদের কিছুতেই সাহায্য করবে না। পরিবর্তে, এটি কেবল তাদের যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলবে। তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করার জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করতে হবে, তাদের মুহূর্ত শেষ হওয়ার আগেই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। আগামীকাল পর্যন্ত দেরি করার মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আগামীকাল আসে না। একজন মুসলমানের আজকের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং তাই, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজগুলি করা উচিত, যেমন আগামীকাল এই পৃথিবীতে আসতে পারে তবে তারা এটি দেখার জন্য জীবিত নাও থাকতে পারে।

# আবু দারদা (রাঃ)-২

মহান আল্লাহ যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন, তখন আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর বাগান দান করেন, যাতে ছয়শত খেজুর ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

*"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন? আর আল্লাহই রোধ করেন এবং প্রাচুর্য দান করেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে।"*

কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 194- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও একজনের কাছে যা আছে সবই মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা সৃষ্ট এবং দান করা হয়েছে, তথাপি আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যয় করতে উত্সাহিত করার জন্য, মহান আল্লাহ, এই ধরণের ব্যয়কে তাঁর কাছে ঋণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। একটি ঋণ সর্বদা সত্যবাদী দ্বারা পরিশোধ করা হয়, মহান আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ নেই। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই ব্যয় করতে হবে, অর্থ ব্যবহার করতে হবে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের আশীর্বাদ, এবং ক্ষতির ভয় নয়।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তির মনে রাখা উচিত যে বাস্তবে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদ তাদের ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল, উপহার হিসাবে নয়। এই ঋণ সঠিকভাবে পরিশোধ করা হয় যখন কেউ তার কাছে থাকা নেয়ামতগুলোকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। ঋণ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ফেরত দিতে হবে। স্বেচ্ছায় উভয় জগতে পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায় এবং অনিচ্ছায় উভয় জগতেই কষ্টের দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, জান্নাতে নেয়ামত মুমিনদেরকে উপহার হিসেবে দেওয়া হবে, ঋণ হিসেবে নয়। এই কারণেই তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের ব্যবহার করতে পারবে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে আয়াতটি তাদের জন্য গ্রহণযোগ্যতা এবং একটি সুন্দর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয় যারা ভাল আশীর্বাদ ব্যয় করে। অর্থ, কেউ হারাম লাভ বা ব্যবহার করা উচিত নয়। এর মধ্যে রয়েছে বেআইনি সম্পদ ব্যবহার, বেআইনি জিনিস ব্যবহার করা এবং বেআইনি খাবার খাওয়া। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে নির্দিষ্ট জিনিসগুলিকে ইসলাম হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে যেমন অ্যালকোহল শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিই হারাম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসগুলিও হারাম হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা হয়। যেমন, হালাল খাদ্য হারাম হয়ে যেতে পারে যদি তা হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয়। তাই, মুসলমানদের জন্য এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা শুধুমাত্র হালাল জিনিসের সাথে মোকাবিলা করে কারণ এটি কাউকে ধ্বংস করার জন্য হারামের একটি উপাদান লাগে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি হারাম ব্যবহার করবে তার সমস্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি তাদের দোয়া মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে কি তাদের কোনো ভালো কাজ কবুল হওয়ার আশা করা যায়? প্রকৃতপক্ষে এর উত্তর সহীহ বুখারি, 1410 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদীসে পাওয়া গেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহই কেবল হালালকে গ্রহণ

করেন। অতএব, অবৈধ সম্পদের সাথে পবিত্র তীর্থযাত্রা করার মতো যে কোনো কাজ যা হারামের ভিত্তি রয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 3118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন এই ধরনের ব্যক্তিকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

*" এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষের মাধ্যমে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]"*

# আবু দারদা (রাঃ)-3

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের আবির্ভাবের আগে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মুসলমান হওয়ার পর তিনি তার ধর্মীয় ভক্তির সাথে ব্যবসায় ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এর সাথে লড়াই করেছিলেন। তারপরে তিনি তার ব্যবসার চেয়ে তার ধর্মীয় ভক্তিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 317-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থ, তিনি এই জড় জগত লাভের চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে এবং তারা পাবে। সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত বিধান।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে বৈধ উপায়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদান করাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট

হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে যদিও তারা জিনিস থেকে স্বাধীন হয়। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। এর কারণ হল বস্তুজগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আবৃত করবে, অর্থাত্ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেয় , নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে, পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। কখনই সন্তুষ্ট হন না যা সংজ্ঞা দ্বারা তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা শুধুমাত্র উভয় জগতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

# আবু দারদা (রাঃ)- ৪

আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কিয়ামতের দিন তাঁর জবাবদিহিতাকে এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি মসজিদের দরজায় একটি দোকানের মালিক হতে চান না, যেখানে তিনি কখনও একটি জামাত নামাজ মিস করেননি, এমনকি যদি তিনি দাতব্য লাভ দূরে দান. ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 317- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে

আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

*"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"*

# আবু দারদা (রাঃ)-৫

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার একদল লোককে সতর্ক করেছিলেন যারা একজন পাপী ব্যক্তিকে অভিশাপ দিচ্ছিল। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা যেন সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ না দেয় এবং পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। যখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করল যে তিনি পাপ করার জন্য লোকটিকে ঘৃণা করেন কি না, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি পাপকে ঘৃণা করেন পাপীকে নয়, কারণ একজন পাপী সর্বদা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 445- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলমানের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা উত্তম তা কামনা করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায়ে সমর্থন করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."*

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালবাসা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার একটি দিক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল যে মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে ঘৃণা করা উচিত কারণ মানুষ মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। বরং একজন মুসলমানের উচিত সেই গুনাহকে অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় তা পরিহার করা এবং অন্যদেরকেও এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া, কারণ এই সদয় আচরণ তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কিছু অপছন্দ না করা, যেমন একটি কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজনের অপছন্দের প্রমাণ এই যে, তারা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে তখন তা কখনই

ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। অর্থ, কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনোই কোনো গুনাহের কারণ হবে না কারণ এটি প্রমাণ করে যে কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজেদের স্বার্থে।

## আবু দারদা (রাঃ)- ৬

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমান তাকওয়া ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে একটি পরমাণুর পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা একজন অবহেলার দ্বারা করা পাহাড়ের ইবাদতের চেয়েও বেশি সওয়াব। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 628- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 6833 নম্বরে পাওয়া একটি খোদায়ী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তার ন্যূনতম দশ গুণ সওয়াব হবে।

ইসলামী শিক্ষা জুড়ে নেক আমল করার জন্য বিভিন্ন পরিমাণ সওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে। কোন কোন শিক্ষা এই হাদীসের মত দশগুণ সওয়াবের পরামর্শ দেয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাতশত গুণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সওয়াব যা গণনা করা যায় না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 261:

*"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়; প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ করে দেন..."*

এই পরিবর্তিত পুরস্কার একজনের আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিক হবেন তিনি তত বেশি পুরস্কৃত হবেন। অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা যত বেশি নেক আমল করবে, তত বেশি পুরস্কৃত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি কোন বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা না করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, সে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং একটি বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা করে।

# আবু দারদা (রাঃ)-৭

আবু দারদার স্ত্রী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি দিনের বেশিরভাগ সময় ধ্যান এবং পাঠ মনোযোগ দিয়ে কাটাতেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 639- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের নিজেদের পার্থিব বিষয়ে খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটছে এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী কারণ এটি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা ফলস্বরূপ একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন তখন তাদের কেবলমাত্র প্রার্থনা করা হলেও, তাদের যে কোন উপায়ে তাদের সাহায্য করা উচিত নয়, তবে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি চিন্তা করা উচিত এবং বুঝতে হবে যে তারাও শেষ পর্যন্ত তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারাবে। একটি অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যু দ্বারা। এটি তাদের তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাবে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি।

যখন তারা একজন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখেন তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য দুঃখ বোধ করা উচিত নয় বরং তারা বুঝতে পারে যে একদিন তাদের অজানা তারাও মারা যাবে। তাদের বোঝা উচিত যে ধনী ব্যক্তিকে যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার তাদের কবরে পরিত্যাগ

করা হয়েছিল, তারাও তাদের কবরে কেবল তাদের কৃতকর্ম নিয়েই থাকবে। এটি তাদের কবর ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব একজন পর্যবেক্ষণ করে এমন সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত। একজন মুসলমানের উচিত তাদের চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

*"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""*

যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং যারা তাদের পার্থিব জীবনে খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা উদাসীন থাকবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

## আবু দারদা (রাঃ)-৮

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর কন্যাকে একজন ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি এই কাজটি করেছিলেন কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তার মেয়ে এই পৃথিবীর অতিরিক্ত এবং বিলাসিতা হারিয়ে ফেলবে যা নিঃসন্দেহে তার বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 510 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা আশ্চর্যজনক যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা কীভাবে এর বিপরীত মানসিকতা গ্রহণ করেছে। এবং প্রায়শই ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অনুসন্ধান করে। তারা প্রায়শই তাদের বিশ্বাসের শক্তি সম্পর্কে কম উদ্বিগ্ন থাকে এবং এই কারণে পরিবারের সাথে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয় যা সহীহ মুসলিম, 3635 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও, একটি পরিবারকে এমন পরিবারে বিয়ে করা উচিত নয় যা আর্থিকভাবে তাদের আত্মীয়কে সমর্থন করতে পারে না কিন্তু একই সময়ে তাদের তাদের আত্মীয়ের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খোঁজার জন্য তাদের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করা উচিত নয়।

এই ঘটনাটি সমস্ত পরিস্থিতিতে এবং পরিস্থিতিতে বিশ্বাস বিবেচনা করে সর্বদা অন্যের জন্য ভাল চাওয়ার গুরুত্ব দেখায়। অর্থ, একজনকে কেবল তখনই এমন পরিস্থিতিতে আসা উচিত যখন তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এর মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হবে বা অন্তত এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যদি তারা সন্দেহ করে যে এটি ঘটতে পারে তবে তাদের সর্বদা এটিকে এড়ানো উচিত কারণ সমস্ত পার্থিব জিনিস আসে এবং যায় তবে একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের শক্তি এমন

জিনিস যা পরকালে তাদের চূড়ান্ত এবং স্থায়ী গন্তব্য নির্ধারণ করবে তাই এটি সর্বদা রক্ষা করা উচিত।

# আবু দারদা (রাঃ)- ৯

সাইপ্রাসে অভিযান ও বিজয়ের সময়, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধবন্দীদের দেখেছিলেন এবং কাঁদতেন। যখন তাকে তার কান্নাকাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে এই লোকদের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ ছিল কিন্তু যখন তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করতে থাকে তখন তারা অপমানিত ও অপদস্থ হয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী , ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 280-281- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ অথচ গভীর পাঠ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা কখনো ইহকাল বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফল হতে পারবে না। কালের ঊষালগ্ন থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ সময় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কখনোই হবে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অতএব, যখন একজন মুসলমান এমন একটি পরিস্থিতিতে থাকে যা থেকে তারা একটি ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায় তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহকে অমান্য করা বেছে নেওয়া উচিত নয়, তা যতই প্রলুব্ধ বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি একজনকে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনই মহান আল্লাহ ও তাঁর শাস্তি থেকে তাদের এই দুনিয়া বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। একইভাবে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাফল্য দান করেন তিনি তাঁর অবাধ্যদের থেকে একটি সফল পরিণতি সরিয়ে দেন যদিও এই অপসারণটি সাক্ষী হতে সময় লাগে। একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্র বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে, এই শাস্তি বিলম্বিত হলেও একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবলমাত্র কর্মকারীকে বেষ্টন করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

*"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ব্যতীত ঘিরে রাখে না..."*

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন মুসলমানদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এই সাফল্য অবিলম্বে স্পষ্ট না হলেও উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

# আবু দারদা (রাঃ)- ১০

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে, মহান আল্লাহর কাজ নিয়ে এক ঘণ্টা চিন্তা করা সারা রাত স্বেচ্ছায় নামাজে দাঁড়ানোর চেয়েও বড়। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৪৮১ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নভোমন্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার একটি কারণ হল যে এটি বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। বিচার দিবসের প্রতি তার বিশ্বাস যত বেশি শক্তিশালী হবে তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হবে, যা কারো জন্য স্বেচ্ছাসেবী উপাসনার চেয়ে বেশি উপকারী।

যৌক্তিকভাবে বলতে গেলে, বিচারের দিন এমন কিছু যা ঘটতে হবে। কেউ যদি মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে তবে তারা ভারসাম্যের অনেক উদাহরণ লক্ষ্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি নিখুঁত এবং সুষম দূরত্বে রয়েছে। পৃথিবী সূর্যের একটু কাছে বা আরও দূরে থাকলে তা বসবাসের অযোগ্য হতো না। একইভাবে, জলচক্র, যা সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবনকে জড়িত করে যা পরে বৃষ্টিপাতের জন্য ঘনীভূত হয়, পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ যাতে সৃষ্টি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে। ভূমিটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল যাতে বীজের দুর্বল শাখা এবং অঙ্কুরগুলি এটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে যাতে সৃষ্টির জন্য শস্য সরবরাহ করা যায় তবে একই মাটি তার উপরে নির্মিত ভারী ভবনগুলি প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট শক্ত। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কেবল একজন স্রষ্টাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে না বরং ভারসাম্যও নির্দেশ করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে একটি প্রধান জিনিস রয়েছে যা স্পষ্টতই ভারসাম্যহীন, তা হল মানবজাতির কর্ম। কেউ প্রায়শই নিপীড়ক এবং অত্যাচারী লোকদের লক্ষ্য করে যারা এই পৃথিবীতে শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

বিপরীতভাবে, এমন অগণিত লোক রয়েছে যারা অন্যদের দ্বারা নিপীড়িত হয় এবং অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয় তবুও তাদের ধৈর্যের জন্য তাদের সম্পূর্ণ পুরস্কার পায় না। অনেক মুসলমান যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং শুধুমাত্র একটি সামান্য অংশ পেয়ে থাকে যেখানে তারা প্রকাশ্যে আল্লাহকে অমান্য করে, তারা এই দুনিয়ার বিলাসিতা উপভোগ করে এবং কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। মহান আল্লাহ যেমন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কাজের পুরস্কার ও শাস্তিও ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু এটা স্পষ্টতই এই পৃথিবীতে ঘটে না তাই এটা অবশ্যই অন্য সময়ে ঘটতে হবে, অর্থাৎ প্রতিদানের দিন অর্থাৎ বিচার দিবসে।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে পুরস্কৃত ও শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে পূর্ণ শাস্তি না দেওয়ার পেছনে একটি হিকমত হল যে, মহান আল্লাহ তাদের সুযোগ করে দেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে। তিনি এই পৃথিবীতে মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত করেন না কারণ এই পৃথিবী জান্নাত নয়। উপরন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা, অর্থাৎ একজন মুসলমানের জন্য পরবর্তী পৃথিবীতে পূর্ণ সওয়াবের অপেক্ষা করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যে বিশ্বাসই বিশ্বাসকে বিশেষ করে তোলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এমন কিছুতে বিশ্বাস করা, যেমন এই পৃথিবীতে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করা বিশেষ কিছু হবে না।

পূর্ণ শাস্তির ভয় এবং পরকালে পূর্ণ পুরস্কার পাওয়ার আশা মানুষকে পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

প্রতিদানের দিন শুরু করার জন্য এই জড় জগতের অবসান ঘটাতে হবে। এর কারণ শাস্তি এবং পুরষ্কার কেবল তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন প্রত্যেকের

কাজ শেষ হয়ে যায়। কাজেই প্রতিফলের দিন সংঘটিত হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের আমল শেষ না হয়। এটি ইঙ্গিত করে যে জড় জগতের অবসান হতে হবে, শীঘ্র বা পরে।

উপরন্তু, যখন কেউ স্বর্গ ও পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করে এবং জীবন ও মৃত্যুর অগণিত চক্র যেমন দিন ও রাতের আগমন এবং যাওয়া, ঋতু এবং ফসল ফলানোর জন্য জমিগুলি পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে তারাও একটি সমস্যায় পড়বে। মৃত্যু এবং জীবনের চক্র যথা, বিচার দিবসে পুনরুত্থান।

যখন কেউ এই আলোচনার প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে তা বিচার দিবসের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে মজবুত করবে যার ফলে তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং পবিত্র ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করবে। নবী মুহাম্মদ সা.

# আবু দারদা (রাঃ)- ১১

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন যে, যখন কেউ দুনিয়ার কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি দেয়, তখন তাদের চিন্তা করা উচিত যে কীভাবে এর শেষ হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৪৮২ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির যত শারীরিক বা সামাজিক শক্তি থাকুক না কেন একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি তাদের জীবনের সময় ঘটে যেখানে একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ তাদের সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন জেল এবং অবশেষে তারা পরকালেও তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে । এটা শুধু নেতা নয় সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

তাই একজন মুসলমানকে কখনই অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়, যেমন তাদের আত্মীয়। ইতিহাসের অত্যাচারী নেতাদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা এখনও তাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল, একটি দিন অবশ্যই এসেছিল যখন তাদের শক্তি তাদের উপকারে আসেনি এবং তারা তাদের খারাপ কাজের পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল। সামাজিক প্রভাব এবং শক্তি হল চঞ্চল জিনিস কারণ এগুলি দ্রুত ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে চলে যায়, দীর্ঘকাল কারও সাথে থাকে না। অতএব, এমন শক্তির অধিকারী একজন মুসলমানের উচিত নিজের এবং অন্যদের উপকারের মাধ্যমে এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। কিন্তু যদি তারা তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা করবে একটি শাস্তি সম্মুখীন যা থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

উপরন্তু, এটা গুরুত্বপূর্ণ কারও কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করা কারণ এটি তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। প্রতিটি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজ তাদের শিকারকে দিতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করতে হবে। এতে অনেক অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে, একজন মুসলমানের কখনই তাদের কাজের জন্য নিজেকে জবাবদিহি করতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যারা করবে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যারা নিজেরা বিচার করবে না তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে এবং অন্যদের ক্ষতি করতে থাকবে। না জেনে যে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিন্তু যখন তারা এই সত্যটি উপলব্ধি করবে তখন তাদের শাস্তি থেকে বাঁচতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

# আবু দারদা (রাঃ)- ১২

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই জড়জগতের প্রয়োজনের বাইরে ধনী নয় সে এর পিছনের বাস্তবতা বুঝতে পারেনি এবং সে কখনও এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে না। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 488 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে এবং তারা পাবে। সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত বিধান।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে বৈধ উপায়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদান করাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে যদিও তারা জিনিস থেকে স্বাধীন হয়। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। এর কারণ হল বস্তুজগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আবৃত করবে, অর্থাত্ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেয় , নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে, পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। কখনই সন্তুষ্ট হন না যা সংজ্ঞা দ্বারা তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা শুধুমাত্র উভয় জগতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

# আবু দারদা (রাঃ)- ১৩

আবু দারদা, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ন্যায়সঙ্গত এবং গঠনমূলক সমালোচনা স্বীকার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ নিরাপদ থাকবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 490 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের বিষয়ে অটল থাকা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু অধিকাংশ পার্থিব বিষয়ে একে বলা হয় একগুঁয়েমি, যা দোষারোপযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে বা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা জেদীভাবে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে এই বিশ্বাস করে যে তারা যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ তারা হেরেছে এবং অন্যরা যারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে তারা জিতেছে। এটা নিছক শিশুসুলভ।

প্রকৃতপক্ষে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকবে তবে পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, যতক্ষণ না এটি পাপ নয়,

তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় এটি আসলে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের জীবনে অন্যরা তাদের পরিবর্তন করতে চান, যেমন তাদের আত্মীয়রা। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হ'ল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের উচিত তার চেয়ে ভাল পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্কে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ ভালোর জন্য একজনের চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রকৃত শক্তি লাগে।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায় যা তাদের জীবন থেকে শান্তি সরিয়ে দেবে। এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে তারা সবসময় শান্তির এক স্টেশন থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে তবে অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলে তারা পরিবর্তন করেছে তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

উপসংহারে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পাপ সংঘটিত হয় না একজন ব্যক্তির উচিত

মানিয়ে নিতে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি পায়।

# আবু দারদা (রাঃ)- ১৪

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত উপলব্ধির অন্যতম চিহ্ন হল সরল জীবন অবলম্বন করে নিজের প্রতি করুণা করা। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 494 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদি একজন ব্যক্তিকে একটি দেশ অতিক্রম করতে হয় এবং তাকে বেছে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পথ উপস্থাপন করা হয় যেমন, একটি বিপজ্জনক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বা একটি পাহাড়ের উপর দিয়ে বা ভূগর্ভস্থ গুহার মধ্য দিয়ে একটি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই সবচেয়ে সহজ এবং সহজ পথটি বেছে নেবেন। এটি তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তি অর্জনের সাথে সাথে নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর অনুমতি দেবে। কেবলমাত্র একজন বোকাই একটি কঠিন এবং বিপজ্জনক পথ বেছে নেবে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে বোঝা হবে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই দুনিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করছে এবং তাদের গন্তব্য আখেরাত। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলমানের উচিত আখেরাতের নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য এই দুনিয়ার মধ্য দিয়ে সহজ ও সোজা পথ বেছে নেওয়া। এই পথের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা এবং শুধুমাত্র পূরণের জন্য এই জড়জগত থেকে গ্রহণ করা। তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই। এটি তাদের মনের এবং শরীরের শান্তি পাওয়ার সাথে সাথে নিরাপদে পরকালে

পৌঁছাতে সহায়তা করবে। কিন্তু মানুষ যত বেশি এই জড় জগতের আধিক্যে লিপ্ত হবে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে মানুষ ও তাদের আকাঙ্ক্ষার জন্য নিবেদিত করবে তার যাত্রা তত কঠিন হবে। এই মনোভাব তাদের মানসিক ও শরীরের শান্তি থেকে বঞ্চিত করবে এবং তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জীবন একটি যাত্রা তাই তাদের উচিত নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া এবং পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য সহজ এবং সহজ পথ বেছে নেওয়া যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক ও দেহের শান্তি পাওয়া যায়।

# আবু দারদা (রাঃ)- 15

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে যে ব্যক্তি অন্যের বিষয়ে মাথা ঘামায় সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তারা বিরক্তি, হতাশা এবং ক্রোধ কাটিয়ে উঠতে পারবে না। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৪৯৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদের উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদেরকে ভালোর দিকে উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা মুসলমানদের কর্তব্য কিন্তু একজন মুসলমানের এমন আচরণ করা উচিত নয় যেন তারা অন্যদের ওপর নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই মনোভাব শুধুমাত্র রাগ এবং তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন অন্যরা তাদের পরামর্শ অনুসরণ করে না। অন্যদের উপদেশ দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করা মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম কিন্তু তাদের পরামর্শের অর্থের অর্থের উপর চাপ দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, ব্যক্তিটি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে কি না। মহান আল্লাহ যদি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উপদেশ দেন, তাহলে পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় ফলাফলের ওপর জোর না দেওয়ার জন্য একজন মুসলমান কীভাবে দাবি করতে পারে বা আচরণ করতে পারে? তারা অন্যদের দায়িত্বে রাখা হয়েছে. অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

*"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দিন, [হে মুহাম্মদ]; আপনি শুধুমাত্র একটি অনুস্মারক. আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"*

যে মুসলিম একজন নিয়ন্ত্রক হিসাবে আচরণ করে তারা কেবল তখনই তিক্ত হবে না যখন লোকেরা তাদের পরামর্শ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে এটি তাদের অন্যদের উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিতে পারে যা তাদের সামর্থ্য অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য।

উপরন্তু, এই মনোভাব মুসলমানদের নিজেদের এবং তাদের নিজেদের কর্তব্যকে অবহেলা করার কারণ হবে কারণ তারা অন্যের দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের সম্পর্কে খুব বেশি ব্যস্ত। অতএব, মুসলমানদের উচিত ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধে অটল থাকা কিন্তু তাদের উপদেশের ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাথা ঘামানো থেকে বিরত থাকা।

# আবু দারদা (রাঃ)- ১৬

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার আল্লাহর উপাসনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 498 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে 99 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহসানের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, যার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে অনুবাদ করা যেতে পারে। এই শ্রেষ্ঠত্ব বলতে বোঝায় আল্লাহ, মহান ও সৃষ্টির প্রতি একজনের আচরণ ও আচরণ। পবিত্র কুরআন জুড়ে শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 26:

*" যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য সর্বোত্তম [পুরস্কার] - এবং অতিরিক্ত ..."*

সহীহ মুসলিমের ৪৪৯ ও ৪৫০ নম্বর হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। এই আয়াতে অতিরিক্ত শব্দটি বোঝায় কখন জান্নাতবাসীরা আল্লাহর ঐশ্বরিক দর্শন লাভ করবে। , মহিমান্বিত। এই পুরষ্কার সেই মুসলমানের জন্য উপযোগী যারা শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করে। যেমন শ্রেষ্ঠত্ব মানে একজনের জীবন পরিচালনা করা যেন তারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দিতে পারে, সর্বদা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। যে ব্যক্তি একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারে সে কখনই তাদের ভয়ে খারাপ আচরণ করবে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা সর্বদা এমন আচরণ করে

যেন তারা প্রতিনিয়ত একজন ধার্মিক ব্যক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয় যা তারা সম্মান করে। ইমাম তাবারানির আল মুজাম আল কাবীর , 5539 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে কাজ করে সে খুব কমই পাপ করবে এবং সর্বদা ভাল কাজের দিকে ধাবিত হবে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং দুনিয়াতে পরীক্ষার আগুন এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই সতর্কতা নিশ্চিত করবে যে কেউ কেবল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে না, বরং এটি তাদের সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করবে। যার শিখর হল আন্তরিকভাবে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এই ব্যক্তি জামি আত তিরমিযী, 251 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি পূরণ করবে, যা উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে।

শ্রেষ্ঠত্বের এই স্তরটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সঠিক নিয়তে কাজ করে, যা সহীহ বুখারিতে পাওয়া হাদিস অনুসারে বিশ্বাসের ভিত্তি, নম্বর 1। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে এবং সঠিক নিয়তে ভাল আচরণ প্রদর্শন করে তার জন্য সাফল্য নিশ্চিত করা হয়, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। একজন ব্যক্তি যত বেশি ভালো কাজ করবে তার ঈমান ততই মজবুত হবে যতক্ষণ না তারা এমন একজন মুসলিম হয়ে ওঠে যারা গাফিলতি থেকে দূরে থাকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরকাল ও পার্থিব জীবনকে সুন্দর করার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে থাকে।

আশংকা করা হয় যে, যারা মহান আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে এই পুরস্কারের বিপরীতে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহ তায়ালার

সর্বব্যাপী দৃষ্টিকে ভয় না করে জীবনযাপন করেছে, তারা আখেরাতে তাকে দেখতে পাবে না। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 15:

*"না! নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সেদিন তারা বিভক্ত হবে।"*

যারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কাজ করার পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় তাদের অবশ্যই শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদীসে প্রদত্ত উপদেশের দ্বিতীয় অংশের উপর আমল করতে হবে। এই ব্যক্তির আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন। যদিও এই অবস্থা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের, যে ব্যক্তি এমনভাবে কাজ করে যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে, কোন অংশে কম নয়, এটি মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভয়কে অবলম্বন করার একটি দুর্দান্ত উপায়। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে এই মনোভাব একজনকে পাপ থেকে বিরত রাখবে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে। ইমাম তাবারানীর আল মুজাম আল কাবীর, ৭৯৩৫ নং নং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি এই মানসিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করবে, বিচারের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন। উচ্চাভিলাষী।

মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক উপস্থিতি পবিত্র কুরআন জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 4:

*কেন তিনি আপনার সাথে আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে মহান আল্লাহর ঐশী উপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার সাথে আছেন যে তাকে স্মরণ করে। এই কারণেই হিলিয়াত আল আউলিয়া, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 84 এবং 85-এ বিশ্বস্ত সেনাপতি আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে ছিলেন। জড় জগতের এবং শুধুমাত্র একাকী রাতে সান্ত্বনা পাওয়া. অর্থ, তিনি মানুষের সাহচর্যের চেয়ে মহান আল্লাহর সাহচর্য চেয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করা শুধুমাত্র পাপ প্রতিরোধ করে না এবং ভাল কাজের উত্সাহ দেয় তবে এটি একাকীত্ব এবং হতাশাকেও প্রতিরোধ করে। একজন ব্যক্তি খুব কমই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয় যখন তারা ক্রমাগত এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যে তাকে ভালবাসে এবং তাদের সাহায্য করে। মহান আল্লাহর চেয়ে সৃষ্টিকে কেউ বেশি ভালোবাসে না এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনিই সকল সাহায্যের উৎস। অতএব, শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করা একজনের বিশ্বাস, কর্ম, মানসিক অবস্থা এবং বৃহত্তর সমাজকে উপকৃত করে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যারা মহান আল্লাহকে তাদের পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে তুচ্ছ মনে করে। এটি একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি সকল প্রকার পাপ এবং খারাপ আচরণের দিকে নিয়ে যায়।

# আবু দারদা (রাঃ)- ১৭

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে একজনের জন্য যথেষ্ট কিছু থাকাটা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিক্ষিপ্ত বরাদ্দের চেয়ে উত্তম। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 498 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক লোক এই জড় জগতে আরও বেশি কিছু অর্জন করার চেষ্টা করে যদিও তারা ইতিমধ্যে অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে। যদিও, ইসলাম এই ধরণের মানসিকতাকে নিষিদ্ধ করে না যতক্ষণ না হারাম জিনিসগুলি এড়ানো হয় একজন মুসলমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা বোঝা উচিত। এটা স্পষ্ট যে, অনেক পার্থিব সম্পদ, যেমন ধন-সম্পদের দ্বারা মানসিক শান্তি পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এই লোকেরা প্রায়শই হতাশ হয়ে পড়ে এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে কেউ যা অর্জন করুক না কেন তারা তার বিশ্বাস এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সর্বদা আরও কামনা করে। যেমন, হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে থাকা ফেরাউন কল্পনাতীত সকল পার্থিব নিয়ামত লাভ করলেও তিনি তখনও মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি পাননি। এর পরিবর্তে তার আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা তাকে এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে যে সে ঈশ্বরের মতো পূজা করতে চেয়েছিল। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 24:

*"এবং বললেন, "আমিই তোমার শ্রেষ্ঠ প্রভু।"*

একজন ব্যক্তি যা ইচ্ছা পূরণ করুক না কেন এটি কেবল তাদের আরও কিছু কামনা করার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি দুটি বাড়ির মালিক সে তিনটি চায়; কোটিপতি কোটিপতি হতে চায়। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, 6439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যার কাছে সোনার একটি উপত্যকা রয়েছে সে কেবল অন্যটি কামনা করবে। একজন মুসলমান যে প্রকৃত মনের শান্তি চায়, যা পৃথিবীর ধন-সম্পদের চেয়েও মূল্যবান, তাই তাদের পার্থিব ইচ্ছা সীমিত। তারা যত বেশি তাদের সীমাবদ্ধ করবে এবং কেবল তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করবে তত বেশি তারা মানসিক শান্তি পাবে। এই মানসিকতা ব্যস্ততার দরজা বন্ধ করে দেয় এবং আরও জাগতিক জিনিসের জন্য প্রচেষ্টা করে যা ফলস্বরূপ মন এবং শরীর উভয়কে বিশ্রাম দেয়। যদি একজন মুসলিম এটিকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাধনা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, তাহলে তারা প্রকৃত মানসিক শান্তি পাবে যা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত। উভয় জগত কিন্তু তাদের যত বেশি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা থাকবে তত বেশি তাদের মন এবং শরীর তাদের সাথে ব্যস্ত থাকবে এবং এইভাবে তারা সত্যিকারের মানসিক শান্তি থেকে দূরে থাকবে।

# আবু দারদা (রাঃ)- ১৮

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে, সফলতা ধন-সম্পদ বা পরিবারের আকার দিয়ে পরিমাপ করা হয় না, বরং তা পরিমাপ করা হয় একজনের দৃঢ়তা, জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 494 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে )

মহানতা এবং সত্যিকারের সাফল্য পার্থিব জিনিসের সাথে যুক্ত নয়, যেমন সম্পদ বা খ্যাতি। একজন ব্যক্তি এসবের মাধ্যমে কিছু পার্থিব সাফল্য লাভ করতে পারে কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা খুবই স্পষ্ট যে এই ধরনের সাফল্য খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং তা শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তির জন্য বোঝা ও অনুশোচনায় পরিণত হয়। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে এই জিনিসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত থাকে যার ফলে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য অবহেলা করে সেগুলি পাওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। বা তাদের অন্যদেরকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় যারা এই জাগতিক জিনিসের অধিকারী নয় এই বিশ্বাস করে যে তাদের কোন মূল্য বা তাৎপর্য নেই কারণ এই মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 6071 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, জান্নাতী তারাই যারা সমাজের কাছে নগণ্য বলে বিবেচিত হয় এবং এই উপসংহারে পৌঁছে যে তারা যদি শপথ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ তাদের জন্য তা পূরণ করবেন।

ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত সম্মান , সফলতা ও মহানুভবতা একমাত্র তাকওয়ার মধ্যেই নিহিত। তাই মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে যত আন্তরিকভাবে চেষ্টা

করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তারা আবির্ভূত হলেও তত বেশি হয়। সমাজের কাছে নগণ্য। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত এতে সত্যিকারের সফলতা অন্বেষণ করা এবং পার্থিব জিনিসের সন্ধানে তাদের সময় ও প্রচেষ্টা নষ্ট না করা, অন্যথায় তারা আখেরাতে বড় ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

*"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের [তাদের] কর্মের ব্যাপারে অবহিত করব? [তারা] তারাই যাদের পার্থিব জীবনে পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"*

# আবু দারদা (রাঃ)-১৯

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, তাকওয়ার শিখর হল যখন বান্দা মহান আল্লাহকে ভয় দেখায় এবং বান্দা যখন পাপের পরিণতির ভয় পায়। এটি তখনই হয় যখন কেউ খোদায়ী আইনের লঙঘনের বিরুদ্ধে নিজেকে ধার্মিকতার সাথে রক্ষা করে, এমনকি এটি হারামের ভয়ে হালাল জিনিস গ্রহণ থেকে বিরত থাকার পর্যায়ে নিয়ে যায়। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 500 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর।

তাকওয়া বলতে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি অন্যদের সাথে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত করে যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

ধার্মিকতার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক শুধু হারাম নয়। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের এক

ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর যেটা বেআইনীর কাছাকাছি, তার মধ্যে পড়া তত সহজ। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করে এবং শুধুমাত্র হালাল জিনিস ব্যবহার করে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে।

সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা এক আকস্মিক পদক্ষেপে নয় ধীরে ধীরে ঘটেছে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার অর্থ, যে কথার কোনো উপকার হয় না বা পাপও হয় না, তা প্রায়শই গীবত, মিথ্যা ও অপবাদের মতো খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক বক্তৃতা না করে প্রথম পদক্ষেপটি এড়িয়ে যায় তবে সে মন্দ কথা এড়িয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত পূর্বে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা, যার একটি শাখা হল নিরর্থক ও সন্দেহজনক বিষয়গুলিকে এড়িয়ে চলার ভয়ে যে তারা হারামের দিকে নিয়ে যাবে।

# আবু দারদা (রাঃ)- ২০

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, যে ভালো জিনিস শেখায় এবং যে শিখে সে সমান সওয়াব পায় এবং এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও মানবতার ক্ষতি হয়। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৫০১ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, এই জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত, যা এর সাথে সম্পর্কিত, জ্ঞানী। ব্যক্তি এবং জ্ঞানের ছাত্র।

মহান আল্লাহর স্মরণ স্মরণের সকল স্তরকে পরিবেষ্টন করে। যথা, অভ্যন্তরীণ নীরব স্মরণ, যার মধ্যে রয়েছে নিজের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। জিহ্বার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কার্যত মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

যা কিছু মহান আল্লাহর স্মরণের দিকে নিয়ে যায়, তার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য, যেমন বস্তুজগতে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি ছাড়াই। বা বাড়াবাড়ি। প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্যে এমন কোনো কাজ অন্তর্ভুক্ত যা জাগতিক

বা ধর্মীয় বলে মনে হয় যতক্ষণ না এর মধ্যে মহান আল্লাহর আনুগত্য জড়িত থাকে।

জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানের ছাত্র উভয়ই বাস্তবে একমাত্র ব্যক্তি যারা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মান্য করবে কারণ জ্ঞান ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি মহান আল্লাহকে অমান্য করে, এমনকি তা উপলব্ধি না করেই, কারণ তারা জানে না যে কোনটি পাপ বা নেক কাজ বলে গণ্য হয়। কিছু ক্ষেত্রে, কেউ এমনও বিশ্বাস করতে পারে যে তারা কঠোরভাবে তাঁর আনুগত্য করছে যদিও তারা এটি থেকে দূরে রয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, বাস্তবে বস্তুজগতে আসলে কিছুই অভিশপ্ত নয়। এটা কিভাবে একটি জিনিস ব্যবহার করা হয় যা নির্ধারণ করে যে এটি অভিশপ্ত কিনা। যেমন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা হলে তা উভয় জগতেই এক বিরাট নিয়ামত। কিন্তু যদি এর অপব্যবহার হয় বা মজুত করা হয় তাহলে তা উভয় জগতের মালিকের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটি এই বিশ্বের সমস্ত জিনিসের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

# আবু দারদা (রাঃ)- ২১

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে তিনি যখন বিচারের দিন চিন্তা করেছিলেন, তখন তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি তাকে দেওয়া জ্ঞান নিয়ে কী করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৫০৬ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তার পা নড়বে না।

এই প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হল তাদের জ্ঞান এবং তারা এটি দিয়ে কী করেছে। মুসলমানদের জন্য দরকারী পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এবং মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য তার উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। যে অজ্ঞ থাকে বা তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয় তার উভয় জগতেই সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা নেই। একজন ব্যক্তি তখনই তাদের কাঙ্খিত স্থানে পৌঁছাবে যখন তারা প্রথমে সঠিক পথটি খুঁজে পাবে এবং তারপরে নেমে যাবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি সঠিক পথের অর্থ খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়, জ্ঞান অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, বা তার অর্থে যাত্রা করতে, তাদের জ্ঞানের ওপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না, অর্থাৎ পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য।

# আবু দারদা (রাঃ)- 22

আবু দারদা, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার মানুষকে তাদের স্বাস্থ্যের সুবিধা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৫০৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দুটি নিয়ামত রয়েছে যা মানুষ প্রায়শই মূল্যায়ন করে না যতক্ষণ না তারা সেগুলি হারায়, তা হল সুস্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।

সুস্বাস্থ্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে দুনিয়া ও ধর্মের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আশীর্বাদ লাভের সুবিধা নিতে দেয়। ছোটখাটো অসুখের পিছনে একটি প্রজ্ঞা হল যে তারা একজন মুসলিমকে সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হল যখন কেউ তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে, এক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যের জন্য, ইসলামের নির্দেশিত সঠিক উপায়ে। যারা অসুস্থতার কারণে বা বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছে তাদের লক্ষ্য করা উচিত এবং তাই তারা যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তা ব্যবহার করে বৈধ পার্থিব বিষয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়েও সফলতা লাভের চেষ্টা করে এবং জড় জগতের চেয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি সময় আসার আগে যখন তারা এটি করতে চায় কিন্তু শারীরিক শক্তি রাখে না তখন জামাতের সাথে তাদের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাত্রা করার জন্য তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করা উচিত। তাদের সুস্বাস্থ্য হারানোর আগে বিশেষ করে শীতের ছোট দিনে স্বেচ্ছায় রোজা রাখা উচিত। একজনের স্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে তারা অবশেষে যখন এটি হারাবে, মহান আল্লাহ তাদের সেই পুরস্কার প্রদান

করতে থাকবেন যা তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় ভাল কাজ করার সময় পেতেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা গাফিলতিতে থাকে তারা তাদের ভাল স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় এবং তাই তাদের ভাল স্বাস্থ্যের সময় বা অসুস্থ হলে কোন পুরস্কার পায় না।

ভাল স্বাস্থ্যের জন্য প্রশংসা করার এবং সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা দেখানোর একটি দিক হল যারা তাদের সুস্বাস্থ্য হারিয়েছে তাদের যেকোন উপায়ে সাহায্য করা যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্য। নিয়মিত অসুস্থদের নিয়ে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে।

পরিশেষে, যারা তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের অসুস্থতার সময় মহান আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন। যদিও, যারা এই সমর্থন পাবেন না তারা অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার সময় অধৈর্য হয়ে পড়বেন। এই নেতিবাচক মনোভাব কেবল তাদের জন্য আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যাবে।

## আবু দারদা (রাঃ)- 23

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মানুষকে এতিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাদের কাছে নিয়ে আসা উচিত এবং তাদের নিজেদের খাবার থেকে খাওয়ানো উচিত। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৫০৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই দিন এবং যুগে এতিমদের সাহায্য করা খুবই সহজ কারণ কেউ তাদের সান্নিধ্যে না গিয়ে দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে আর্থিকভাবে সাহায্য করে তাদের সমর্থন করতে পারে। একজন মুসলমানের জানা উচিত যে, সহীহ বুখারি, 5304 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এতিমের দেখাশোনা করবে সে মহানবী (সা.) এর সান্নিধ্যে থাকবে। জান্নাতে শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এই হাদিসটিই একজন মুসলিমের পক্ষে এতিমদের সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট কারণ হওয়া উচিত কারণ এর খরচ খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ লোকেরা তাদের মাসিক ফোন বিলে বেশি অর্থ ব্যয় করে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অন্তত একজন এতিমকে পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং অন্যকেও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এর মধ্যে শুধু আর্থিক সাহায্য নয় অন্যদের সাহায্য করার সব ধরনের অন্তর্ভুক্ত। অন্যের যেকোনো ধরনের বৈধ প্রয়োজন নিজের শক্তি অনুযায়ী পূরণ করা উচিত এবং যদি কোনো মুসলমান দেখতে পায় যে তারা এই সাহায্য প্রদান করতে পারে না, তাহলে তাদের উচিত একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে নির্দেশ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্যকারীর মতো একই পুরস্কার পাবে। জামি আত তিরমিযী, 2671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মুসলমানদেরকে অবশ্যই অন্যদেরকে এমনভাবে সাহায্য করতে হবে যাতে তাদের উপকার হয় শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান কামনা না করে কারণ এটি শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিলের দিকে পরিচালিত করে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."*

সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমান যদি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের প্রয়োজনের সময় অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা অন্যদের সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা তাদের প্রয়োজনের সময় আটকা পড়ে যেতে পারে।

মুসলমানরা যদি মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়, যাতে তারা আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাদের অবশ্যই ইসলামের নির্দেশ অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

এর একটি দিক হল ভালো উপদেশের মতো যা কিছু আছে তা দিয়ে অভাবীদের সাহায্য করা।

একজনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা উচিত যা তাদের গর্বিত হতে বাধা দেবে। যথা, তারা অভাবীকে যে সাহায্য দেয় তা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাই মহান আল্লাহর মালিকানাধীন, এবং তাই তাদের অবশ্যই প্রকৃত মালিকের ইচ্ছানুযায়ী গরীবদের সাহায্য করার মাধ্যমে এটি ব্যবহার করতে হবে। বাস্তবে, দরিদ্ররা তাদের সাহায্যকারীকে একটি উপকার করছে কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। প্রয়োজনে কেউ না থাকলে মানুষ অনেক পুরস্কার লাভের এই পদ্ধতিটি হারিয়ে ফেলত।

# আবু দারদা (রাঃ)- 24

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে তার বন্ধুকে মৃত্যুর আগে স্বেচ্ছায় রোজা রাখতে উৎসাহিত করে। অথচ, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং সবচেয়ে খারাপ সেই ব্যক্তি যে তার বন্ধুকে মৃত্যুর আগে খেতে, পান করতে এবং মজা করতে উত্সাহিত করে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 524 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত হবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে. অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়ায় আক্রান্ত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের অনুপ্রাণিত করবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। অন্যদিকে, খারাপ

সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। এই মনোভাব বিচারের দিনে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে উঠবে যদিও তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা বৈধ কিন্তু তাদের প্রয়োজনের বাইরে।

পরিশেষে, সহীহ বুখারী, 3688 নং হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সঙ্গ দিয়ে ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তবে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

*"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"*

# আবু দারদা (রাঃ)- ২৫

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যদি কেউ মানুষের প্রশংসা করে তবে তারা তাদের প্রশংসা করবে। কিন্তু কেউ যদি নিজের কাজে মন দেয় এবং জনগণের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা জনগণের দ্বারা সমালোচিত হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 528 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সাধারণত যখন কেউ এমন একটি পথ বেছে নেয় যা অন্যদের পথ থেকে ভিন্ন, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব, তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনা এবং প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সমালোচনা একজন ব্যক্তির আত্মীয়দের কাছ থেকে আসে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলমান ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করার জন্য আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যদি এটি এমন কিছু হয় যা তাদের পরিবার নিজেরাই অনুসরণ করে না তখন তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হবে। তারা বোকা এবং চরম বলে আখ্যা দেবে যারা তারা বিশ্বাস করেছিল যে তাদের পথে তাদের সমর্থন করবে। মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যে বৈধ পথ বেছে নেয় তার উপর অবিচল থাকা এবং মহান আল্লাহর সাহায্যের উপর আস্থা রাখে, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, এই অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার জন্য। .

এটি মানুষের কাছ থেকে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া কারণ যখন একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে জীবনের একটি ভিন্ন পথ বেছে নেয় তখন তাদের মনে হয় যে তার পথটি খারাপ বা মন্দ এবং এই কারণেই ব্যক্তিটি একটি ভিন্ন পথ বেছে

নিয়েছে। যদিও ব্যক্তি এটি বিশ্বাস করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি ভিন্ন পথ বেছে নেয় এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য ভাল তবুও তারা সমালোচনার সম্মুখীন হবে। একই কারণে সমস্ত নবী (সাঃ) তাদের লোকদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল কারণ তারা বেছে নিয়েছিলেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যদেরকে একটি ভিন্ন ভাল পথের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

উপসংহারে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের জীবনে চলার পথ বৈধ হয় ততক্ষণ তাদের অবিচল থাকা উচিত এবং অন্যের সমালোচনায় বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাদের অবস্থা ও চরিত্রের উন্নতির চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের বৈধ পছন্দ অনুসরণ করতে তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

# আবু দারদা (রাঃ)- ২৬

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যদি কেউ কাউকে অপমান করে বা তাদের সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্য রাখে তবে তাদের উচিত তাদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং প্রতিশোধ নেওয়া না। তাদের উচিৎ আল্লাহকে মুক্ত করা এবং তাদের রক্ষা করা। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 548 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

*“আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"*

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয় , বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."*

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

# আবু দারদা (রাঃ)- ২৭

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে মিথ্যা বলে তার জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। তারা যে ভক্তিই পালন করুক না কেন, তাদের বক্তৃতা বা তাদের প্রস্তাব সত্য বলে গণ্য হবে না। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 555 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে মিথ্যা বলা মুনাফিকির একটি দিক। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা যা প্রায়ই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয় বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই সব ধরনের মিথ্যা বলা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায় যেমন, গীবত করা এবং লোকদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমান ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে। তবুও, যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

## আবু দারদা (রাঃ)- ২৮

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, এক মুহূর্তের মধ্যে অনেক ইচ্ছা পূরণ হলে তা ব্যক্তির জন্য দীর্ঘ দুঃখের কারণ হয়। ইমাম বায়হাকির যুহদ আল কাবীর, 344- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 38 এর সাথে সংযুক্ত:

*"...এবং শয়তান তাদের কাজকে তাদের জন্য আনন্দদায়ক করে তুলেছিল এবং তাদের পথ থেকে বিরত রেখেছিল..."*

এই আয়াতে উল্লিখিত শয়তান তাদের জন্য ভুল পছন্দকে সুন্দর করে পাপ করার জন্য এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মানুষকে বোকা বানায়। এটি এমন পরিস্থিতিতে ঘটে যখন একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই দুই বা ততোধিক বিকল্পের মধ্যে একটি পছন্দ করতে হবে। এটি তখনও ঘটে যখন পছন্দটি বৈধ এবং অবৈধ এবং এমনকি দুটি বৈধ বিকল্পের মধ্যেও হয়। শয়তান যদি কাউকে পাপের দিকে পরিচালিত করতে না পারে তবে সে তাকে নিকৃষ্ট বিকল্পের দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, এমনকি এটি বৈধ হলেও, আশা করে যে এটি কোনও ধরণের পাপের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন একজন ব্যক্তি জীবন এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করে। শয়তান একটি পছন্দকে সুন্দর করে তোলে যার ফলে একজনকে তার আপাত সুবিধার উপর এমন মাত্রায় মনোযোগ দেয় যে তারা বড় ছবি এবং পছন্দের পরিণতির উপর মনোযোগ হারায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক তখন একটি শিশুর মতো আচরণ করে যে তাদের ক্রিয়াকলাপের

ফলাফলের প্রতিফলন ছাড়াই পছন্দ করে। মানুষের পাপ করার জন্য এটি একটি প্রধান কারণ। বাস্তবে, কেউ যদি সত্যিই পাপের শাস্তির প্রতি চিন্তা করে তবে তারা কখনই সেগুলি করবে না।

কিছু যা এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাহায্য করে তা হল মানসিকভাবে এক ধাপ পিছিয়ে যাওয়া এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা এবং ক্ষতির তুলনা করে বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা। শুধুমাত্র যখন কোন কিছুর বৈধ সুবিধা ক্ষতির চেয়ে বেশি হয় তখনই একজন ব্যক্তির এগিয়ে যাওয়া উচিত। অন্য জিনিস যা সাহায্য করে তা হল সম্ভাব্য বিকল্পগুলির পরিণতির উপর গভীরভাবে চিন্তা করা। কিছু পছন্দ বৈধ হতে পারে কিন্তু কেউ যদি সেগুলির সাথে এগিয়ে যায় তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে তাদের জীবনকে কঠিন করে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কখনও কখনও লোকেরা দৃশ্যত পছন্দ করে এমন কাউকে বিয়ে করতে ছুটে যায়। তারা তাদের সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র তাদের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে অন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির উপর প্রতিফলিত করার পরিবর্তে, উদাহরণস্বরূপ, তাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যত সঙ্গী যদি একজন ভাল জীবনসঙ্গী বা একজন ভাল পিতামাতা তৈরি করে এবং যদি তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যে তাদের সাহায্য করে। অনেক বিবাহ বিবাহবিচ্ছেদে শেষ হয়েছে কারণ দম্পতি একটি সম্ভাব্য বিবাহের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে প্রতিফলিত করেনি। অনেক লোক প্রায়ই দাবি করে যে তাদের বিয়ের আগে তাদের জীবনসঙ্গী খুব আলাদা ছিল কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা একেবারেই বদলায়নি। সত্য হল বিয়ের আগে তারা তাদের সাথে এতটা সময় কাটায়নি তাই তারা কিছু বৈশিষ্ট্য পালন করেনি যা বিয়ের পরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ প্রায়ই অ্যাকশনে ছুটে যান এবং পরে অনুশোচনা করেন কারণ তাদের পছন্দ তাদের আরও সমস্যা সৃষ্টি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সমস্যাটি প্রথম স্থানে বড় ব্যাপার ছিল না। এই ধরনের ক্রিয়া কেবল তখনই এড়ানো যায় যখন কেউ পরিস্থিতির উপর প্রতিফলন করে এবং একটি পদক্ষেপ এগিয়ে

নেওয়ার বৃহত্তর চিত্রের অর্থ, বিস্তৃত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং পরিণতিগুলি পর্যবেক্ষণ করে।

একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শুধুমাত্র কিছু বৈধ বা বেআইনি কিনা তা মূল্যায়ন করা উচিত নয়। যদিও, এটি এখনও বিবেচনা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি একমাত্র জিনিস নয়। অনেক আইনসম্মত ভুল পছন্দ, যা শয়তান দ্বারা সুশোভিত করা হয়, তা জীবনে আরও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে কোনো পছন্দ করার আগে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একধাপ পিছিয়ে যেতে হবে এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায় এর বৈধতা এবং এর সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী উপকারিতা ও ক্ষতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যের ধারায় শান্তি ও বরকত দান করতে হবে। তার উপর। যারা এইরকম আচরণ করে তারা খুব কমই একটি ভুল পছন্দ করবে তারা পরে অনুশোচনা করবে।

# আবু দারদা (রাঃ)- ২৯

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, ইবাদতে রাত কাটানোর চেয়ে জ্ঞানের একটি শাখা শেখা তাঁর কাছে বেশি প্রিয়। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, সাদ/163।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে তবে স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। কেবলমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ে আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা বাস্তবে আমল না করলেও 1000 সাইকেল নামাজ পড়ার সওয়াব পাবে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠরা আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তাদের আচরণ এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম কারণ তারা মহান আল্লাহর উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা তারা বোঝে না। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

## আবু দারদা (রাঃ)- ৩০

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিতর্ক চালিয়ে যাওয়াই কাউকে জালেম করার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কিতাব আয যুহদ , সাদ/১৭২- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তর্ক করা এড়িয়ে চলে তাকে জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর দেওয়া হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সত্যিকারের মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে এবং তাদের মতামত প্রচার করার জন্য তর্ক বা বিতর্ক করা নয়। সত্য প্রচার করার জন্য তাদের পরিবর্তে তথ্য উপস্থাপন করা উচিত। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। যার উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা সে তর্ক করবে না। যে নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করছে কেবল সে-ই করবে। অনেকের বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তিতে জয়লাভ করলে কারো পদমর্যাদা বাড়ে না। উভয় জগতেই একজনের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় যখন তারা তর্ক করা এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে সত্য উপস্থাপন করে বা যখন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তা গ্রহণ করে। একজন মুসলমানের উচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় অন্যদের সাথে পিছিয়ে যাওয়া এড়ানো উচিত কারণ এটি তর্ক করার একটি বৈশিষ্ট্য। এটি এই সঠিক মানসিকতা যা 16 অধ্যায় আন নাহল, আয়াত 125 এ নির্দেশিত হয়েছে:

*"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."*

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তাদের দায়িত্ব মানুষকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা নয়। তাদের কর্তব্য হল সত্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করা কারণ জোরপূর্বক তর্ক করার বৈশিষ্ট্য।

অন্যরা তাদের মতামতের সাথে একমত না হলে একজন মুসলমান তাদের সময় নষ্ট করবেন না বা চাপ দেবেন না। যখন কেউ সময়ের সাথে সাথে এই মতবিরোধকে ধরে রাখে তখন এটি তাদের এবং অন্যদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে পারে, যা ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক হতে পারে। এটি এমনকি মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ হতে পারে। সুতরাং এই ধরনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যেতে দেওয়া এবং তাদের মতামত এবং পছন্দের সাথে একমত না এমন কারো প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ না করা। এর পরিবর্তে তাদের উচিত অসম্মতিতে সম্মত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে চাপ দেওয়া এবং কোনো অসুস্থ অনুভূতি ছাড়াই পরিস্থিতি থেকে এগিয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে নিজেকে সর্বদা তর্ক করতে এবং অন্যের জন্য শত্রুতা পোষণ করে কারণ তারা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতার পার্থক্যের কারণে নির্দিষ্ট বিষয় এবং বিষয়ে অন্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য। এই নীতি বোঝা এই পৃথিবীতে শান্তি খোঁজার একটি শাখা।

# আবু দারদা (রাঃ)- ৩১

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত ব্যতীত কেউ যা কিছু শোনেন তা বর্ণনা করাই তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কিতাব আয যুহদ , সাদ/১৭২- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4992 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে অন্যের কাছে যা কিছু শোনে তার কথা বলাই তাদের পাপ করার জন্য যথেষ্ট।

এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, একজনকে প্রথমে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা শুধুমাত্র বৈধ বক্তৃতা শুনেছে কারণ সক্রিয়ভাবে এমন একটি কথোপকথনে অংশগ্রহণ করা যা পাপপূর্ণ বক্তৃতা জড়িত উভয় জগতে তাদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। একজন মুসলমানের উচিত নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় বক্তৃতা যুক্ত কথোপকথন এড়ানোর চেষ্টা করা কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায় এবং এটি একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তারা যা শুনেছে তা অন্যদের সাথে না বলে কারণ এটি সহজেই গীবত এবং অপবাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা বড় পাপ। এটি প্রায়শই বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভেঙে যাওয়া এবং ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলমানের কেবলমাত্র তারা

যা শুনেছে তা বর্ণনা করা উচিত যদি তারা পাপ এড়াতে পারে এবং তথ্যটি অন্যদের জন্য উপকারী হয়। উপরন্তু, তারা যে তথ্য দেয় তা অবশ্যই যাচাই করা এবং খাঁটি হতে হবে কারণ যা যাচাই করা হয়নি তা পবিত্র কুরআনের আদেশের পরিপন্থী। যে মুসলমান মানুষের উপকার করতে চায় সে এইভাবে কাজ করে তাদের ক্ষতি করতে পারে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

*"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান কর, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"*

যেমন একজন মুসলমান পছন্দ করেন না যে তারা যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন তার বেশিরভাগই অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত, অন্যরা যা বলে তাও এইভাবে আচরণ করা উচিত নয়।

# আবু কাতাদাহ (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী অভিভূত হয় এবং কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা তাঁর অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। অবশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাদের ডেকে আনার পর, তারা সবাই এগিয়ে গেল যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 451 এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, 141 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

যুদ্ধের সময় আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। বিজয়ের পরে তাদের বলা হয়েছিল যে যে কেউ প্রমাণ করতে পারবে যে সে একজন শত্রু সৈনিককে হত্যা করেছে তাকে তাদের অস্ত্রের মতো জিনিসপত্র নিতে দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে, কেউ আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর ঘটনাটি যাচাই করেনি , যতক্ষণ না অন্য একজন নিশ্চিত করেন যে তিনি যে শত্রু সৈনিককে হত্যা করেছিলেন তার সম্পদ তার কাছে ছিল। এই ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সম্পদ হস্তান্তর না করে তাকে রাখার অনুমতি দেন। আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তাকে সম্পত্তি রাখার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় যখন তারা যথাযথভাবে আল্লাহর সিংহের একজন, যার অর্থ, আবু কাতাদাহ , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর

সম্পদ আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হস্তান্তর করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই হস্তক্ষেপ স্পষ্টভাবে তাঁর ন্যায় ও ন্যায্য প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয় । এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য।* [1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

# সাঈদ বিন আমির (রাঃ)- ১

সাঈদ একবার খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবকে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 164- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে মানুষের সাথে আচরণ করার সময় মহান আল্লাহকে ভয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে

পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু লোকেরা এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিন তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তার কথা ও কাজ কখনোই একে অপরের সাথে বিরোধিতা না করবে কারণ সর্বোত্তম কথা হল যা কর্ম দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।

ভন্ডামির একটি দিক হল যখন কেউ মৌখিকভাবে অন্যদের এবং তাদের ভাল প্রকল্পগুলির জন্য সমর্থন দেখায় যেমন, একটি মসজিদ নির্মাণ কিন্তু যখন প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সময় আসে, যেমন সম্পদ দান করার সময় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। একইভাবে, লোকেরা যখন ভাল সময়ের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা অন্যদের মনে করিয়ে দিয়ে মৌখিকভাবে তাদের সমর্থন করে। কিন্তু জনগণ যে মুহূর্তে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এই মুনাফিকরা কোন মানসিক বা শারীরিক সমর্থন দেয় না। বরং তারা তাদের

সমালোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকদের এই মনোভাব ছিল। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 62:

*"অতএব কেমন হবে যখন তাদের হাতের বর্ধনের কারণে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসে এবং তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার কাছে আসে, "আমরা সদাচরণ ও বাসস্থান ছাড়া আর কিছুই চাইনি।"*

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা লোকেদের যত্ন নেওয়ার জন্য তাঁর মনোযোগ নিয়োজিত করবেন, তারা তাঁর নিকটবর্তী হোক না কেন।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখ হালাল জিনিসের দিকে তাকানোর জন্য এবং তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জন্য প্রদান করা এবং মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে কারণ এটিই শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা লোকেদের যত্ন নেওয়ার জন্য তাঁর মনোযোগ নিয়োজিত করবেন, তারা তাঁর নিকটবর্তী হোক না কেন। তার উচিত তাদের জন্য তা পছন্দ করা যা সে নিজের এবং তার পরিবারের জন্য পছন্দ করে এবং তাদের জন্য তা ঘৃণা করে যা সে নিজের এবং তার পরিবারের জন্য ঘৃণা করে।

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান তাদের বিশ্বাস হারাবে যদি তারা এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলমান তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তার অন্তর হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-

বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভাল কামনা করা তাদের ভাল জিনিসগুলিকে হারিয়ে ফেলবে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলমান মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী উপদেশ দেয়, তখন তাদের উচিত এমনভাবে করা উচিত যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত

অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

*"...সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"*

মুসলমানকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেকে মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত করবে । যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্য করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সমালোচনাকে ভয় করবেন না।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

# আবু আকিল (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করলেন, তাবুক অভিযানে দান করার জন্য, আবু আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহু, সারা রাত কাজ করে কাটান। ফলাফল অভিযানের জন্য তারিখ একটি মুষ্টিমেয় দান. মুনাফিকরা তার দানকে উপহাস করেছিল এবং ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ তাওবাহ, 79 নং আয়াতে অধ্যায় 9 অবতীর্ণ করেছিলেন:

*"যারা [তাদের] দাতব্য বিষয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যে অবদানকারীদের সমালোচনা করে এবং [সমালোচনা করে] যারা তাদের প্রচেষ্টা ব্যতীত [ব্যয় করার] কিছুই পায় না, তাই তারা তাদের উপহাস করে - আল্লাহ তাদের উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"*

কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 191-192- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি পরিমাণের চেয়ে গুণমানের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলমান একটি দুর্বল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে যা তাদের উন্নতি করতে বাধা দেয়। যথা, তারা তাদের পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতিকে অন্যদের সাথে

তুলনা করে যারা সহজ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং এটিকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি না করে , তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যে প্রচেষ্টার অভাবকে অজুহাত দেন, নিজেকে এমন একজনের সাথে তুলনা করে যিনি খণ্ডকালীন কাজ করেন এবং কেবল দাবি করেন যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা তাদের পক্ষে সহজ। যেহেতু তাদের বেশি অবসর সময় আছে। অথবা একজন দরিদ্র মুসলিম যারা বেশি সম্পদের অধিকারী তাদের দেখে এবং দাবী করে যে ধনী ব্যক্তি তাদের চেয়ে বেশি সহজে দান করতে পারে তা দেখে কোন প্রকার দান করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই অজুহাতগুলি তাদের আত্মাকে ভাল বোধ করতে পারে তবে এটি তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাহায্য করে না। মহান আল্লাহ, মানুষ অন্যের উপায় অনুযায়ী কাজ করতে চান না, তিনি কেবল চান যে মানুষ তাদের নিজস্ব উপায় অনুযায়ী তার আনুগত্যের মধ্যে কাজ করুক। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য যে অবসর সময় পান তা উৎসর্গ করতে পারেন, যদিও তা খণ্ডকালীন কাজ করা ব্যক্তির চেয়ে কম হয়। এই ক্ষেত্রে পার্ট টাইমার যা করে তার উপর কোন প্রভাব নেই যিনি পুরো সময় কাজ করেন তাই তাদের কঠোর পরিশ্রম না করার অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করা কেবল একটি খোঁড়া অজুহাত। দরিদ্র মুসলমানের উচিত কেবল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, যদিও তা ধনী ব্যক্তির চেয়ে অনেক কম হয়, কারণ মহান আল্লাহ তাদের যা করেন তার বিচার করবেন এবং অন্যান্য মুসলমান যা করেন সে অনুযায়ী তিনি তাদের বিচার করবেন না।

মুসলমানদের উচিত এইসব অযথা অজুহাত ত্যাগ করা এবং তাদের নিজস্ব উপায়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

# আবদুর রহমান বিন আউফ (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে তাবুক অভিযানে দান করার জন্য উৎসাহিত করলেন, তখন আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা দান করলেন। মুনাফিকরা তাকে দেখানোর জন্য অভিযুক্ত করেছিল এবং ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ তাওবাহ, 79 নং আয়াতে অধ্যায় 9 নাজিল করেছিলেন:

*"যারা [তাদের] দাতব্য বিষয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যে অবদানকারীদের সমালোচনা করে এবং [সমালোচনা করে] যারা তাদের প্রচেষ্টা ব্যতীত [ব্যয় করার] কিছুই পায় না, তাই তারা তাদের উপহাস করে - আল্লাহ তাদের উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"*

কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 192- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আব্দুর রহমান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তিনি যে পার্থিব আশীর্বাদগুলি প্রদান করেছিলেন তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার গুরুত্ব বুঝতেন।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

কেউ সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা এই দোয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়।

উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্নতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

# আবদুর রহমান বিন আউফ (রহঃ)-২

আব্দুর রহমান বিন আওফ , তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার তাঁর মালিকানাধীন একটি জমি 40,000 স্বর্ণমুদ্রার জন্য বিক্রি করেছিলেন এবং তারপর পুরো অর্থ দাতব্য এবং উপহার হিসাবে মদীনার গরীব ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 197 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

সহীহ মুসলিম, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে, তাকে তারা যা দান করবে সে অনুসারে পুরস্কৃত করা হবে। এবং তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অন্যথায় মজুত করবেন না, অন্যথায় মহান আল্লাহ তাঁর নেয়ামত বন্ধ করে দেবেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজনকে অবশ্যই হালাল সম্পদ অর্জন করতে হবে এবং ব্যয় করতে হবে এমন যে কোন সৎ কাজ যার ভিত্তি হারামের উপর ভিত্তি করে আছে তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন, তার ইচ্ছা যাই হোক না কেন। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই ব্যয় শুধুমাত্র দাতব্যের মাধ্যমে নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য খরচ করা, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে এটি আসলে একটি সৎ কাজ। একজন মুসলমানের উচিত

ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ব্যয় করা যাতে তারা নিজের অভাব না করে অন্যদের সাহায্য করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 29:

*"এবং তোমার হাত তোমার গলায় বেঁধে রাখো না বা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করো না এবং [এর ফলে] দোষী ও দেউলিয়া হয়ে যাও।"*

একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা, যদিও তা আল্লাহ, মহান, একজনের গুণগত অর্থ, তাদের আন্তরিকতা পর্যবেক্ষণ করেন, কাজের পরিমাণ নয়। নিয়মিত অল্প কিছু দান করা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বেশি উত্তম ও প্রিয়, একবারে বেশি পরিমাণ দান করার চেয়ে। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আলোচ্য প্রধান হাদীসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন কেউ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবে, মহান আল্লাহ তাকে তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যে আটকে থাকে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। যদি একজন মুসলমান তাদের সম্পদ জমা করে রাখে তবে তারা তা অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে দেবে যখন তারা এর জন্য দায়ী থাকবে। যদি তারা তাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তবে তা তাদের জন্য দুনিয়াতে অভিশাপ ও বোঝা এবং পরকালে শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে।

## আবদুর রহমান বিন আউফ (রহঃ) – ৩

ফেরেশতা জিবরীল (আঃ) একবার অবতরণ করলেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে বললেন, আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) কে নির্দেশ দিতে , ক্ষুধার্ত ও অভাবীদের নিয়মিত খাওয়ানোর জন্য। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 199 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ মানুষকে তারা যা করে তাই দান করেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেউ যদি মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তবে তিনি তাদের স্মরণ করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

*“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব…"*

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ানো ঠিক একই রকম। যে ব্যক্তি এই নেক আমল করবে তাকে জান্নাতের খাবার খাওয়ানো হবে এবং যে অন্যকে পান করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাত থেকে পান করানো হবে। জামি আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামের সর্বোত্তম ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 6236 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে

উপদেশ দিয়েছেন যে, অন্যকে খাওয়ানো এবং অন্যদেরকে সদয় কথা বলে অভিবাদন করা ইসলামের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

মুসলমানদের উচিত এই সৎ কাজের উপর কাজ করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অন্যদের বিশেষ করে দরিদ্রদের নিয়মিত খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এটি একটি আশ্চর্যজনক কাজ যার জন্য খুব বেশি সম্পদের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকে খাওয়ানো, যদিও তা অর্ধেক খেজুর ফলই হয়, কারণ সহীহ বুখারি, 1417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে এটি তাদের থেকে রক্ষা করবে। বিচার দিবসে জাহান্নামের আগুন। এটি মানুষকে এই সৎ কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অজুহাত দেয় না।

# আবদুর রহমান বিন আউফ (রহঃ)- ৪

ফেরেশতা জিবরীল (আঃ) একবার অবতরণ করেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে বললেন, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-কে আদেশ দিতে , লোকেরা যখন তাঁর কাছে সাহায্য চায় তখন আর্থিকভাবে সাহায্য করতে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 199 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করে, মহান আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন তাদের থেকে একটি কষ্ট দূর করবেন।

এটি দেখায় যে একজন মুসলমানের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা সেইভাবে আচরণ করেন যেভাবে তারা আচরণ করে। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152:

*"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."*

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে

অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করবে।

একটি দুর্দশা এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ এবং অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেয়। অতএব, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব বা ধার্মিক যা-ই হোক না কেন অন্যের জন্য এ ধরনের কষ্ট লাঘব করেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক হাদিসে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, জামে আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একজন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানীয় পান করাবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে পান করাবেন।

যেহেতু আখেরাতের কষ্টগুলো দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি, এই পুরস্কার একজন মুসলমানের জন্য আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা পরকালে পৌঁছায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ একজন মুসলমানকে ততক্ষণ সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ তারা অন্যকে সাহায্য করছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে যখন তারা কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করে বা কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করে তখন ফলাফল সফল হতে পারে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করেন তখন তার সফল পরিণতি নিশ্চিত হয়। তাই, মুসলমানদের উচিত নিজেদের স্বার্থে, অন্যদেরকে সকল ভালো কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর সাহায্য পায়।

# আবদুর রহমান বিন আউফ (রহঃ)-৫

আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে, যখন তাদেরকে কষ্টের সাথে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তখন তারা ধৈর্য ধরে সহ্য করেছিল। কিন্তু যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তারা নিশ্চিতভাবে ধৈর্য ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২০৩ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানরা প্রায়শই মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ায়, যেমন জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া বা অসুবিধার সময়ে আরও আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তারা প্রায়ই শিথিল হয় এবং অলস হয়ে যায়। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাধারনত কঠিন সময়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সতর্ক থাকা এবং নিজের আনুগত্য বৃদ্ধি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ এই যে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই অসুবিধার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পাপ করে থাকে, যেমন তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ত্যাগ করা। যদি কেউ ইতিহাসের বিভিন্ন বিপথগামী ব্যক্তিদের যেমন ফেরাউন এবং কুরুনের পর্যালোচনা করে দেখেন যে তাদের পাপ কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েই বহুগুণ বেড়ে যায়। যে কেউ একটি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে যেখানে তারা আটকে আছে এবং ধৈর্য ধরে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের পাপের সম্ভাবনা কম কারণ তারা তাদের অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে চায়। যদিও, একজন ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি উপভোগ করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন এবং জাগতিক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হবেন যা প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, দারিদ্র্যের সম্মুখীন একজন ব্যক্তির পাপের সম্ভাবনা কম কারণ অনেক পাপের জন্য সম্পদের প্রয়োজন হয়। যদিও, একজন ধনী ব্যক্তি সেই পাপগুলি করার জন্য সহজ অবস্থানে থাকে, যেমন অ্যালকোহল বা ড্রাগ কেনা। তাই মুসলমানদের উচিত এই বিষয়টি খেয়াল রাখা এবং নিশ্চিত করা যে তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহর প্রতি

তাদের আনুগত্য বজায় রাখে বা বৃদ্ধি করে যাতে তারা পাপ ও অবাধ্যতায় না পড়ে।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে, সে তাদের কঠিন সময়ে মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করবে যা তাদের সফলভাবে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। . অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

*"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"*

# আবদুর রহমান বিন আউফ (রহঃ)- ৬

আব্দুর রহমান বিন আউফ , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর বান্দাদের থেকে আলাদা করা যেত না কারণ তিনি তাদের থেকে আলাদা শারীরিক চেহারা গ্রহণ করেননি। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, 4/157।

এটা ছিল তার নম্রতার পরিচায়ক। সি অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 63:

*"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."*

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা

একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

*"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

*"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."*

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

*"আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে । এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# আবদুর রহমান বিন আউফ (রহঃ)- ৭

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতের সময় একবার মানুষের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য সিরিয়া সফর করার সিদ্ধান্ত নেন। যখন তিনি আরব উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার সীমান্তে পৌঁছেছিলেন তখন তাকে বলা হয়েছিল যে সিরিয়ায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাকে ফিরে যেতে হবে। এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন কি করবেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সঠিক পথে থাকার এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন এবং অন্যরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ সতর্কতা অবলম্বন করা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রস্থান করার আগে আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের শিবিরে উপস্থিত হন এবং তাদেরকে জানান যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার বলেছিলেন। যে দেশে প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে মানুষ যেন সেখানে প্রবেশ না করে। কিন্তু প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সময় যদি তারা ইতিমধ্যেই ভিতরে থাকে তবে তাদের দেশ ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। সহীহ বুখারীর ৫৭২৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল সেই উপায়গুলি ব্যবহার করা যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সরবরাহ করা হয়েছে, এবং তারপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে পরিস্থিতির ফলাফল, যা মহান আল্লাহ একাই বেছে নেন, জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম। . অতএব, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তের মূল ছিল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার।

জামে আত তিরমিযী, 2344 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সত্যই মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে, তবে তিনি পাখিদের যেমন রিজিক দেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দেবেন। সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ছেড়ে সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল এমন একটি বিষয় যা অন্তরে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

*"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."*

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে একমাত্র মহান আল্লাহই একজনকে উপকারী জিনিস প্রদান করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে দিতে, আটকাতে, ক্ষতি করতে বা উপকার করতে পারে না।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ যে উপায়গুলো দিয়েছেন, যেমন ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে

দেওয়া উচিত। আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করে। যখন কেউ মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় ব্যবহার করে, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা নিঃসন্দেহে তাঁর আনুগত্য করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। বহু আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে । অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাবধান হও..."*

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই হলো মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভ্যন্তরীণ আস্থার অধিকারী হলেও বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

কর্ম এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, ক্রিয়াগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল সেই সমস্ত আনুগত্যের কাজ যা মহান আল্লাহ মুসলমানদের করতে আদেশ করেন যাতে তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাত লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এই বিশ্বাস দাবী করার সময় এগুলো পরিত্যাগ করা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা এবং তাই দোষারোপযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম হল সে সকল মাধ্যম যা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণা পেলে পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম কাপড় পরিধান করা। যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। যাইহোক, কিছু লোক আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনব্যাপী রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে সেই কাজ করতে নিষেধ করতেন, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি প্রদান করেন। এটি সহীহ বুখারি, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী বিন আবু তালিবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট না হন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ অনুভব করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 117 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, যদি একজন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় এটা দোষারোপযোগ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকারের কর্ম হল সেসব কাজ যা একটি প্রথাগত অভ্যাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেই সব মানুষ যারা ওষুধের প্রয়োজন ছাড়াই রোগ নিরাময় করে। এটি বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে বেশ সাধারণ যেখানে ওষুধ পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2144 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে যুক্ত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে ছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করেন তিনি সক্রিয়ভাবে এই জেনেও ব্যবস্থা নাও পেতে পারেন যে

এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা তাদের মিস করতে পারে না। সুতরাং এই ব্যক্তির জন্য রিযিক প্রাপ্তির প্রথাগত উপায় যেমন চাকরির মাধ্যমে তা অর্জন করা মহান আল্লাহ তায়ালা ভেঙে দিয়েছেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদ। অভিযোগ না করে বা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে যে এমন আচরণ করতে পারে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যদি এই পথ বেছে নেয় তবে দোষমুক্ত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া একটি পাপ। তারা এই উচ্চ পদে থাকতে পারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলে নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকে। অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু বেছে নেন তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করেন কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহই তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

উপসংহারে বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা সর্বোত্তম, বৈধ উপায় ব্যবহার করে একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস

করেন যে শুধুমাত্র আল্লাহ, উচ্চতর, সিদ্ধান্ত নেবে ঘটবে, যেটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ যে তারা এটি পালন করে বা না করে।

## আবদুর রহমান বিন আউফ (রহঃ) – ৮

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর এবং তাঁর পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি যে ছয়জনকে মনোনীত করেছিলেন: আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, আয জুবায়ের ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, একটি বৈঠক করেন। আব্দুর রহমান, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অন্যদেরকে শাসনের জন্য প্রার্থীদের সংখ্যা কমিয়ে তিনজন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আয জুবায়ের আলীর পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তালহা উসমানের পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। সা'দ আব্দুর রহমানের পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দেন , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অধিকার ছেড়ে দেন এবং বাকি দুজনকে, অর্থাৎ আলী ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের সঙ্গীর পক্ষে তাদের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। দুজনেই চুপ করে থেকে ভাবতে লাগলো কি করা যায়। তারপর আব্দুর রহমান, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাদের কাছ থেকে অন্যদের সাথে পরামর্শ করার অনুমতি চাইলেন যাতে তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কে হবেন পরবর্তী খলিফা। তারা উভয়েই তার পরামর্শে রাজি হন। অবশেষে, আব্দুর রহমান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, উসমানের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং তাঁর পরে আনুগত্যের অঙ্গীকারকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আলী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এরপর বাকি লোকেরাও তাঁর কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করল। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে তারা প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছিল এবং জাগতিক কারণে উদ্‌বুদ্ধ ছিল না এবং পরবর্তী খলিফা হিসেবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ছিল।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়ীনাহ, আয়াত 5।

*"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি...।"*

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

*"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"*

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনা থেকে ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ হয় । যখন তাদের আক্রমণের কথা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছায়, তখন সালমান (রা.)-এর পরামর্শে তিনি মদিনার চারপাশে একটি বিশাল পরিখা খননের নির্দেশ দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং পরকালের পুরস্কার অন্বেষণ করতে। তারা সবাই তার পাশাপাশি কাজ করেছে। খননের সময় মক্কা থেকে হিজরতকারী, মুহাজিরগণ এবং মদিনার সাহায্যকারী আনসারগণ, আল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাদের সকলের সাথে সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর তর্ক শুরু করে। প্রতিটি পক্ষই দাবি করেছিল যে সে তাদেরই ছিল যদিও সে মদিনার বাসিন্দা বা মক্কা থেকে হিজরতকারী নয় বরং সে পারস্য থেকে এসেছে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমানকে তাঁর পরিবারের একজন সদস্য বলে ঘোষণা করে বিতর্কের অবসান ঘটান। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 135-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সম্মান সালমানকে দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর তাকওয়ার কারণে কারণ তিনি রক্তের মাধ্যমে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোনভাবেই যুক্ত ছিলেন না। সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা

তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ২

সালমান আল ফারসি, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি নিজের হাতে জীবিকা উপার্জন করতে পছন্দ করেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে তিনি মাদাঈনের গভর্নর ছিলেন এবং তারপরও নিজের হাতে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। পাতা কিনে, ঝুড়ি বানিয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। এই সম্পদ সে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ ও দান-খয়রাতের কাজে ব্যবহার করবে। ইমাম আল আসফাহানীর, হিলিয়াত আল আউলিয়া, 447 নম্বর এবং ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 210- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দাবি করে, তাদের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়,

কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে এবং মহান আল্লাহ্ অকার্যকর জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা। একজন মুসলিম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান যার মধ্যে রয়েছে সম্পদও বরাদ্দ করা হয়েছিল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তাই একজন মুসলমানের উচিত হবে আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা দাবী করার সময়, যখন তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় আছে, তখন সামাজিক সুবিধা নিয়ে চলার মাধ্যমে অলস হওয়া উচিত নয়।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ৩

সালমান, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, একবার মন্তব্য করেছিলেন যে বিশ্ব মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে এবং এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল। অথচ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পূর্ববর্তী সাহাবায়ে কেরাম থেকে দূরে রাখা হয়েছিল এবং তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 293- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন ব্যক্তি যত বেশি জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি হবে তত বেশি সম্ভাবনা তারা বস্তুগত জগতের বিলাসিতাগুলিতে হারিয়ে যাবে।

মুসলমানরা প্রায়শই মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ায়, যেমন জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া বা অসুবিধার সময়ে আরও আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা । কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তারা প্রায়ই শিথিল হয় এবং অলস হয়ে যায়। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাধারনত কঠিন সময়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সতর্ক থাকা এবং নিজের আনুগত্য বৃদ্ধি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ এই যে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই অসুবিধার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পাপ করে থাকে, যেমন তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ত্যাগ করা। যদি কেউ ইতিহাসের বিভিন্ন বিপথগামী ব্যক্তিদের যেমন ফেরাউন এবং কুরুনের পর্যালোচনা করে দেখেন যে তাদের পাপ কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েই বহুগুণ বেড়ে যায়। যে কেউ একটি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে যেখানে তারা আটকে আছে এবং ধৈর্য ধরে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের পাপের সম্ভাবনা কম কারণ তারা তাদের অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে চায়। যদিও, একজন ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি উপভোগ করার

জন্য আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন এবং জাগতিক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হবেন যা প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, দারিদ্র্যের সম্মুখীন একজন ব্যক্তির পাপের সম্ভাবনা কম কারণ অনেক পাপের জন্য সম্পদের প্রয়োজন হয়। যদিও, একজন ধনী ব্যক্তি সেই পাপগুলি করার জন্য সহজ অবস্থানে থাকে , যেমন অ্যালকোহল বা ড্রাগ কেনা। তাই মুসলমানদের উচিত এই বিষয়টি খেয়াল রাখা এবং নিশ্চিত করা যে তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে বা বৃদ্ধি করে যাতে তারা পাপ ও অবাধ্যতায় না পড়ে।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে, সে তাদের কঠিন সময়ে মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করবে যা তাদের সফলভাবে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। . অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

*"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"*

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ৪

মাদাঈনের গভর্নর ছিলেন , তখন একজন বণিক শহরে প্রবেশ করেন এবং তিনি সহজ পোশাক পরে তাকে চিনতে ব্যর্থ হন। বণিক তাকে তার মালামাল তার বাড়িতে নিয়ে যেতে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সালমান, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি একজন সাধারণ শ্রমিক ছিলেন। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে সাহায্য করলেন এবং লোকেরা যখন বণিককে বলল যে সে গভর্নর, তখন বণিক ক্ষমা চাইলেন কিন্তু সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ভালো কাজ শেষ করার জন্য জোর দিয়েছিলেন এবং পণ্যগুলি নিয়ে যেতে থাকলেন। ব্যবসায়ীর বাড়ি। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 580- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মহান বিনয় ইঙ্গিত দেয় সালমান, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, অধিষ্ঠিত.

এটি আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, আয়াত 63:

*"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."*

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়,

সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

*"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

*"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."*

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

*"আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ) -৫

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে সালমান আল ফারসি, তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞানের এক অক্ষয় সাগর। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 426 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে তবে স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। কেবলমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ে আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা বাস্তবে আমল না করলেও 1000 সাইকেল নামাজ পড়ার সওয়াব পাবে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠরা আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তাদের আচরণ এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম কারণ তারা মহান আল্লাহর উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা তারা বোঝে না। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ৬

সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতি তাঁর প্রভুর অধিকার রয়েছে, তাঁর পরিবারের অধিকার রয়েছে তাঁর উপর এবং তাঁর শরীরের অধিকার রয়েছে। তিনি তাকে তাদের প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেন। আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যা ঘটেছিল তা উল্লেখ করেছিলেন, তখন সালমান (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছিলেন, তিনি ঠিক সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 428 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 7129 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় সঠিক সময় বেছে নিতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তিনি চাননি। অতিরিক্ত বোঝা বা তাদের বিরক্ত করা।

যদিও, একজন মুসলমানের কাছে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য শেখা ও আমল করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনুযায়ী কাজ করা। এবং অন্যদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনুযায়ী আচরণ করুন যাতে তারা নিজেরাও বিরক্ত না হয় এবং অন্যকেও ইসলাম থেকে বিরক্ত না করে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি ব্যক্তিকে অনন্যভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আশীর্বাদ এবং উপহার দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কারো কারো অনেক বেশি স্বেচ্ছাসেবী উপবাস করার শক্তি আছে আবার কারোর নেই। কেউ কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়ন করে দিন কাটাতে মানসিক শক্তি রাখেন, যেখানে অন্যেরা থাকে না। কেউ কেউ আনন্দের সাথে অন্যদের সাথে সারাদিন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে যখন অন্যদের তা করার জন্য মনোযোগ বা মানসিক শক্তি নেই। এর অর্থ এই নয় যে যারা এই কাজগুলো করার শক্তি রাখে না তারা খারাপ মুসলিম কারণ মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির তাদের সামর্থ্য, শক্তি, উদ্দেশ্য এবং তারা যে কাজ করেছেন তার বিচার করবেন। এই আলোচনার অর্থ হল স্বেচ্ছামূলক ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজেদের বা অন্যদের প্রতি খুব বেশি কঠোর হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানকে একটু একটু করে উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিরক্ত না হয় এবং পুরোপুরি হাল ছেড়ে না দেয়। যদি একজন মুসলমানকে স্বেচ্ছামূলক ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করার শক্তি দেওয়া হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা, কারণ তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে এটি দেওয়া হয়নি। এটা বোঝা অহংকারের মারাত্মক পাপকে প্রতিরোধ করবে একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ৭

সালমান আল ফারসি, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে জ্ঞান একটি সমুদ্রের মতো এবং এই পৃথিবীতে একজনের আয়ু এত কম যে এটি সমস্ত কিছুকে ধারণ করতে পারে। তাই জ্ঞানের ভাগ পাওয়া উচিত যা উপকারী এবং বাকিটা ছেড়ে দিন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 430 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব জ্ঞান যতই থাকুক না কেন তাদের ধর্মীয় জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। যদিও, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে দরকারী পার্থিব জ্ঞান অর্জন প্রশংসনীয় কারণ এটি একজনের জন্য তাদের নিজের এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য এখনও বৈধ বিধান পাওয়ার একটি দুর্দান্ত উপায়, তবুও তাদের ধর্মীয় জীবনের মাধ্যমে নিরাপদে পরিচালিত করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পার্থিব জ্ঞান কাউকে শেখায় না যে কীভাবে নিরাপদে কোনো অসুবিধা বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এমনভাবে যাত্রা করতে হয় যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার লাভ করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাধ্যতামূলক কর্তব্য ও ঐতিহ্য, শুধুমাত্র পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী একজন মুসলিম দ্বারা আমল করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মীয় জ্ঞান একজনকে উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে যেখানে পার্থিব জ্ঞান শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে কাউকে সাহায্য করবে। যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলবে, যার ফলশ্রুতিতে এমন বরকত ও অনুগ্রহ আসবে যে তারা উভয় জগতেই সফলতা পাবে। অথচ জাগতিক জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শক তথা ধার্মিক পূর্বসূরিদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ না করে ধর্মে তাদের নিজস্ব পথ নির্ণয় করতে অনুপ্রাণিত করবে। ধর্ম নিজের পথ তৈরি করা নয়, কেবল ইসলামি শিক্ষা মেনে চলা।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী তারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করেন না যা শুধুমাত্র উভয় জগতে তাদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। অতএব, মুসলমানদের উচিত উভয় জগতের সফলতা কামনা করলে ধর্মীয় ও উপকারী পার্থিব জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করা। এই কারণেই সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ৮

সালমান আল ফারসি, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে অন্য লোকের অভিনয়ের গভীর তদন্তে লিপ্ত না হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। পরিবর্তে, তাদের নিজেদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত, অধ্যবসায় করা এবং অবিচল থাকা উচিত। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৪৩২ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলমান একটি দুর্বল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে যা তাদের উন্নতি করতে বাধা দেয়। যথা, তারা তাদের পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতিকে অন্যদের সাথে তুলনা করে যারা সহজ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং এটিকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি না করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যে প্রচেষ্টার অভাবকে অজুহাত দেন, নিজেকে এমন একজনের সাথে তুলনা করে যিনি খণ্ডকালীন কাজ করেন এবং কেবল দাবি করেন যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা তাদের পক্ষে সহজ। যেহেতু তাদের বেশি অবসর সময় আছে। অথবা একজন দরিদ্র মুসলিম যারা বেশি সম্পদের অধিকারী তাদের দেখে এবং দাবী করে যে ধনী ব্যক্তি তাদের চেয়ে বেশি সহজে দান করতে পারে তা দেখে কোন প্রকার দান করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই অজুহাতগুলি তাদের আত্মাকে ভাল বোধ করতে পারে তবে এটি তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাহায্য করে না। মহান আল্লাহ, মানুষ অন্যের উপায় অনুযায়ী কাজ করতে চান না, তিনি কেবল চান যে মানুষ তাদের নিজস্ব উপায় অনুযায়ী তার আনুগত্যের মধ্যে কাজ করুক। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য যে অবসর সময় পান তা উৎসর্গ করতে পারেন, যদিও তা খণ্ডকালীন কাজ করা ব্যক্তির চেয়ে কম হয়। এই

ক্ষেত্রে পার্ট টাইমার যা করে তার উপর কোন প্রভাব নেই যিনি পুরো সময় কাজ করেন তাই তাদের কঠোর পরিশ্রম না করার অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করা কেবল একটি খোঁড়া অজুহাত। দরিদ্র মুসলমানের উচিত কেবল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, যদিও তা ধনী ব্যক্তির চেয়ে অনেক কম হয়, কারণ মহান আল্লাহ তাদের যা করেন তার বিচার করবেন এবং অন্যান্য মুসলমান যা করেন সে অনুযায়ী তিনি তাদের বিচার করবেন না।

মুসলমানদের উচিত এইসব অযথা অজুহাত ত্যাগ করা এবং তাদের নিজস্ব উপায়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ৯

সালমান আল ফারসি, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, আল্লাহ একবার বলেছিলেন যে বিচারের দিন, অন্ধকার সেই সমস্ত কাজের প্রতিনিধিত্ব করবে যা মানুষ এই পৃথিবীতে একে অপরের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে করেছে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 454 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু লোকেরা এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিন তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ১০

সালমান আল ফারসি, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে তিনি এমন একজনকে নিয়ে উপহাস করেছিলেন যে গাফিলতি এবং বেখবর ছিল অথচ মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 478 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কোন কিছুই তার আকার ও অবস্থান নির্বিশেষে মহান আল্লাহর দৃষ্টি ও শ্রবণের নাগালের বাইরে নয়।

যে মুসলমান এই ঐশী নামটি বোঝে তারা তাদের কাজ ও কথাবার্তায় অত্যন্ত সতর্ক থাকবে। একইভাবে কেউ যখন শ্রবণে থাকে এবং এমন কাউকে দেখে তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সতর্ক হয় যাকে তারা সম্মান করে বা ভয় করে একজন সত্যিকারের মুসলমান তাদের আচরণের বিষয়ে সতর্ক থাকে যে কোন কথা বা কাজ মহান আল্লাহকে এড়িয়ে যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবে কাজ করা হল ঈমানের উচ্চ স্তর যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যদি কেউ এই আচরণের উপর অবিচল থাকে তবে তারা অবশেষে তারা ঈমানের উৎকর্ষে পৌঁছে যাবে যার মাধ্যমে তারা সালাতের মতো কাজগুলো করে, যেন তারা মহান আল্লাহকে অবলোকন করে, ক্রমাগত তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। এই মনোভাব পাপ প্রতিরোধ করবে এবং আন্তরিকভাবে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

উপরন্তু, এই ঐশ্বরিক নাম মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করে যখনই তারা কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখনই তারা আশা ছেড়ে না দেয়, যার ফলে বিশ্বাস করে যে কেউ তাদের সম্পর্কে সচেতন বা চিন্তাও করে না। মহান আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাদের দুঃখ-কষ্ট শোনেন এবং দেখেন এবং তার বান্দার জন্য সর্বোত্তম সময়ে সাড়া দেবেন। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

*"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব..."*

এই দুই ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে একজন মুসলমানের এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা উচিৎ মহান আল্লাহর নির্দেশে। অর্থ, হারাম ও অনর্থক জিনিস দেখা উচিত নয় এবং হারাম ও অনর্থক কথা শোনা উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে এগুলো ব্যবহার করা। নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলি প্রায়শই বেআইনীর প্রথম পদক্ষেপ। এটি সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া হাদীসের উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এটি উপদেশ দেয় যে যখন কেউ বাধ্যতামূলক কর্তব্যের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে এবং তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় সৎকাজে প্রচেষ্টা চালায়। মহিমান্বিত, তিনি তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তির মতো তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্ষমতা দেন যাতে তারা কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছা এবং আনন্দ অনুসারে তাদের ব্যবহার করে।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ)- ১১

সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যখন কোন ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার অভ্যাস থাকে এবং তারপরে অসুবিধায় পড়ে এবং প্রার্থনা করে, তখন ফেরেশতারা তাদের কণ্ঠস্বর চিনতে পারে এবং সুপারিশ করে। তাদের পক্ষে কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মহান আল্লাহকে স্মরণ করে না এবং তারপর অসুবিধার সময় প্রার্থনা করে তখন ফেরেশতারা তাদের কণ্ঠস্বর চিনতে পারে না এবং তাদের পক্ষে সুপারিশও করে না। ইবনুল জাওযীর সিফাতুল সাফওয়াহ ১/২৮১ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে যে ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে, সে কঠিন সময়ে তাঁর সমর্থন ও সাহায্য পাবে। এই প্রতিক্রিয়াটি পূর্বে আলোচিত ঐশী হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে যা সহীহ বুখারি, নম্বর 6502-এ পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে যখন কেউ মহান আল্লাহকে মান্য করতে থাকে, তখন তিনি তার দেহকে শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্য করার ক্ষমতা দেন। এই ক্ষমতায়নের একটি অংশ ধৈর্য এবং সমর্থন প্রদান করা হচ্ছে যখন কেউ কষ্টের সম্মুখীন হয়।

এই উপদেশের উপর আমল করা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর উপর আস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। তারা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তাদের সমর্থন দেবে, সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্তি দেবে এবং এমনকি তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবে। এই আস্থা একজনকে তাদের প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার পরিবর্তে মহান আল্লাহর হুকুমের উপর নির্ভর করতে সাহায্য করে। তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, শুধুমাত্র তাদের জন্য সর্বোত্তম

সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ দেবে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

*"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"*

মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এই সাড়া পাওয়ার জন্য, তাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 3382 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি তার কষ্ট ও দুঃখের সময়ে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। পবিত্র কুরআন এই সত্যকে নির্দেশ করে অধ্যায়ে 37 সাফফাত, আয়াত 143 এবং 144:

*“আর সে যদি আল্লাহর প্রশংসাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো। যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে ততদিন পর্যন্ত সে তার পেটের মধ্যেই থাকবে।"*

এটিই যখন মহান আল্লাহ হযরত ইউনুস (আঃ)-কে একটি তিমি গিলে ফেলার পর তাকে উদ্ধার করেন। তার পূর্বের আনুগত্য মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করেছিল, তাকে নিরাপত্তা এবং তার অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দিয়েছিল।

বিপরীতে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে গাফেল থাকা এবং কেবল অসুবিধার সময় তাকে স্মরণ করা খুব কম বা কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না। উদাহরণস্বরূপ, ফেরাউন বিদ্রোহী জীবন যাপনের পর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা তার কোন উপকারে আসেনি। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 91:

*"এখন? আর তুমি ইতিপূর্বে (তাঁর) অবাধ্য ছিলে এবং ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে?*

এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে মৃত্যু। সুতরাং আশা করা যায় যে, যে ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং আন্তরিকভাবে আনুগত্য করবে, তাদের মৃত্যুর সময় তিনি তাদের রক্ষা করবেন যাতে তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 27:

*"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে দৃঢ় বাণী দিয়ে দৃঢ় রাখেন..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ ও আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা যাতে তিনি কঠিন সময়ে তাদের উদ্ধার করেন।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ) – ১২

সালমান আল ফারসি, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে একজনের নীরবতা অবশ্যই প্রতিফলনের জন্য হতে হবে। ইবনু আবদ রাব্বিহ এর আল ইকাদ আল ফরিদ , 3/110 এ আলোচনা করা হয়েছে ।

নিছক ইবাদত করলে কাউকে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা যাবে না। মুসলমানরা কেবল তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেই এই স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদের কাছে থাকা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দিয়ে এবং তাদের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে অর্জন করা হয়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র গুরুতর প্রতিফলন এবং স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

যখন কেউ তাদের নিজস্ব বাস্তবতাকে চিনতে পারে তখন এটি তাদের সেবকের মতো জীবনযাপন করতে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করবে। এটি তাদের মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পরিচালিত করবে , যা চূড়ান্ত লক্ষ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

*"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"*

এই আত্ম-মূল্যায়ন একজনকে তাদের চরিত্র এবং আত্মাকে মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অত্যাবশ্যক,

যা উভয় জগতের সাফল্যের পথ। কেউ কেউ বস্তুগত জগতে এতটাই হারিয়ে যায় যে তারা কখনই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে না এবং তাই তাদের এক বিট পরিবর্তন না করেই কয়েক দশক কেটে যায়। দুর্বলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে মুসলমানদের অবশ্যই আত্ম-মূল্যায়ন এবং আরও উন্নতির জন্য তাদের দেওয়া শক্তির সময় ব্যবহার করতে হবে । এই মুহুর্তে তারা পরিবর্তন করতে চাইবে কিন্তু তারা তা করার বুদ্ধি বা শক্তির অধিকারী হবে না। এটি সহীহ বুখারী, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে যাদেরকে প্রভূত ক্ষমতা ও সম্পদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু অবশেষে এমন একটি সময় এল যখন তাদের শক্তির মুহূর্ত ফুরিয়ে গেল এবং তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাদের শক্তির মুহূর্তগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন, তারা এমনভাবে আশীর্বাদ করবেন যে, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও তারা সমাজে সম্মানিত হবেন।

যেহেতু মুসলমানদের অধিকাংশই আরবি ভাষা বোঝে না, প্রচুর পরিমাণে ইবাদত এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকে ট্রিগার করবে না। এই জড় জগৎ, মৃত্যু, কবর ও জাহান্নামকে চিন্তা করেই কেউ সেখানে পৌঁছাতে পারে। এ কারণে ষাট বছরের স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে এক মুহূর্তের প্রতিফলন উত্তম হয়ে উঠতে পারে।

যারা প্রজ্ঞা বা প্রতিফলন ছাড়াই জীবনযাপন করে তারা অভ্যাসগতভাবে ভুল করে যা শুধুমাত্র ক্রমাগত চাপের দিকে পরিচালিত করে। এই লোকেরাই কোন উচ্চ আকাঙ্খা ছাড়াই লক্ষ্যহীন জীবনযাপন করে এবং তাদের আসল উদ্দেশ্য না বুঝেই প্রতিটি দিন অতিক্রম করে।

ধার্মিকরা সর্বদা তাদের দিন থেকে সময় বের করে তাদের লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করার জন্য, তারা কী কাজ করেছে এবং তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে কি না। এই মানসিকতা নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি পাপ পরিহার করে, সৎ কাজ করে এবং যদি তারা পাপ করে তবে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। এই মানসিকতা ইসলামের দ্বিতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা ওমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেওয়া উপদেশের সাথে খাপ খায়, যা ইমাম আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৯৮ নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে। বিচার দিবসে অন্য কেউ তাদের বিচার করবে, নাম মহান আল্লাহ।

এই স্ব-মূল্যায়ন হল সেই চাবিকাঠি যা একজনকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করে। এই মঞ্চের তুলনায় এটি সর্বোত্তম পর্যায় যেখানে একজন তাদের ভুল বুঝতে পারে যখন অন্য একজন তাদের নির্দেশ করে। কিন্তু এই পর্যায়েও একজনের ভালো বন্ধু এবং আত্মীয়দের থাকা প্রয়োজন যারা জ্ঞানী এবং আন্তরিকভাবে তাদের চিরন্তন কল্যাণের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে শুধুমাত্র জড় জগতের সাথে উদ্বিগ্ন। একজন সত্যিকারের ধন্য মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কাছে এই ধরনের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব রয়েছে যারা তাদের তাকওয়া অবলম্বন করতে সাহায্য করে।

একজনের দিনের শুরুতে প্রতিফলিত হওয়া এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সেই কাজগুলি এড়িয়ে সময় বাঁচায় যেগুলি বিলম্বিত হওয়া উচিত।

নিচের আয়াতে সফল মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তাভাবনা করে এবং গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং অহংকার প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত না হয় তবে তাদের অনুতপ্ত হতে হবে এবং অনেক দেরি হওয়ার আগেই পরিবর্তন করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 83:

*"এবং যখন তারা শোনেন যা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে বলে তাদের চোখ অশ্রুতে উপচে পড়ছে..."*

আত্ম-প্রতিফলনের অভাব মুসলমানদের বস্তুজগতে হারিয়ে যেতে বাধ্য করেছে যদিও ইসলামিক জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক সহজলভ্য। স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা শুধুমাত্র একজনকে এতদূর নিয়ে যাবে কিন্তু বিশ্বাসের উচ্চতায় পৌঁছতে তাদের অবশ্যই তাদের চরিত্রের প্রতিফলন এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এটি তাদের মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিত্যাগ করতে এবং তাদের প্রতিস্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই আত্ম-মূল্যায়ন এবং প্রতিফলনকে উদ্দীপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানটি হল ইসলামী জ্ঞান যা অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত হতে হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে , এই ধরনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ।

# সালমান আল ফারসি (রহঃ) – ১ ৩

সালমান আল ফারসি, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে মসজিদকে অবশ্যই তাদের বাড়ি করতে হবে। ইবনু আবদ রাব্বিহ এর আল ইকাদ আল ফরিদ, 3/110 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করে না। কিংবা তাদেরকে সর্বদা মসজিদে বসবাসের নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজারের জায়গায় যাওয়ার চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যেখানে, মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন ছাত্র যেমন

একটি লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয় যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে।

একজন মুসলমানকে অন্য জায়গার চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

## সালমান আল ফারসি (রহঃ) – ১৪

সালমান আল ফারসি, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে লোকেদের তাদের কাজের মধ্যে সংযম এবং ধারাবাহিকতা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন এবং ফলস্বরূপ তারা বিজয়ী ঘোড়া হবে। ইবন আবদে রাব্বিহ এর আল ইকাদ আল ফরিদ, 2/199 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে কাজগুলি সঠিকভাবে, আন্তরিকভাবে এবং পরিমিতভাবে করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে একজন ব্যক্তির আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি হল সেগুলি যা নিয়মিত হয় যদিও তা কম হয়।

মুসলমানদের নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিক অর্থে কাজগুলো করছে, কারণ এই নির্দেশনা ব্যতীত কোনো কাজ করা একজনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

পরবর্তীতে, তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এগুলি সম্পাদন করবে, প্রদর্শনের মতো অন্য কোনও কারণে নয়। এই লোকদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত নিজেদেরকে অতিরিক্ত বোঝা না দিয়ে পরিমিতভাবে স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজ করা কারণ এটি প্রায়শই একজনকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সামর্থ্য এবং উপায় অনুযায়ী নিয়মিত কাজ করা উচিত যদিও এই ক্রিয়াগুলি আকার এবং সংখ্যায় সামান্যই হয় কারণ এটি একটি সময়ে একবার সম্পাদিত বড় ক্রিয়াগুলির চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের সৎ কাজগুলি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদ, কারণ সেগুলি সম্পাদন করার অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সুযোগ মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। অতএব, মুসলমানরা কেবল মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই সত্য উপলব্ধি অহংকারের মারাত্মক বৈশিষ্ট্য প্রতিরোধ করে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৬ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

## সালমান আল ফারসি (রহঃ)- 15

তাঁর মৃত্যুশয্যায়, সালমান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, কেঁদেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, যিনি তাঁকে কেবলমাত্র এই পৃথিবী থেকে অনুরূপ বিধান গ্রহণ করতে বলেছিলেন। একটি রাইডার একটি ছোট যাত্রার জন্য কি লাগে. সালমান, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিলেন যদিও তিনি একটি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন এবং শুধুমাত্র একটি পাত্র, একটি প্লেট এবং একটি জগ এর মতো খালি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 293-294- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি নিয়ে চিন্তিত নন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর উদাহরণ হল একজন সওয়ারীর মতো যে একটি গাছের ছায়ায় সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম এবং তারপর এটিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তিই একজন ভ্রমণকারী যারা এই পৃথিবীতে খুব সীমিত সময়ের জন্য অবস্থান করে যেখানে তারা অর্থ, আত্মার জগত থেকে এসেছেন এবং তারা যেখানে যাচ্ছেন যা অনন্ত পরকাল। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবী তুলনামূলকভাবে বাস স্টপে অপেক্ষা করার মতো। এ হাদীসে এ পৃথিবীকে ছায়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হল একটি ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং লোকেরা এমনকি খেয়াল না করেও দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যায় যা একজন ব্যক্তির দিন এবং রাত ঠিক কীভাবে কেটে যায়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণকারীর হোটেল বা হোটেলের কথা উল্লেখ করেননি কারণ

এগুলো শক্ত কাঠামো যা স্থায়ীত্ব নির্দেশ করে। একটি বিবর্ণ ছায়া এই বস্তুজগতকে আরও ভালভাবে বর্ণনা করে। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন তারা সর্বদা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি মুহুর্তের মতো ফ্ল্যাশ করেছে এবং অনুভব করেছে। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

*"যেদিন তারা এটা (বিচার দিবস) দেখবে, সেদিন এমন হবে যে, তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আরোহীকে ইঙ্গিত করেছেন যে কেউ হাঁটবে না কেননা যে হাঁটছে সে আরোহীর চেয়ে গাছের ছায়ায় বেশি বিশ্রাম নেবে। এটি আরও নির্দেশ করে যে মানুষ এই পৃথিবীতে কতটা সীমিত সময় ব্যয় করে।

ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া একজনের গুরুত্ব নির্দেশ করে বস্তুগত জগতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বিধানগুলি পাওয়ার জন্য ঠিক যেমন রাইডার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমন বিশ্রাম। তাই একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুত হয়ে এই দুনিয়া থেকে অবিলম্বে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে এই দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য একজনকে

বস্তুগত জগতকে ব্যবহার করা উচিত। রাইডার বিশ্রাম নেয় এবং মুসলমানদের অবশ্যই অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে তাদের সময় উৎসর্গ করার পরিবর্তে এমন জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে যা তাদের আখেরাতের জন্য উপকারী হবে যা বিচারের দিনে তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

*"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, হায়!*

# সালমান আল ফারসি (রহঃ) -১৬

আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে দেখেছিলেন এবং তাঁকে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সালমান, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করতে দেখেছেন, একজনের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য সবচেয়ে অসাধারণ পুরস্কার পায়। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 472 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2344 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সত্যই মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে, তবে তিনি পাখিদের যেমন রিজিক দেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দেবেন। সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ছেড়ে সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল এমন একটি বিষয় যা অন্তরে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

*"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."*

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে একমাত্র মহান আল্লাহই একজনকে উপকারী জিনিস প্রদান করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে দিতে, আটকাতে, ক্ষতি করতে বা উপকার করতে পারে না।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ যে উপায়গুলো দিয়েছেন, যেমন ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করে। যখন কেউ মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় ব্যবহার করে, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা নিঃসন্দেহে তাঁর আনুগত্য করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। বহু আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাবধান হও..."*

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই হলো মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভ্যন্তরীণ আস্থার অধিকারী হলেও বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

কর্ম এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, ক্রিয়াগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল সেই সমস্ত আনুগত্যের কাজ যা মহান আল্লাহ মুসলমানদের করতে আদেশ করেন যাতে তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাত লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এই বিশ্বাস দাবী করার সময় এগুলো পরিত্যাগ করা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা এবং তাই দোষারোপযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম হল সে সকল মাধ্যম যা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণা পেলে পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম কাপড় পরিধান করা। যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। যাইহোক, কিছু লোক আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনব্যাপী রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে সেই কাজ করতে নিষেধ করতেন, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি প্রদান করেন। এটি সহীহ বুখারি, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী বিন আবু তালিবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট না হন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ অনুভব করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 117 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, যদি একজন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় এটা দোষারোপযোগ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকারের কর্ম হল সেসব কাজ যা একটি প্রথাগত অভ্যাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা মহান

আল্লাহ কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেই সব মানুষ যারা ওষুধের প্রয়োজন ছাড়াই রোগ নিরাময় করে। এটি বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে বেশ সাধারণ যেখানে ওষুধ পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2144 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে যুক্ত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে ছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করেন তিনি সক্রিয়ভাবে এই জেনেও ব্যবস্থা নাও পেতে পারেন যে এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা তাদের মিস করতে পারে না। সুতরাং এই ব্যক্তির জন্য রিযিক প্রাপ্তির প্রথাগত উপায় যেমন চাকরির মাধ্যমে তা অর্জন করা মহান আল্লাহ তায়ালা ভেঙে দিয়েছেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদ। অভিযোগ না করে বা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে যে এমন আচরণ করতে পারে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যদি এই পথ বেছে নেয় তবে দোষমুক্ত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া একটি পাপ। তারা এই উচ্চ পদে থাকতে পারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলে নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকে। অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু বেছে নেন তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করেন কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহই তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

উপসংহারে বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা সর্বোত্তম, বৈধ উপায় ব্যবহার করে একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধুমাত্র আল্লাহ, উচ্চতর, সিদ্ধান্ত নেবে ঘটবে, যেটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ যে তারা এটি পালন করে বা না করে।

# জাফর ইবনে আবু তালিব (রহঃ)- ১

জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু দরিদ্র ও নম্রদের ভালোবাসতেন। তিনি তাদের সাথে বসতেন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, যতক্ষণ না মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নম্রদের পিতা বলে ডাকতেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 227 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3235 নম্বরে পাওয়া মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দরিদ্রদের ভালবাসার গুরুত্ব নির্দেশ করে। দরিদ্রদের ভালবাসা একজনের আন্তরিকতার একটি চমৎকার ইঙ্গিত। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি আশা করে না যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি তাদের সাহায্যের বিনিময়ে তাদের কিছু দেবে, কারণ তারা দরিদ্র। সুতরাং যারা দরিদ্রদেরকে যে কোন উপায়ে সাহায্য করে তারা তাদের চেয়ে যারা দরিদ্রদের সাহায্য করে না তাদের চেয়ে আন্তরিকতার অর্থের কাছাকাছি, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

আসলে, ভালবাসা একটি খুব কঠিন আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা. সুতরাং যে ব্যক্তি এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন, যেমন গরীবদের পছন্দ করেন, সে দৃঢ় ঈমান অর্জন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা, সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের ঈমানকে পূর্ণ করার একটি দিক।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2352 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, দরিদ্রদের ভালবাসা এবং ঘনিষ্ঠ হওয়া একজনকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। বিচার দিবসে। মহান আল্লাহর কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদা সহীহ বুখারি, 5196 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশই দরিদ্র। এবং সুনানে ইবনে মাজাহ, 4122 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে ধনীদের পাঁচশ বছর আগে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

পূর্বে উদ্ধৃত হাদিসটিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবিত, মৃত্যু এবং দরিদ্রদের মধ্যে পুনরুত্থিত হওয়ার অনুরোধের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে দরিদ্রদের ভালোবাসে সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 8-9:

*"এবং তারা এটির প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও [1] অভাবী, এতিম এবং বন্দীকে খাবার দেয়। [বলে], "আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখের [অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য]। আমরা তোমাদের কাছ থেকে পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।"*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বদা দরিদ্রদের সঙ্গ দিতেন এবং তাদের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট ছিলেন। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1415 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে ।

এটা মনে রাখা জরুরী, যে এই ভালবাসা শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে নয় কর্মের মাধ্যমে দেখাতে হবে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের যে কোনো উপায়ে সাহায্য করা, যেমন আর্থিক ও মানসিক সমর্থন।

গরীবদের ভালবাসা অহংকার দূর করতে পারে কারণ অহংকারী লোকেরা দরিদ্রদের সাথে মেলামেশা করতে অপছন্দ করে। এটি ছিল মক্কার কিছু অমুসলিমদের মনোভাব যারা দরিদ্রদের অপছন্দ করত। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 31:

*"আর তারা বললো, "কেন এই কুরআন দুটি শহরের একজন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হলো না?"*

দরিদ্র এবং অভাবী মানুষের সাথে মেলামেশা মানুষকে তাদের কাছে যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2513 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির উচিত এমন লোকদের পর্যবেক্ষণ করা যারা তাদের চেয়ে কম পার্থিব জিনিসের অধিকারী। যারা বেশি অধিকারী তাদের পর্যবেক্ষণ করা একজনকে তাদের যা আছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত করতে পারে। এটি অন্যান্য খারাপ বৈশিষ্ট্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেমন, হিংসা এবং জড় জগতের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা যা একজনকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির প্রতি উদাসীন করে তোলে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 131:

*"এবং আপনার দৃষ্টি সেদিকে প্রসারিত করবেন না যেটির দ্বারা আমি তাদের [কিছু] শ্রেণীকে ভোগ-বিলাস দিয়েছি, [এটি কিন্তু] পার্থিব জীবনের জাঁকজমক যার দ্বারা আমরা তাদের পরীক্ষা করি। আর তোমার প্রভুর রিযিক উত্তম ও স্থায়ী।"*

এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী, মুমিনদের মা, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জামে আত তিরমিযী, ১৭৮০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে কেবলমাত্র গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পূরণের জন্য এবং ধনীদের জমায়েত এড়ানোর জন্য এই দুনিয়া থেকে ন্যূনতম বিধান।

উল্লেখ্য যে, প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর প্রেম ও ভয়ে বিনীত হওয়ার ফলে মহান আল্লাহর কাছে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে প্রয়োজন, যা তাদের অভাবী করে তোলে। এবং যখন বিশ্বের কথা আসে তখন তারা উদ্বিগ্ন থাকে তাই এই ক্ষেত্রে, তারা ধনী যদিও তারা আর্থিকভাবে দরিদ্র হতে পারে।

# জাফর ইবনে আবু তালিব (রহ.)-২

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন যে তিনি চেহারা ও চরিত্রে তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি সহীহ বুখারী, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান মহান আল্লাহকে সম্মান করার জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটিকে অবহেলা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। অর্থ, একজন ব্যক্তি যেভাবে সদয় আচরণ করতে চায় তাকেও অন্যদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে অন্যথায় তারা সফল হবে না কারণ একমাত্র প্রকৃত সফল ব্যক্তিরাই বিশ্বাসী।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের সম্পদকে তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 3318 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। এটা যদি ভালো চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় তাহলে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কি কেউ কল্পনা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে মুসলিমের মতো পুরস্কৃত হবে যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

# জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনা থেকে ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ হয় । যখন তাদের আক্রমণের কথা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছায়, তখন সালমান (রা.)-এর পরামর্শে তিনি মদিনার চারপাশে একটি বিশাল পরিখা খননের নির্দেশ দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং পরকালের পুরস্কার অন্বেষণ করতে। তারা সবাই তার পাশাপাশি কাজ করেছে। পরিখা খনন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত শক্ত মাটির একটি অংশের কথা বলেছিলেন যা তারা ভাঙতে পারেনি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে কোদাল দিয়ে শক্ত মাটিতে আঘাত করলেন এবং তা নরম বালিতে পরিণত হলো। তারা আরও প্রত্যক্ষ করেছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য তার পেটে একটি পাথর বেঁধেছিলেন কারণ সম্পদের অভাবের কারণে তারা তিন দিনেও খেতে পারেননি। জনৈক সাহাবী, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু, বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিছু খাবার রান্না করতে বললেন। কিছু লোকের জন্য যথেষ্ট রান্না করার পর তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সামান্য খাবারের কথা জানিয়েছিলেন কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও সাহাবায়ে কেরামকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যারা শত শত উপস্থিত ছিলেন। এবং অলৌকিকভাবে খাদ্য উপস্থিত সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে উঠল। এটি ইমাম ইবনে

কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 131-132-এ আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারি, 4101 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসেও আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারতেন কিন্তু তিনি বরাবরের মতোই সকল মানুষের প্রতি আন্তরিক ছিলেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

*"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."*

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

*"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."*

# কায়েস বিন সা'দ - ১

কায়েস, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার একটি অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যখন সেনাবাহিনী চরম ক্ষুধার্ত ছিল। সেনাবাহিনীর খাওয়ার জন্য তিনি নয়টি সওয়ারী পশু জবাই করেছিলেন। ফিরে আসার পর যখন তাঁর কর্মের কথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে উল্লেখ করা হয়েছিল, তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে উদারতা ছিল তাঁর পরিবারের বৈশিষ্ট্য। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 235- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে, তাকে তারা যা দান করবে সে অনুসারে পুরস্কৃত করা হবে। এবং তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অন্যথায় মজুত করবেন না, অন্যথায় মহান আল্লাহ তাঁর নেয়ামত বন্ধ করে দেবেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজনকে অবশ্যই হালাল সম্পদ অর্জন করতে হবে এবং ব্যয় করতে হবে এমন যে কোন সৎ কাজ যার ভিত্তি হারামের উপর ভিত্তি করে আছে তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন, তার ইচ্ছা যাই হোক না কেন। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই ব্যয় শুধুমাত্র দাতব্যের মাধ্যমে নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য খরচ করা, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে এটি আসলে একটি সৎ কাজ। একজন মুসলমানের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ব্যয় করা যাতে তারা নিজের অভাব না করে অন্যদের সাহায্য করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 29:

*"এবং তোমার হাত তোমার গলায় বেঁধে রাখো না বা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করো না এবং [এর ফলে] দোষী ও দেউলিয়া হয়ে যাও।"*

একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা, যদিও তা আল্লাহ, মহান, একজনের গুণগত অর্থ, তাদের আন্তরিকতা পর্যবেক্ষণ করেন, কাজের পরিমাণ নয়। নিয়মিত অল্প কিছু দান করা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বেশি উত্তম ও প্রিয়, একবারে বেশি পরিমাণ দান করার চেয়ে। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আলোচ্য প্রধান হাদীসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন কেউ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবে, মহান আল্লাহ তাকে তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যে আটকে থাকে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। যদি একজন মুসলমান তাদের সম্পদ জমা করে রাখে তবে তারা তা অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে দেবে যখন তারা এর জন্য দায়ী থাকবে। যদি তারা তাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তবে তা তাদের জন্য দুনিয়াতে অভিশাপ ও বোঝা এবং পরকালে শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে।

# হাকিম বিন হিজাম (রহঃ)- ১

হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কিছু পার্থিব জিনিস চাইলেন। তার অনুরোধ পূরণের পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছেন যে সম্পদ মিষ্টি এবং যদি কেউ লোভ ছাড়া তা গ্রহণ করে তবে তারা এতে বরকত পাবে কিন্তু যদি তারা লোভের সাথে তা গ্রহণ করে তবে তারা তা পাবে না। এতে ধন্য। তারা সেই ব্যক্তির মত হবে যে তৃপ্ত না হয়ে খায়। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে উপরের (দানকারী) হাতটি নীচের (নেওয়া) হাতের চেয়ে উত্তম। হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহু শপথ গ্রহণ করেন যে, তিনি কখনো কারো কাছে কিছু চাইবেন না এবং কারো কাছ থেকে আর কিছু নেবেন না। আবু বক্কর ও উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের সময় তিনি সরকারী কোষাগার থেকে তার অংশ নিতে অস্বীকার করেন এবং তার প্রতিশ্রুতিতে সত্য ছিলেন। সহীহ বুখারী, 3143 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট। যে সর্বদা অধিক জাগতিক জিনিসের প্রয়োজন সে অভাবী, যা গরীবদের জন্য আরেকটি শব্দ, যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট সে অভাবী নয় এবং তাই তাদের কাছে সামান্য সম্পদ বা পার্থিব জিনিস থাকলেও সে ধনী।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তাতে যে সন্তুষ্ট, তাকে অনুগ্রহ প্রদান করা হবে যা তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে এবং এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে, যারা সন্তুষ্ট নয় তারা এই অনুগ্রহ লাভ করবে না যার ফলে তাদের মনে হবে যেন তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এটি তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তির জন্য যা পছন্দ করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্য। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিৎ, সর্বদা তার বান্দার জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যদি তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

যদি একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করে, যেমন কঠিন সময়ে ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা, তাহলে তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করা হবে।

# আমির বিন রাবিয়াহ (রাঃ)- ১

আমির, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, একবার এক বন্ধুর দ্বারা একটি মূল্যবান টুকরো জমি অফার করেছিল। তিনি তার বন্ধুকে বলেছিলেন যে তার জমির প্রয়োজন নেই কারণ নিম্নলিখিত আয়াতটি সেদিন অবতীর্ণ হয়েছিল যা তাকে বস্তুজগতের প্রতি অমনোযোগী করে তুলেছিল। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 1:

*"মানুষের জন্য তাদের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা গাফিলতিতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।"*

কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 278- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আমির, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এইভাবে আচরণ করেছিলেন কারণ তিনি দীর্ঘ জীবনের আশা রাখেননি। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যখন কেউ মারা যায় তখন তার বিচারের দিন শুরু হয় কারণ তারা আর সৎ কাজ করার মতো অবস্থায় থাকে না, যেমন আন্তরিক অনুতাপ।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলিমের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

*"আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"*

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

# সাওবান (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার ঘোষণা করেছিলেন যে যে কেউ তাকে গ্যারান্টি দেয় যে তারা মানুষের কাছে কিছু চাইবে না, তিনি তাদের জান্নাতের গ্যারান্টি দেবেন। সাওবান, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, তাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তার কথায় সত্য তিনি কখনো কারো কাছে কিছু চাননি। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1643 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালবাসেন যে সৃষ্টির থেকে স্বাধীন। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের উচিত তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের শারীরিক শক্তি যেমন মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং মানুষের কাছ থেকে জিনিসগুলি চাওয়া উচিত নয় কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা কমিয়ে দেয়। একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যা কিছুই ঘটুক না কেন তাদের জন্য তাদের রিজিক বরাদ্দ করা হয়েছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রচেষ্টার উপর মনোনিবেশ করা এবং বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দেবেন।

## আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (রা.)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বিভেদ ও সমস্যা সৃষ্টির জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালান। এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। একবার তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উবাই, যিনি একজন অনুগত সাহাবী ছিলেন, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর মুনাফিক পিতাকে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজের জন্য হত্যা করার প্রস্তাব দেন। মদিনা শহর এবং এর নেতা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি তার পরিবর্তে তার পিতা, মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে ক্ষমা করবেন এবং সদয় আচরণ করবেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."*

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহুর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

# মান বিন আদী (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাওয়ার পর অনেক সাহাবী দুঃখের বশবর্তী হয়ে তাঁর আগে মৃত্যু কামনা করেছিলেন কিন্তু মাআন রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি পবিত্রতার প্রতি ঈমান আনতে চেয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মৃত্যুর পর যেমন তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 365- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

*"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"*

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

*"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."*

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [হে মুহাম্মাদ ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই

লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

# আবু লুবাবা বিন মুনধির (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি কাফেলা আক্রমণ করার পথে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের উটে চড়ে পালা করে নিলেন কারণ তাদের কাছে খুব কম ছিল। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী এবং আবু লুবাবার সাথে একটি উট ভাগ করে নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর দুই সাহাবীকে হাঁটতে হাঁটতে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তখন তিনি উটে চড়ে যাওয়ার জন্য তাঁর স্থান নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন যে তারা তার চেয়ে শক্তিশালী নয় যার অর্থ, তিনি আহত বা অসুস্থ ছিলেন না যে তিনি হাঁটতে না পারার অজুহাত হিসাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন এবং তিনি আরও বলেন যে তিনি হাঁটার প্রতিদান চান। . ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 258-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আজকের নেতাদের বিপরীতে যারা একই সমস্যার মুখোমুখি হতে অস্বীকার করে তাদের অনুসারীরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রহণ করে, তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মুখোমুখি হওয়া অসুবিধার মধ্যে অংশীদার হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এটি ছিল তার মহান বিনয়ের পরিচায়ক।

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা

পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

*"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 63, দেখায় যে নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজনের চলার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

*"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."*

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

*“আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে । এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# আবু লুবাবা বিন মুনধির (রহঃ) -২

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনা থেকে ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ হয় । মহান আল্লাহ অমুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যখন তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে তাদের শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। মুহাম্মাদ, শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এবং পরিবর্তে খন্দকের যুদ্ধের সময় অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হন । মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি জাগিয়েছিলেন তাই তারা একজন সাহাবী আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কিছু পরামর্শের জন্য অনুরোধ করেছিলেন যেমন তারা ছিলেন না। সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার অবস্থানে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আবু লুবাবা, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাদের পুরুষ সৈন্যদের সম্ভবত তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে এই দিন এবং যুগেও একটি আদর্শ শাস্তি। আবু লুবাবা, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি যা ইঙ্গিত করেছিলেন তার জন্য তিনি অত্যন্ত অনুশোচনা অনুভব করেছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাই তিনি নিজেকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদের একটি গাছের সাথে বেঁধে রেখেছিলেন, যতক্ষণ না তিনি মহান আল্লাহ ক্ষমা করেন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 102:

*“এবং [আছে] অন্য যারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে। তারা একটি সৎ কাজকে অন্য একটি মন্দ কাজের সাথে মিশিয়েছিল [অর্থাৎ কলুষিত]। হয়তো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"*

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 162-164-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ পাপ করে কিন্তু সর্বোত্তম পাপকারী সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে তাওবা করে।

মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা পাপ করতে বাধ্য। যে জিনিসটি এই লোকদের বিশেষ করে তোলে তা হল যখন তারা তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, পাপ বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। , মহিমান্বিত, এবং মানুষ.

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ছোটখাট গুনাহগুলো নেক আমলের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায় যা অনেক হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিম, 550 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি উপদেশ দেয় যে পাঁচটি দৈনিক ফরজ নামাজ এবং

পরপর দুটি জুমার জামাত নামাজ মুছে ফেলবে। তাদের মধ্যে সংঘটিত ছোট গুনাহ যতক্ষণ না বড় গুনাহ এড়ানো যায়।

শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বড় গুনাহগুলো মুছে ফেলা হয়। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত ছোট-বড় সব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা এবং যদি সেগুলি ঘটে থাকে তবে মৃত্যুর সময় অজানা থাকায় অবিলম্বে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

# উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)- ১

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে তিনি শত্রুর মোকাবিলায় একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। একজন শত্রু সৈন্য সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যতক্ষণ না তিনি পরাজিত হন। সৈনিক যখন নিহত হওয়ার কথা তখন সে ঈমানের ইসলামী সাক্ষ্য ঘোষণা করে। এর ফলে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁর থেকে দূরে সরে গেলেন কিন্তু একজন সাহাবী, উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, সেই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি শুধুমাত্র নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য ইসলামে বিশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন। . মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খবর পৌঁছলে তিনি উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, কেন তিনি এমন একজনকে হত্যা করেছেন যিনি উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরেও ঈমানের ইসলামি সাক্ষ্য ঘোষণা করেছেন, তাঁর যুক্তি দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 301-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভাল চিন্তা করা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে উপাসনার একটি দিক। অর্থ, এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচক উপায়ে জিনিস ব্যাখ্যা করা প্রায়ই গীবত এবং অপবাদের মতো পাপের দিকে নিয়ে যায়। সব ক্ষেত্রেই একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়ার জন্য ইতিবাচক উপায়ে যেখানে সম্ভব বিষয়গুলি

ব্যাখ্যা করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, একটি নেতিবাচক মানসিকতা অবলম্বন করা একটি পরিবার থেকে জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অনুমান এবং সন্দেহের জন্য একটি জাতি কতবার যুদ্ধে গেছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে । এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের খনন করছে। এটি একজনকে অন্যের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল উপদেশ প্রদানকারী দ্বারা উপহাস করা হচ্ছে এবং এটি একজনকে উপদেশ দেওয়া থেকে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি এই নেতিবাচক মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল একটি তর্কের দিকে নিয়ে যাবে। এটি অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি যদি তারা ধরে নেয় যে কেউ তাদের খোঁচা দিচ্ছে, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি এটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়। তাদের ইতিবাচক উপায়ে যেখানে সম্ভব এমন জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত যা একটি ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক এবং অনুভূতির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."*

# উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-২

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বনুদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। আল মুসতালিক । তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর সাথে ছিলেন। যাত্রার সময় মহিলারা একটি ছোট বগির ভিতরে বসতেন যা একটি উটের উপর স্থাপন করা হত। সেনাবাহিনী যখন আয়েশা (রা.) শিবির স্থাপন করেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন নিজেকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য চলে যান এবং ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ফেরার সময় সে লক্ষ্য করল তার নেকলেস হারিয়ে গেছে। তারপরে তিনি এটি না পাওয়া পর্যন্ত তার পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করেছিলেন। যখন তিনি আবার ক্যাম্পে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে তারা তাকে ছাড়াই চলে গেছে। এটি ঘটেছিল যখন একটি উটের উপর তার বগি স্থাপন এবং বেঁধে রাখার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছিল যে সে ইতিমধ্যে ভিতরে রয়েছে। সাফওয়ান বিন আল মুয়াত্তাল (রাঃ) একজন সাহাবী, সাফওয়ান বিন আল মুআত্তাল (রাঃ) এর পাশ দিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি পরিত্যক্ত ক্যাম্পসাইটে ছিলেন। তাকে সেনাবাহিনী থেকে পিছিয়ে যাওয়ার এবং ভ্রমণকারী সেনাবাহিনী থেকে অজান্তে পড়ে থাকা যে কোনও লাগেজ তুলে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি আয়েশাকে চিনতে পারলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, যেমনটি তিনি তাকে দেখেছিলেন ইসলামে নারীদের পর্দা করা ফরজ হওয়ার আগে। তিনি সসম্মানে তাকে তার উটটি চড়ার প্রস্তাব দিলেন যখন তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। যখন তারা সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছল তখন লোকেরা আয়েশাকে সাক্ষী করল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করছেন। এই সুযোগে মুনাফিকরা তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে এবং লোকেরা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। মদিনায় অপবাদের প্রভাব যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সাহাবী আলী বিন আবু তালিব এবং উসামা বিন যায়েদকে ডেকে আনলেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা উভয়েই আয়েশা সম্পর্কে ভাল কথা বলেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং এমনকি একজন সাক্ষী, একজন দাসীকে ডেকে তার উত্তম চরিত্রের আরও প্রমাণ খুঁজে পান,

যিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়িতে কাজ করতেন। . তিনি আয়েশা (রা) সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই বলেননি, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 219-220-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের একটি নির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ এড়াতে চেষ্টা করা উচিত, যেমন তাদের সমস্যাগুলি অনেক লোকের সাথে শেয়ার করা। এই মনোভাবের সমস্যা হল যে যখন কেউ অনেক লোককে বলে তখন তাদের সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং পরামর্শ চাওয়া তাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে অভিযোগ করার একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে যা তাদের অধৈর্যতার স্পষ্ট লক্ষণ। উপরন্তু, এই মনোভাব শুধুমাত্র একজনকে বিভ্রান্তিতে ফেলবে কারণ তারা যে উপদেশ প্রাপ্ত হবে তা বৈচিত্র্যময় হবে যার কারণে তারা সঠিক পথ সম্পর্কে আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অথচ, কয়েকজন বিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ করলেই তার নিশ্চিততা বৃদ্ধি পাবে। অনেক লোকের কাছে বারবার একজনের সমস্যা পুনরাবৃত্তি করাও তাদের সমস্যার উপর খুব বেশি ফোকাস করার কারণ হয় যা এটিকে সত্যিকারের চেয়ে বড় এবং আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে, এমনকি এটি তাদের অন্যান্য দায়িত্ব অবহেলা করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা কেবলমাত্র এই সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। আরো অধৈর্যতা।

তাই মুসলমানদের তাদের অসুবিধার বিষয়ে শুধুমাত্র কয়েকজনের সাথে পরামর্শ করা উচিত। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

*"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"*

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। যেমন একজন ব্যক্তি তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকামী হবে একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের সমস্যাগুলি তাদের সাথে শেয়ার করা যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে যুক্ত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সমস্যা তাদের সাথে শেয়ার করা যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

*"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."*

# উসামা বিন যায়দ (রাঃ) – ৩

তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একটি বাহিনী আল বলকা ও ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেন। এই বাহিনী মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে যখন তারা শুনল যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসুস্থ। তিনি মারা গেলে তারা পরবর্তী নির্দেশের জন্য মদিনায় ফিরে আসেন।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা নিযুক্ত করা হলে তিনি সেনাবাহিনীকে তাদের মিশন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, উসামার প্রতি কিছু অপছন্দ দেখিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি অত্যন্ত তরুণ এবং অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং এমনকি অনেক সিনিয়র সাহাবীর উপরে নেতা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট হন। তাঁর ইন্তেকালের আগে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এমনকি তাঁর পিতা যায়েদ বিন হারিথা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতোই তিনি নেতৃত্বের যোগ্য বলে ঘোষণা দিয়ে যারা এইভাবে অনুভব করেছিলেন তাদের সমালোচনা করেছিলেন। তার আগে নেতৃত্বের, যদিও লোকেরা তার নেতৃত্বে নিয়োগের সমালোচনা করেছিল। এটি সহীহ বুখারী, 4469 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর, উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পুনরায় প্রেরণ করেন, কিছু সাহাবী উমর ইবনে খাত্তাবকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি সেই বাহিনীর অংশ ছিলেন, আবু বক্করকে অনুরোধ করা, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ কাউকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব পুনরায় অর্পণ করার জন্য। এই অনুরোধ শুনে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রোধে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দাড়ি ধরে

ফেললেন এবং মন্তব্য করলেন যে, তিনি কীভাবে তাঁকে বরখাস্ত করতে পারেন যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাকে, ব্যক্তিগতভাবে তাকে নিযুক্ত করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে তিনি নেতৃত্বের যোগ্য। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 325-326- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যাদের উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগ নিয়ে সমস্যা ছিল, তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দে অসন্তুষ্ট হননি। তার উপর। তাদের কেবল তার নেতৃত্ব নিয়ে সমস্যা ছিল কারণ তিনি অত্যন্ত তরুণ এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন। একজন অভিজ্ঞ এবং আশ্চর্যজনক নেতা থাকা একটি যুদ্ধের সময় নেতৃত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। যে নেতার এই গুণাবলীর অভাব রয়েছে সে তার আদেশ জারি করার সময় সৈন্যদের হৃদয়ে দ্বিধা সৃষ্টি করতে পারে। এই দ্বিধা প্রায়শই যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করে। এই কারণেই কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাঁর নেতা হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন।

উপরন্তু, উসামা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনি নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন কারণ তিনি উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই

শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

*"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"*

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

পরিশেষে, যদিও উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যদিও তিনি খুব অল্প বয়সী ছিলেন তথাপি তিনি সঠিক উপায়ে বেড়ে উঠার অর্থ, ইসলামের

শিক্ষা অনুসারে, তিনি একজন মহীয়সী ব্যক্তি এবং নেতা হয়েছিলেন। মুসলমানদের অবশ্যই যুবসমাজকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গড়ে তোলার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে যাতে তারা নিশ্চিত করতে পারে যে মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্ম মহৎ ও প্রশংসনীয় হয়ে উঠবে।

উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে সবচেয়ে নেক উপহার দিতে পারেন তা হল তাদের উত্তম চরিত্র শেখানো।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন, যেমন তাদের সন্তানদের বিশ্বাস সম্পর্কে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন ও প্রদানের বিষয়ে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায়। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান তাদের সন্তানদের শেখানোর বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে কীভাবে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হয় এবং প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন করতে হয় যে তারা তাদের মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য শেখাতে অবহেলা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। ধৈর্য এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের কাছে তাদের সন্তানদের ভালো আচরণ শেখানোর জন্য প্রচুর সময় আছে কারণ তাদের মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে লোকেদের উপর আঘাত করে।

এছাড়াও, বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায় এবং তাদের পথে সেট হয়ে যায় তখন তাদের ভাল আচরণ শেখানো অত্যন্ত কঠিন। আজকের দিনটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়-স্বজনকে যে উপহার দিতে চান তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এভাবেই একজন মুসলমান আখেরাতের জন্য কল্যাণ প্রেরণ করে কিন্তু একজন ধার্মিক সন্তান হিসাবে ভাল কিছু রেখে যায় যা তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তাদের উপকার করে। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

# মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)- ১

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার নবম বছরে ইয়েমেনের হাদরামাওত থেকে এক যুবরাজ ওয়াইল বিন হুজর মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাদরামাওতের অন্যান্য রাজকুমারদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তিনি সাহাবী মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ওয়াইল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে গৃহে প্রেরণ করলেন। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চড়ার মতো কোনো উট ছিল না এবং তিনি ওয়াইল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে হাঁটতে বাধ্য হন, যখন তিনি তাঁর উটে চড়েছিলেন। তিনি ওয়াইল রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিছনে সওয়ার হতে বললেন , কিন্তু তিনি রাজাদের পিছনে চড়ার উপযুক্ত নন বলে ঘোষণা করতে অস্বীকার করেন। বহু বছর পর মুয়াবিয়া, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ইসলামের খলিফা হন এবং যখন ওয়াইল , আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁকে দেখতে গেলেন তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করেছিলেন এবং সেই সফরে তিনি তাঁকে যা বলেছিলেন তা তাঁকে মজা করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 108-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের

ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"*

# মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)-২

উসমান ইবনে আফফানের খিলাফতের সময়, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, ভয় পেয়েছিলেন রোমানরা হোমস শহর আক্রমণ করবে, কারণ এটি তাদের অঞ্চলের কাছাকাছি ছিল। তিনি খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করেন, হোমসকে রক্ষা করার জন্য সমুদ্রপথে সাইপ্রাসে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দেওয়ার জন্য, কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমুদ্র ভ্রমণের ধারণাটিকে অপছন্দ করেন। উসমান যখন খলিফা হন, তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে সৈন্যদের তার সাথে যেতে বাধ্য করবেন না এবং পরিবর্তে তাদের বিকল্পটি অফার করবেন, কারণ সে সময় অনেক লোক সমুদ্রপথে ভ্রমণ পছন্দ করত না। একটি বিশাল বাহিনী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর অভিযানে যোগ দেয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নুরাইন , পৃষ্ঠা ২৭২-২৭৫- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও বিশ্ব মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তবুও এই সৈন্যরা এই অভিযানে তার সাথে স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিল কারণ তাদের মনোযোগ ছিল পরকালের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং বস্তুগত জগতের বিলাসিতা উপভোগ করা নয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

# সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)- ১

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, একবার অন্য একজন সাহাবীর সাথে মতবিরোধ হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং কেউ সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তাকে খারাপ কথা বলে এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরেরটি তাকে থামিয়ে দেয় এবং তাকে চুপ থাকতে বলে যে তার এবং তার (মুসলিম) ভাইয়ের মধ্যে যা ছিল তা তাদের ঐক্য ও ধর্মীয় বন্ধনকে প্রভাবিত করেনি এবং তাদের ধর্মের সত্যতার সাথে এর কোন প্রভাব নেই। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 192 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম সব মানুষের সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের দাবি করে না। যেহেতু মানুষ ভিন্নভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাই সবার সাথে মিলেমিশে থাকা সম্ভব নয়। মানসিকতার পার্থক্যের কারণে লোকেরা সবসময় অন্যদের সাথে একমত হবে না যারা ভিন্ন মানসিকতার অধিকারী। একমাত্র ব্যক্তি যিনি এটি অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন একজন দ্বিমুখী ব্যক্তি যিনি কার সাথে আছেন তার উপর নির্ভর করে তাদের আচরণ এবং মনোভাব পরিবর্তন করেন। কিন্তু এমনকি এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ দ্বারা উন্মোচিত হবে। একজন ব্যক্তি অন্যদের সাথে মিলিত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা তাদের অপছন্দ করে। এর অর্থ শুধুমাত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে ভিন্নতা রয়েছে। ঠিক যেমন একটি স্কুলের শিশু যে তাদের ক্লাসের প্রতিটি শিশুর সাথে বন্ধুত্ব করে না। এর মানে এই নয় যে তারা যাদের সাথে বন্ধুত্ব করে না তাদের অপছন্দ করে।

অতএব, একজন মুসলমানের দুঃখ হওয়া উচিত নয় যদি তারা সকলের সাথে, এমনকি তাদের নিজের আত্মীয়দের সাথে না যায়। কিন্তু অন্য সকলের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করা এবং তাদের সাথে না মিললেও প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার পূরণ করা সকল মুসলমানের কর্তব্য কারণ এটি একজন মুসলমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইসলাম এটিই নির্দেশ করে এবং যদি কেউ সবার সাথে এইভাবে কাজ করে তবে তারা উভয় জগতের মানুষের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া শান্তিপূর্ণ এবং উপকারী বলে মনে করবে।

# সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-২

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে এক সময় তারা সামাজিক বয়কটের ফলে মক্কার উপকণ্ঠে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। মক্কার অমুসলিমরা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। ঝোপঝাড় আর বন্য গাছপালা ছাড়া তাদের খাওয়ার কিছুই ছিল না। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১৮৬ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে দাবি করেন না। উদাহরণস্বরূপ, তারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে যেখানে তারা তাদের পরিবার, ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য রেখে এক বিচিত্র দেশে হিজরত করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলমানরা এখন যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ততটা কঠিন নয় যতটা ধার্মিক পূর্বসূরিরা সম্মুখীন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট কুরবানী করতে হবে, যেমন ফরজ ফজরের নামাজ পড়ার জন্য কিছু ঘুম কুরবানী এবং বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার জন্য কিছু সম্পদ। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বাড়িঘর ও পরিবার পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে একজনের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি ব্যবহার করে কার্যত দেখাতে হবে।

উপরন্তু, যখন একজন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উচিত ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল এবং কীভাবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল তা মনে রাখা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠিন সমস্যা সহ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী (সাঃ) তাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একজন মুসলমান যদি ধার্মিক পূর্বসূরিদের অটল মনোভাব অনুসরণ করে তবে আশা করা যায় যে তারা পরকালে তাদের সাথেই থাকবে।

# সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-3

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর ছেলেকে লোভ থেকে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ এটি তাৎক্ষণিক দারিদ্র্য নিয়ে আসে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কিতাব আয যুহদ , সাদ/227- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) লোভের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এটি একজনকে বাধ্যতামূলক দাতব্য বন্ধ করে দিতে পারে যা কেবল উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

*"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."*

যদি কারো লোভ তাদের স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করতে বাধা দেয় তবে এটি বেআইনি নাও হতে পারে তবে এটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত কারণ এটি একজন সত্যিকারের

বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সহজ কথায়, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

# সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) - 4

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর ছেলেকে এমন কথা ও কাজ থেকে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন যার জন্য তাকে পরে ক্ষমা চাইতে হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কিতাব আয যুহদ , সাদ/227- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা বোঝার এবং তার উপর কাজ করার জন্য মুসলমান যারা অনেক সৎ কাজ করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্রোধের সাথে কিছু খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং অসুবিধা, যেমন তর্ক-বিতর্ক, ঘটতে পারে কারণ লোকেরা জিনিসগুলি চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং

কেবল তখনই আগে আসে যখন তারা জানে যে তাদের কথা বা কাজ পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে ভাল এবং উপকারী।

যদিও, একজন মুসলমানের এখনও সৎকাজ সম্পাদনে বিলম্ব করা উচিত নয়, তবুও তাদের সেগুলি সম্পাদন করার আগে কিছু চিন্তা করা উচিত। এর কারণ হল একটি সৎ কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর শর্ত ও শিষ্টাচার কারোর তাড়াহুড়ার কারণে পরিপূর্ণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করার পরেই একজনকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কেবল তাদের পাপগুলিকে কম করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াবে, তবে তারা তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং মতানৈক্যের মতো সমস্যাগুলিকে কমিয়ে দেবে।

# সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-৫

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর ছেলেকে অহংকার থেকে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তিনি কী (রক্ত জমাট বেঁধে) এবং তিনি কোথায় (কবরের দিকে) যাচ্ছেন সে সম্পর্কে তার জ্ঞানের জন্য, তাকে পরিত্যাগ করতে সাহায্য করুন। এটা ইবনু আবদ রাব্বিহ এর আল ইকাদ আল ফরিদ, ২/১৮৫ এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

*“ আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।”*

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান

আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি । প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

# সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)- ৬

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর পুত্রকে সন্তুষ্টির মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ এটি এমন সম্পদ যা শেষ হয় না। ইবনু আবদ রাব্বিহ এর আল ইকাদ আল ফরিদ, 3/164 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6470 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে যার কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট তাকে স্বাবলম্বী করা হবে।

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে অভাবী নয় এবং জিনিসের জন্য লোভী নয়। এটি তখন ঘটে যখন কেউ মহান আল্লাহ কর্তৃক যা দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হয়, যা অর্জিত হয় যখন একজন সঠিকভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিকে যা সর্বোত্তম দান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

এই ব্যক্তি সত্যিকারের ধনী যেখানে সর্বদা জিনিসের জন্য লোভী এবং অভাবী সে অনেক সম্পদের অধিকারী হলেও দরিদ্র। এটি সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

# সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-৭

সিরিয়া অভিযানের সময়, মুসলিম সেনাদের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল কারণ তাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ফলস্বরূপ, খলিফা, আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, স্বেচ্ছাসেবকদের তাদের সাথে যোগদানের জন্য বলেছিলেন এবং হাশেম ইবনে উতবাহ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) এর নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। তার চাচা থেকে বিদায় নেওয়ার সময়, জ্যেষ্ঠ সাহাবী, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি এগিয়ে যেতে এবং যুদ্ধ করতে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কোন পার্থিব উদ্দেশ্যের জন্য নয়। তিনি আরও বলেন, একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি সত্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং একটি ভাল কাজ করবে যা তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছে, যখন তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে। হাশিম, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এই উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করবেন এবং মন্তব্য করেছেন যে তিনি নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন যদি তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে মানুষের জন্য কাজ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬৫৩-৬৫৫-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। সহীহ বুখারির ১ নম্বর হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিচার করেন। একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত ধর্মীয় এবং দরকারী পার্থিব কর্ম সম্পাদন করে, যাতে তারা উভয় জগতে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করুন। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততাকে প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে কারণ তারা মনে করে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে।

# সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-8

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের সময়, আল্লাহ, মহান, পারস্যদের বিরুদ্ধে প্রধান যুদ্ধের সময় মুসলমানদের বিজয় দান করেছিলেন: আল কাদিসিয়ার যুদ্ধ । মুসলমানদের সংখ্যা চার থেকে এক ছিল এবং তাদের সম্পদ কম ছিল তবুও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে তারা বিজয় না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানে ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 200- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে

যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

*"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."*

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের

যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

*"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"*

# সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) – ৯

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বৃদ্ধ হলেন তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষয় হতে লাগল। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কেন তিনি তার দুর্বল দৃষ্টিশক্তি নিরাময়ের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেননি, কারণ এটি সর্বজনবিদিত যে তার প্রার্থনা সর্বদা কবুল হয়। তিনি হেসে উত্তর দিলেন যে, তিনি মহান আল্লাহর হুকুমকে (তার দৃষ্টিশক্তির অবনতি সম্পর্কে) দৃষ্টিশক্তির চেয়ে উত্তম মনে করেছেন। ইবনু আবদ রাব্বিহ এর আল ইকাদ আল ফরিদ, 3/164 এ আলোচনা করা হয়েছে।

তৃপ্তির এই স্তরটি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর মনোভাবের অনুরূপ, যখন তাঁকে একটি বড় আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 68:

*"তারা বলল, "তাকে [হযরত ইব্রাহিম (আঃ)] পুড়িয়ে দাও এবং তোমার উপাস্যদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।"*

এটা স্পষ্ট যে, মহানবী ইব্রাহিম (আঃ) এই মহান ঘটনা জুড়ে ধৈর্য্য ধরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ধৈর্য অতিক্রম করে তৃপ্তির স্তরে পৌঁছেছিলেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল যে ধৈর্যশীল সে পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করে না বরং পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং এমনকি প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে, যে সন্তুষ্ট

সে তাদের নিজের পছন্দের চেয়ে মহান আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দেয় এবং তাই কিছু পরিবর্তন করতে চায় না। মহানবী ইব্রাহীম ( আঃ) তাকে বাঁচানোর জন্য মহান আল্লাহর কাছে সহজে প্রার্থনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সম্ভাব্যভাবে মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধিতা করতে চাননি, কারণ মহান আল্লাহ হয়তো তাকে শহীদ হতে চেয়েছিলেন। যদিও একটি প্রার্থনা এখনও বৈধ ছিল, তবুও তিনি মহান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ দাসত্ব করতে চেয়েছিলেন এবং তাই মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রেখে নীরব ছিলেন। শেখার শিক্ষাটি হল এই ঘটনার আগুনের মতো কিছু পরিস্থিতি দেখা দিলেও এবং কষ্টদায়ক বোধ করলেও, দীর্ঘমেয়াদে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি একজন মুসলমানের জন্য তাদের ইচ্ছার চেয়ে উত্তম, যদিও তারা তাদের পিছনের প্রজ্ঞা অবিলম্বে লক্ষ্য না করে। . একজন মুসলিমকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর কারণ হতে পারে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। তাই মহান আল্লাহর হুকুম নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকলে অন্তত ধৈর্যধারণ করা জরুরি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ..."*

একজন মুসলমানকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, যিনি তাদের জন্য পরিস্থিতি বেছে নিয়েছেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ, তিনিই একমাত্র তিনিই তাদের নিরাপদে সেখান থেকে বের করে আনতে পারেন। এটি কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

*"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"*

# সাঈদ বিন যিয়াদ (রাঃ)- ১

যখন সাঈদ বিন যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর কারো জমি চুরি করার মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি কখনই তা করবেন না যেভাবে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শুনেছেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যে এটি করবে সে তা করবে। বিচার দিবসে দুই পৃথিবীর সাত স্তরের অতল গহ্বরে সীমাবদ্ধ থাকবেন। ইবনে ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 194 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি প্রায়শই মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে আইনি মামলায় ঘটে।

সহীহ বুখারির ২৬৭৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি বেআইনিভাবে হস্তগত করার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসেবে কাজ করে সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। তিনি তাদের উপর ক্ষুব্ধ।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফরয নামাযের মতো জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি কেউ মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাহলেও এর ফলাফল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সাধারণত ঘটে থাকে , বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেখানে মুসলমানরা তাদের অধিকারভুক্ত নয় এমন কিছু গ্রহণ করার জন্য আইনি আদালতে মিথ্যা

দাবি দায়ের করে, যেমন সম্পদ এবং সম্পত্তি। সহীহ বুখারী, 2654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিস মিথ্যাচারকে শিরক এবং পিতামাতার অবাধ্যতার পাশে রাখে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনেও তাই করেছেন। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 30:

*"... সুতরাং মূর্তির অপবিত্রতা পরিহার করুন এবং মিথ্যা বক্তব্য পরিহার করুন।"*

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস একজন ব্যক্তিকে কঠোর সতর্কবাণী দেয় যে মিথ্যা সাক্ষী হতে আন্তরিকভাবে তওবা করে না। যদি তারা তওবা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচারের দিন তারা নড়বে না যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের জাহান্নামে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এমন কিছু নেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে যার কোনো অধিকার তাদের নেই, তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে যদিও তারা যে জিনিসটি নিয়েছিল তা একটি গাছের ডালও হয়। এটি সহীহ মুসলিম, 353 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষী হওয়া একটি গুরুতর পাপ কারণ এতে মিথ্যা বলার মতো আরও অনেক ভয়ঙ্কর পাপ রয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে পাপ করে। এই পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। মিথ্যা সাক্ষীর ভালো কাজ না করলে ভিকটিমকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ভিকটিমদের পাপ মিথ্যা সাক্ষীকে দেওয়া হবে। এর ফলে মিথ্যা সাক্ষীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যদি অন্য কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তারাও গুনাহ করে, যাতে পরবর্তীরা এমন কিছু নিতে পারে যার তাদের অধিকার নেই। এই মনোভাব

স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে যা মুসলমানদের একে অপরকে মন্দ কাজে সাহায্য না করে বরং ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করার পরামর্শ দেয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

*"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."*

মিথ্যা সাক্ষী এমন কিছু ব্যবহার করে আরও পাপ করবে যা প্রাপ্তির উপায়ের কারণে অবৈধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করে এবং তারপরে তা দান করে তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং একটি পাপ হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে কারণ মহান আল্লাহ শুধুমাত্র বৈধকে গ্রহণ করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা সম্পদের সাথে যা কিছু করবে তা অনুগ্রহের অনুপস্থিত এবং একটি পাপ হবে কারণ এটি অবৈধভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল।

সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তায় হোক বা আদালতের মামলায় শপথের অধীনে হোক সবসময় সত্য কথা বলা সকল মুসলমানের কর্তব্য। সব ধরনের মিথ্যা বলা পাপের দিকে নিয়ে যায় যা ফলস্বরূপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে মিথ্যা বলতে থাকবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। বিচার দিবসে এমন একজন ব্যক্তির সাথে কী ঘটতে পারে যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন তা নির্ধারণ করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

# সাঈদ বিন যিয়াদ (রাঃ)-২

সাঈদ বিন যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার একজন সাহাবীদেরকে গালিগালাজ করতে শুনেছিলেন এবং উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্য থেকে একজন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন। তার উপর, এবং এই প্রক্রিয়ায় তার মুখ ধূলিসাৎ করা সমালোচকের সারা জীবনের নেক আমলের চেয়ে উত্তম ছিল, এমনকি যদি তাকে হযরত নূহ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় জীবন দেওয়া হয়। এটি সালিহ আহমাদ আশ-শামীর, মাওয়ায়েজ আল সাহাবাহ, পৃষ্ঠা 304-305 এ আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ, মহানবী (সা.)-এর পর সর্বকালের সর্বোত্তম দল, তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট। তারা যে শারীরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় পর্যবেক্ষণ করেছেন তা অবশ্যই একটি বিষয়। কিন্তু যে কেউ তাদের জীবন এবং তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে জানে সে বোঝে যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই অনন্য এবং মহান কাজের চেয়েও বেশি কিছু।

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে জড়িত একটি হাদীসে দেখানো হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমের ৬৫১৫ নম্বরে পাওয়া যায়। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সওয়ার ছিলেন। মরুভূমিতে তার পরিবহনে যখন তিনি একজন বেদুইনকে দেখতে পেলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদুইনকে অভিবাদন জানালেন, বেদুঈনের মাথায় তার পাগড়ী রাখলেন এবং বেদুইনকে তার বাহনে আরোহণের জন্য জোর দিলেন।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছিল যে তিনি বেদুইনকে যে সালাম দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল কারণ বেদুইনরা মহান সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। , তাকে অভিবাদন। তবুও, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যান এবং বেদুইনদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন যে, তিনি এটা করেছেন শুধুমাত্র কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করতে পারে এমন একটি সর্বোত্তম উপায় হল তাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা। পিতামাতার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন যে, বেদুঈনের পিতা তাঁর পিতার বিশ্বস্ত সেনাপতি উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন।

এই ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তারা কেবল বাধ্যতামূলক দায়িত্বই পালন করেনি এবং সমস্ত পাপ পরিহার করেনি বরং তাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় সুপারিশ করা সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছে। তাদের আত্মসমর্পণ তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বেদুইনকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন কারণ তার করা কোনো কাজই এখনও বাধ্যতামূলক ছিল না, অনেক মুসলিম যারা এই অজুহাত ব্যবহার করবে তার বিপরীতে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যেভাবে করেছিলেন সেভাবে কাজ করেছিলেন। .

ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের অভাবই মুসলমানদের ঈমানকে দুর্বল করে দিয়েছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং অন্যান্য সৎ

কাজ থেকে দূরে সরে যায়, যেমন স্বেচ্ছায় দাতব্য, যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী বলে দাবি করে যে কাজগুলি বাধ্যতামূলক নয়। সকল মুসলমান পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে শেষ হতে চায় । কিন্তু তাদের পথ বা পথে না চললে এটা কিভাবে সম্ভব? কোন মুসলমান যদি তাদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ অনুসরণ করে তাহলে তারা কিভাবে তাদের সাথে মিলিত হবে? তাদের সাথে শেষ করতে তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে যেমনটি তারা করেছিল, তার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে।

# আবু দুজানাহ (রাঃ)- ১

লোকেরা যখন আবু দুজানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে যেত, যখনই তিনি অসুস্থ হতেন, তারা সর্বদা লক্ষ্য করত যে তাঁর মুখ উজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল ছিল। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তার দুটি ভাল কাজ এর একটি কারণ ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 447- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমটি হল যে তিনি এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলতে এড়িয়ে যেতেন যা তাকে চিন্তা করে না।

জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না তারা সেসব বিষয় এড়িয়ে চলে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই হাদিসটিতে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এতে একজন ব্যক্তির বক্তৃতা এবং সেইসাথে তাদের অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ হল যে একজন মুসলমান যে তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে চায় সেগুলিকে অবশ্যই কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে, যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এবং পরিবর্তে তাদের

অবশ্যই সেই জিনিসগুলির সাথে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে যা করে। যে বিষয়গুলো তাদের উদ্বেগজনক তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সাথে যে দায়িত্ব পালন করা হয় তা পালন করার চেষ্টা করা উচিত একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে কেউ যদি তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দেয় সে সেসব এড়িয়ে চলে যা ইসলাম পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, একজনকে তাদের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, সমস্ত পাপ এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে হবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি তখনই যখন কেউ মহান আল্লাহকে পালন করে এবং উপাসনা করে, যেন তারা তাকে পালন করতে পারে বা অন্ততপক্ষে তারা আল্লাহ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়। , মহিমান্বিত, তাদের প্রতিটি চিন্তা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ. এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন হওয়া একজন মুসলমানকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করবে। যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে না, সে এ শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাতে পারবে না।

একজন ব্যক্তিকে উদ্বেগজনক নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক বক্তৃতার সাথে যুক্ত। অধিকাংশ গুনাহ তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। নিরর্থক কথা বলার সংজ্ঞা হল যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা পাপপূর্ণ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের উদ্বেগের বিষয় নয়। সহীহ বুখারি, 2408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অনর্থক কথাবার্তা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অগণিত তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতি হয়েছে কেবল এই কারণে যে কেউ এমন কিছু কথা বলেছে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিয়ে শেষ হয়েছে কারণ কেউ তাদের ব্যবসায় কিছু মনে করেনি। এ কারণেই মহান

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন ধরনের উপকারী কথাবার্তার পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তা করা উচিত। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

*"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।*

প্রকৃতপক্ষে, এমন শব্দ উচ্চারণ করা যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয়, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত বক্তৃতা গণনা করা হবে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদি না এটি ভাল উপদেশ, মন্দ নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে যুক্ত হয়। এর মানে হল যে অন্য সব ধরনের বক্তৃতা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ তারা তাদের উপকার করবে না। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভালো উপদেশ দেওয়া এমন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজনের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তারা পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের জন্য উদ্বেগজনক নয় যাতে তারা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারে। সহজ করে বললে, যে ব্যক্তি সেসব বিষয়ের জন্য সময় উৎসর্গ করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, সে তাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে। এবং যে ব্যক্তি তাদের উদ্বেগজনক জিনিসগুলির সাথে নিজেকে ব্যস্ত

রাখে সে যে বিষয়গুলিকে চিন্তা করে না সেগুলি ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর রহমতে উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করবে।

দুজানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় কাজটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি অন্য মুসলমানের প্রতি খারাপ অনুভূতি পোষণ করেননি।

সুনানে আবু দাউদ, 4860 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার বিরুদ্ধে লোকদের সতর্ক করেছেন কারণ এটি মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এটা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যায়। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি সবচেয়ে বড় অভিযোগ, যেমন বাবা-মা প্রায়ই থাকে। তারা ভাবছে কেন তাদের সন্তানরা আলাদা হয়ে গেছে যদিও তারা একসময় দৃঢ়ভাবে একসাথে ছিল।

আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল কারণ কেউ একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছে। এটি প্রায়শই পরিবারের সদস্য দ্বারা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার অন্য সন্তানের কাছে তার ছেলে সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবেন। এতে দুই আত্মীয়ের মধ্যে শত্রুতা বাড়ে এবং সময়ের সাথে সাথে তা গড়ে ওঠে এবং উভয়ের মধ্যে

ফাটল সৃষ্টি করে। যারা এক সময় একজনের মতো ছিল তারা একে অপরের অপরিচিতের মতো হয়ে যায়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ ফেরেশতা নয়। খুব অল্প কিছু বাদে, যখন একজন ব্যক্তির কাছে অন্যের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক কথা বলা হয় তখন তারা এটি ঘটতে না চাইলেও তারা এতে প্রভাবিত হবে। এই শত্রুতা এখনও ঘটবে এমনকি যদি প্রাথমিক ব্যক্তি যে কারো আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছিল সে আত্মীয়দের মধ্যে ফাটল তৈরি করতে চায় না। কেউ কেউ প্রায়শই অভ্যাসের বাইরে এইভাবে কাজ করে এবং সম্পর্কের ক্ষতি করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা প্রায়শই এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ুক বা ভেঙে যাক।

এই মনোভাব মানুষের মানসিকতার উপর এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে এটি এমন আত্মীয়দেরও প্রভাবিত করে যারা একে অপরের সাথে খুব কমই দেখা বা কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক জিনিসগুলি উল্লেখ করবে যদিও তার আত্মীয় এমনকি তাদের মতো একই দেশে বাস নাও করতে পারে। এই আচরণ তাদের হৃদয়ে শত্রুতা জাগিয়ে তোলে এবং সময়ের সাথে সাথে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের দূরবর্তী আত্মীয়কে অপছন্দ করে যদিও তারা তাদের খুব কমই জানে।

এই সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে যখন দুজন ব্যক্তি অন্য লোকেদের সামনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যদিও, তারা তাদের সন্তানদের সরাসরি কিছু বলছে না,

এটি এখনও তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যদি কেউ সত্যিই এক মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয় তবে তারা বুঝতে পারবে যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ অসুস্থ অনুভূতি সেই ব্যক্তি যা করেছে বা তাদের সরাসরি বলেছে তার কারণে হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি একটি তৃতীয় পক্ষের কারণে ঘটেছে যারা তাদের কাছে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু উল্লেখ করেছে।

এমন ক্ষেত্রে যেখানে একজন অন্যকে বিপদের বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করছে, তখন অন্য ব্যক্তিকে নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। যদি কেউ অন্য ব্যক্তিকে একটি পাঠ শেখানোর চেষ্টা করে, উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের একজনকে তাদের ভাইবোনের মতো আচরণ না করতে শেখাতে চান তবে তাদের উচিত মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ব্যক্তির নাম না করে নেতিবাচক জিনিস উল্লেখ করুন। এই সুন্দর মানসিকতার একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির নাম না করে একটি নেতিবাচক জিনিস উল্লেখ করা কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের আত্মীয় বা অন্যদের সম্পর্কে, ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে নেতিবাচক কথা বলার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা । অন্যথায়, তারা ভালভাবে দেখতে পারে যে সময় কাটানোর সাথে সাথে তাদের পরিবার আলাদা হয়ে যায় এবং একে অপরের থেকে মানসিকভাবে দূরে থাকে।

# আনাস বিন মালিক (রাঃ)- ১

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এক ব্যক্তিকে তাঁর চাকরের সাথে গভর্নরের অপেক্ষায় দেখতে পেলেন। যখন তিনি লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, তিনি উত্তর দিলেন যে তার চাকর এমন একটি পাপ করেছে যার জন্য আইনি শাস্তির প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তা গভর্নরকে জানাতে চলেছেন যাতে তার চাকরের উপর আইনগত শাস্তি কার্যকর হয়। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর জোর দিয়েছিলেন যে তিনি যেন বান্দার সাথে বাড়ি ফিরে যান এবং তাদের পাপ প্রকাশ না করেন। লোকটা শেষ পর্যন্ত রাজি হল। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 439- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। . কেউ যদি এটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট। যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে অভ্যস্ত তারাই যাদের দোষ-ত্রুটি মহান আল্লাহ প্রকাশ্যে আনেন। কিন্তু যে অন্যের দোষ লুকিয়ে রাখে তাকে সমাজ এমন একজন বলে মনে করে যার কোনো স্পষ্ট দোষ নেই।

এই উপদেশের প্রতি দুই ধরনের লোক আছে। প্রথমটি হল তারা যাদের ভুল কাজগুলি ব্যক্তিগত অর্থ, এই ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপ করে না এবং অন্যদের কাছে গর্বিতভাবে তাদের পাপ প্রকাশ করে না। যদি এই ব্যক্তি পিছলে যায় এবং এমন

পাপ করে যা অন্যদের কাছে জানা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি অন্যের ক্ষতির কারণ না হওয়া পর্যন্ত পর্দা করা উচিত। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 19:

*"নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়ুক [বা প্রচার করা হোক] তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি..."*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4375 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে তাদের ভুলগুলি উপেক্ষা করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল সেই পাপাচারী যে প্রকাশ্যে পাপ করে এবং লোকেদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার পরোয়া করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রায়ই অন্যদের কাছে করা পাপের বিষয়ে গর্ব করে। যেহেতু তারা অন্যদেরকে খারাপ কাজ করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করে, অন্যদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদের দোষগুলি প্রকাশ করে, এই হাদিসের বিরোধী নয়। কিংবা এই ব্যক্তিকে এই দুষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার বিনিময়ে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন, যা সুনানে ইবনে মাজাহ নং 2546-এ পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে। সঠিক কারণে।

# আনাস বিন মালিক (রাঃ) - ২

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে যখনই একটি গাছ দু'জন সাহাবীকে পৃথক করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের ভ্রমণের সময়, তারা গাছটি অতিক্রম করার সাথে সাথে একে অপরকে শান্তির ইসলামী অভিবাদন দিয়ে অভিবাদন জানাত। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 505- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 12 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের মধ্যে পাওয়া একটি ভাল গুণের পরামর্শ দিয়েছেন। যথা, চেনা ও অপরিচিত লোকেদের কাছে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভাল বৈশিষ্ট্যের উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকাল মুসলমানরা প্রায়শই কেবল তাদের চেনেন তাদের কাছে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেয়। এটি সবার কাছে ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মানুষের মধ্যে ভালবাসার দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করে। প্রকৃতপক্ষে, এই বৈশিষ্ট্যটি সহীহ মুসলিম, 194 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

একজন মুসলমানের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তারা অন্যদের কাছে প্রসারিত শান্তির প্রতিটি শুভেচ্ছার জন্য ন্যূনতম দশটি পুরষ্কার পাবে এমনকি

অন্যরা তাদের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেও। সুনানে আবু দাউদ, 5195 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত শান্তির ইসলামী অভিবাদনকে সঠিকভাবে পূরণ করা উচিত অন্যদের প্রতি তাদের অন্যান্য বক্তৃতা ও কর্মে এই শান্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রেখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুসলমান এবং মুমিনের সংজ্ঞা।

# আনাস বিন মালিক (রাঃ) - ৩

মসজিদে নামাযের আযান শোনার পর, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত ছোট ছোট পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। তিনি পরে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি মসজিদে তার পদক্ষেপের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এইভাবে হেঁটেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 3, পৃষ্ঠা 146- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনটি কাজের পরামর্শ দিয়েছেন যা গুনাহ মুছে দেয়। এই কর্মগুলির মধ্যে একটি হল জামাতের নামাজের জন্য মসজিদের দিকে হাঁটা।

জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে অনেক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা অনেক হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 2119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি বাড়িতে অজু করে এবং জামাতে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে রওয়ানা হয় তার গুনাহ মাফ হবে বা তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তাদের মর্যাদা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। . ফেরেশতারা তাদের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে যতক্ষণ তারা তাদের অযু না ভঙ্গ করে মসজিদের ভিতরে থাকবে এবং অন্যদের জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে। অবশেষে, তারা এমন একজন হিসাবে রেকর্ড করা হবে যিনি সালাত আদায় করছেন যতক্ষণ না তারা জামাতে নামাজ শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই একই হাদিস পরামর্শ দেয় যে জামাতে নামাজ বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে করার চেয়ে 25 গুণ বেশি সওয়াব।

সহীহ বুখারী, 2891 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করার প্রতি যে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা দাতব্য হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

যারা অন্ধকারে জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে হেঁটে যায় তাদের জন্য কেয়ামতের দিন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পূর্ণ আলোর সুসংবাদ দিয়েছেন। এটি সকাল এবং সন্ধ্যার ফরজ নামাজকে বোঝায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 780 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

জামাতে নামায পড়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, যে ব্যক্তি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত নিয়মিত এতে অংশ নেয়নি তাকে মুনাফিক বলে গণ্য করেছে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 850 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১

একদল লোক একবার আলী ইবনে আবু তালিবকে বলেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এত সহানুভূতিশীল শিক্ষাদানকারী কাউকে তারা কখনই চিনেন না। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 556-557- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে

সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

*“অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."*

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

*"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"*

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

## আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- ২

আলী ইবনে আবু তালিব একবার বলেছিলেন যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং যা হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে গণ্য করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 556-557- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি নির্দেশ করে যে, আবদুল্লাহ (রা) পবিত্র কুরআনের অধিকার পূরণ করেছেন।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

*"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"*

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-3

আলী ইবনে আবু তালিব একবার বলেছিলেন যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিশ্বাসের গভীর উপলব্ধি এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 556-557- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

## আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৪

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর জিহ্বাকে ধরেছিলেন এবং ভাল কথা বলার জন্য আদেশ করেছিলেন যাতে এটি সওয়াব অর্জন করে এবং মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকে যাতে এটি নিরাপত্তা লাভ করে এবং অনুশোচনা এড়ায়। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে একজন ব্যক্তির বেশিরভাগ পাপ তাদের জিহ্বা থেকে উদ্‌ভূত হয়। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 642- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 4 আন নিসা, 114 শ্লোকের সাথে সংযুক্ত:

*"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।*

এই আয়াতে মহান আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন যে, অন্যদের সাথে কথা বলার সময় মানুষের কীভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তারা নিজের এবং অন্যদের জন্য উপকৃত হয়। প্রথমটি হল যখন মুসলমানরা একত্রিত হয় তখন তাদের আলোচনা করা উচিত কিভাবে অন্যদের উপকার করা যায় যা সম্পদ এবং শারীরিক সাহায্যের আকারে দাতব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি একজন মুসলিম একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় না থাকে তবে এটি তাদের সাহায্য

করার সমান পুরস্কার অর্জনের একটি চমৎকার উপায়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6800, পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যকে ভাল কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে যেন সে নিজেই ভাল কাজ করেছে। যদি কেউ অসুবিধায় কাউকে সাহায্য করতে না পারে বা অন্যকে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে না পারে তবে তারা অন্তত অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা ফেরেশতাদের প্রার্থনাকারীর জন্য প্রার্থনা করতে বাধ্য করে। সুনান আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই মানসিকতা দলটিকে অভাবী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে যা তাদের মানসিক সহায়তা প্রদান করে। এটি একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে এবং তাদের কষ্ট মোকাবেলা করার সময় তাদের শক্তির একটি নতুন মোড প্রদান করে। লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে যখন কেউ একজন অভাবী ব্যক্তির পরিস্থিতি উল্লেখ করে তখন তাদের উদ্দেশ্য তাদের প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করা উচিত। সময় কাটানোর জন্য এবং তাদের উপহাসের লক্ষ্যে পরিণত করা কখনই উচিত নয়।

আশীর্বাদ লাভের দ্বিতীয় উপায় হল যখন কেউ বৈধ কোন বিষয়ে কথা বলে যা ইহকাল বা পরকালে কারো উপকারে আসে। এই দিকটির মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো কাজ করার এবং মন্দ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া।

এই আয়াতে উল্লিখিত তৃতীয় দিকটি হল একটি গঠনমূলক মানসিকতার সাথে অন্যদের সাথে কথোপকথন করা যা মানুষকে ধ্বংসাত্মক মানসিকতার অধিকারী করার পরিবর্তে ইতিবাচক উপায়ে একত্রিত করে যা সমাজের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। যদি একজন ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসার উপায়ে একত্রিত করতে না পারে তবে তারা ন্যূনতম যা করতে পারে তা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না। এমনকি

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হলে এটি একটি ভাল কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এটি সহীহ বুখারী, 2518 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই বিরোধী মুসলমানের মধ্যে মিলন স্বেচ্ছায় নামায ও রোযার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সমাজের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি ভালো জিনিসই ছিল এই ধার্মিক মনোভাবের ফল যেমন স্কুল, হাসপাতাল ও মসজিদ নির্মাণ।

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজন মুসলমান তখনই এই আয়াতে উল্লিখিত মহান পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করবে। প্রতিটি ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নয় তাদের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে পুরস্কৃত করা হবে। এটি সহীহ বুখারী, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অকৃত্রিম মুসলিম দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে যে তারা তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-৫

আবদুল্লাহ, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষকে অবশ্যই সাহাবীদের অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, কারণ মুসলিম জাতির মধ্যে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় সবচেয়ে ধার্মিক, তাদের জ্ঞান সবচেয়ে গভীর, তারা সবচেয়ে কম দাম্ভিক, তারা দৃষ্টান্তে সবচেয়ে অবিচল এবং তাদের ধর্মীয় অবস্থা সবচেয়ে ভালো। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করেছেন। মানুষকে অবশ্যই তাদের মূল্য স্বীকার করতে হবে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে কারণ তারা সঠিক পথনির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 289- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত নয় অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অনুসরণ করবে। এই দিনে এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলমান অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অমুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে শুধুমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পালন করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণে অমুসলিমরাও তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ,

অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চা অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৬

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ইসলামের জ্ঞান ও উপলব্ধির কথা উল্লেখ করে একবার লোকেদের বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। এই প্রদীপ (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের মধ্যে থাকতেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৪৪ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক

দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

## আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৭

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে লোকেরা কুরআন তেলাওয়াতকারীকে চিনতে পারে যখন তারা রাত জেগে ইবাদত করে যখন অন্যরা ঘুমিয়ে থাকে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৪৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি প্রদান করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম। আর এটা তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের নিদর্শন। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের

নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

*"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"*

জামে আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সমস্ত মুসলমান তাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে চায়। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা

থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে।

# আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-৮

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন যে লোকেরা যখন স্বেচ্ছায় রোজা পালন করে তখন তারা কুরআন তেলাওয়াতকারীকে চিনতে পারে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৪৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত সমস্ত সৎ কাজ নিজের জন্য করা হয় কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি তা করবেন। সরাসরি পুরস্কৃত করুন।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস হল একটি অনন্য ধার্মিক কাজ কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ শুধুমাত্র তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার

মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

*"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."*

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত ঈমানদার হবে না কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজাও পূর্ণ না করে তাহলে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। সারাজীবন রোজা রাখলেও সওয়াব ও আশীর্বাদ হারিয়ে যায়।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত রোজা সঠিকভাবে তাকওয়া বাড়ে. অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন তারা রোজা রাখে এই অভ্যাসটি শেষ পর্যন্ত তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা সত্ত্বেও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ

থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, সিয়ামের সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবেও রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখা উচিত, এবং এর পরিবর্তে ভাগ্য ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে জানার জন্য নিয়ে আসে, মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন যদিও তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং অন্যদের না জানানো যদি এটি পরিহারযোগ্য হয় কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৯

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে মানুষ কুরআন তিলাওয়াতকারীকে তাদের মতো চিনতে পারে। হয় বেশিরভাগই ভারী হৃদয়ের। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৪৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2315 নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে তিনবার অভিশাপ দিয়েছেন।

সত্যের উপর লেগে থাকা অবস্থায় রসিকতা করা পাপ নয় তবে ধারাবাহিকভাবে করা কঠিন। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঠাট্টা করে সে শেষ পর্যন্ত ছিটকে যাবে এবং পাপপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করবে, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা বা অন্যকে উপহাস করা। অতএব, অতিরিক্ত রসিকতা করা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ যা জামি আত তিরমিযী, 1995 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত রসিকতা করে এমনকি যদি তারা সর্বদা সত্য কথা বলতে পারে এবং কাউকে অসন্তুষ্ট না করে তবে সে আধ্যাত্মিক ব্যক্তির মুখোমুখি হবে। যে রোগ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে ইবনে মাজা, 4193 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়। এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে যে অত্যধিক রসিকতা করে এবং হাসে কারণ এই মানসিকতা দাবি করে যে তারা সর্বদা মজার বিষয় নিয়ে চিন্তা করে এবং আলোচনা করে এবং গুরুতর সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলে। মৃত্যু এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি গুরুতর বিষয় এবং যদি

কেউ সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা এড়িয়ে যায় তবে সে কখনই তাদের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হবে না। এই প্রস্তুতির অভাব তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মৃত্যু ঘটাবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি যত বেশি গুরুত্বের সাথে পরকালের বিষয়ে চিন্তা করবে তত কম তারা হাসবে এবং তামাশা করবে। এটি সহীহ বুখারী, 6486 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অনেক সময় ঠাট্টা করার কারণেও অন্যরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। এটি অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে, যেমন তারা যখন ভাল আদেশ দেয় এবং মন্দ নিষেধ করে তখন গুরুত্বের সাথে না নেওয়া হয় যদিও তা তাদের নিজের সন্তানদের জন্য হয়।

অত্যধিক রসিকতা প্রায়শই মানুষের মধ্যে শত্রুতার দিকে নিয়ে যায় কারণ কেউ সহজেই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে। এর ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং ভেঙে যায়। প্রকৃতপক্ষে, অনেক লোক এমনকি রসিকতার কারণে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আহত হয়েছেন।

উপরন্তু, ঠাট্টা করার সময় উচ্চস্বরে বা পূর্ণ মুখের হাসি এড়ানো উচিত কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, ৬০৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাসি ছিল একটি হাসি।

একজন মুসলমানকে যেকোন মূল্যে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত এমনকি তামাশা করার সময়ও এটি তাদের জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর পেতে পারে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4800 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানকে মোটেই রসিকতা করা উচিত নয়। অন্যান্য পাপ যেমন মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলার সময় সময়ে সময়ে রসিকতা করা গ্রহণযোগ্য, যেমনটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে রসিকতা করেছেন। জামি আত তিরমিযী, 1990 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অতিরিক্ত রসিকতা যা কোন পাপের সাথে সম্পর্কিত হলে এটি অপছন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্যের ভুল ব্যাখ্যা করা পাপ। যদি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সংযুক্ত কোন পাপ না করে কদাচিৎ কৌতুক করেন তাহলে মুসলমানদেরও তা করা উচিত এবং নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

উপরন্তু, মানুষের সাথে প্রফুল্ল হওয়ার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, যেমন হাসি, এবং অতিরিক্ত রসিকতা। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 301 নম্বর হাদিস অনুসারে প্রফুল্ল হওয়া মহান আল্লাহর একটি নিয়ামত। এমনকি অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য হাসি দেওয়াও জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দাতব্য কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। , সংখ্যা 1970। তাই একজনের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে অতিরিক্ত রসিকতা এড়িয়ে যাওয়ার মানে হল যে মানুষ সবসময় দুঃখী এবং বিষণ্ন মেজাজে থাকা উচিত।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১০

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে মানুষ যখন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে চিনতে পারে তখন তারা চুপ থাকে যখন অন্যরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৪৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয় যা জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, সংখ্যা 2314।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার কারণ হবে। উপরন্তু, পাপপূর্ণ

বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে একজনের জীবন থেকে কথার দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যারা খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের কর্ম এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কাজের মূল্যায়ন থেকে বিরত রাখবে যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

পরিশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়শই পার্থিব বিষয় এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১১

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন যে লোকেরা যখন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে চিনতে পারে তখন তারা বিনয়ী হয় যখন অন্যরা অহংকার ও অহংকার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৪৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ের সাথে জীবনযাপন করবে তখন তাকে মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। এটি ঘটে কারণ নম্রতা মহান আল্লাহর দাসত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নম্রতার বিপরীত যা অহংকার শুধুমাত্র মালিকের জন্য, অর্থাৎ আল্লাহ, সর্বোত্তম, কারণ মানুষের যা কিছু আছে তা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং দান করা হয়েছে। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি অহংকার পরিহার করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে নম্রতা প্রদর্শন করে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব এবং উভয় জগতেই প্রকৃত মহিমার দিকে নিয়ে যায়।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১২

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে লোকেরা উচ্চস্বরে নয় বলে কুরআন তেলাওয়াতকারীকে চিনতে পারে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৪৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2018 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অপছন্দের লোকদের উল্লেখ করেছেন এবং বিচার দিবসে কারা তাঁর থেকে দূরে থাকবেন।

এই লোকদের মধ্যে একজন হল উচ্চস্বরে যারা তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে অহংকার ও প্রদর্শন করার জন্য অতিরিক্ত এবং কৃত্রিমভাবে কথা বলে। এই ব্যক্তি অন্যদের দেখাতে চায় যে তারা কতটা জ্ঞান রাখে যার ফলে নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই ব্যক্তি প্রায়শই মহান আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়। এর ফলে তারা তাদের সৎ কর্মের জন্য পুরস্কার হারাবে। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে তাদের বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার পেতে। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১৩

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে মানুষ কুরআন তেলাওয়াতকারীকে চিনতে পারে কারণ তারা তর্কাতীত নয়। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৪৫ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সত্যিকারের মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে এবং তাদের মতামত প্রচার করার জন্য অন্যদের সাথে তর্ক বা তর্ক করা নয়। সত্য প্রচার করার জন্য তাদের পরিবর্তে তথ্য উপস্থাপন করা উচিত। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। যার উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা সে তর্ক করবে না। যে নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করছে কেবল সে-ই করবে। অনেকের বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তিতে জয়লাভ করলে কারো পদমর্যাদা বাড়ে না। উভয় জগতে একজন ব্যক্তির পদমর্যাদা শুধুমাত্র তখনই বৃদ্ধি পায় যখন একজন ব্যক্তি তর্ক করা এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে সত্য উপস্থাপন করে বা তাদের সামনে উপস্থাপন করা হলে তা গ্রহণ করে। একজন মুসলমানের উচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় অন্যদের সাথে পিছিয়ে যাওয়া এড়ানো উচিত কারণ এটি তর্ক করার একটি বৈশিষ্ট্য। তর্ক করা এড়িয়ে চলা জরুরী যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি বাড়ির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তর্ক করা ছেড়ে দেয়। জামি আত তিরমিযী, 1993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটাই সঠিক মানসিকতা যা 16 আন নাহল, আয়াত 125 এ নির্দেশিত হয়েছে:

*"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."*

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তাদের দায়িত্ব মানুষকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা নয়। তাদের কর্তব্য হল সত্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করা কারণ জোরপূর্বক তর্ক করার বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

*"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দিন, [হে মুহাম্মদ]; আপনি শুধুমাত্র একটি অনুস্মারক. আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"*

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১৪

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে যে পরিবার পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে না এবং তা দ্বারা জীবনযাপন করে না, সে একটি পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপের মতো। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 250 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

*"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"*

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১৫

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, প্রকৃত জ্ঞান কতটুকু মুখস্থ করে তারপর বর্ণনা করে তার দ্বারা পরিমাপ করা হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান হল তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 252 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এর মানে হল যে সত্যিকারের জ্ঞানের মধ্যে শেখা এবং দরকারী জ্ঞানের উপর কাজ করা জড়িত।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

*"...অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."*

উপরন্তু, কুফরী হতে পারে ইসলামকে আক্ষরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা কর্মের মাধ্যমে, যার মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করা জড়িত, যদিও কেউ তাকে বিশ্বাস করে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি একজন অসচেতন ব্যক্তিকে অন্য একটি সিংহের কাছ থেকে সতর্ক করা হয় এবং অসচেতন ব্যক্তি নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেয় তবে তারা এমন একজন বলে বিবেচিত হবে যিনি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করেছিলেন কারণ তারা সতর্কতার ভিত্তিতে তাদের আচরণকে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, যদি অসচেতন ব্যক্তি সতর্ক করার পরে কার্যত তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে, তবে লোকেরা সন্দেহ করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সতর্কীকরণে বিশ্বাস করে না এমনকি যদি অসচেতন ব্যক্তিটি তাদের প্রদত্ত সতর্কতায় মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করে।

কিছু লোক দাবি করে যে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য তাদের অন্তরে রয়েছে এবং তাই তাদের বাস্তবিকভাবে এটি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূর্খ মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের অধিকারী যদিও তারা ইসলামের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো অন্তর পবিত্র হয় তখন তার শরীর পবিত্র হয় যার অর্থ তার কর্ম সঠিক হয়। কিন্তু কারো হৃদয় কলুষিত হলে শরীর কলুষিত হয় যার অর্থ তাদের কাজ হবে কলুষিত ও ভুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে সে কখনো বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা বাস্তবিকভাবে তাদের প্রমাণ ও প্রমাণ যা বিচার দিবসে জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকাটা একজন ছাত্রের মতোই নির্বোধ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে তাদের জ্ঞান তাদের মনে আছে তাই তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এটি লিখতে হবে না। নিঃসন্দেহে এই ছাত্রটিও একইভাবে ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে বিচার দিবসে উপনীত হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, যদিও তাদের বিশ্বাস থাকে। তাদের হৃদয়

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১৬

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি এই জীবনে কোন বিচার তাকে প্রভাবিত করেছে তা তিনি চিন্তা করেন না, কারণ এটি হয় ধনী বা দারিদ্র। ঐশ্বর্য পেলে সে করুণা দেখাত। দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে তিনি ধৈর্য্য ধারণ করতেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 259 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য বরকতময়। একমাত্র শর্ত এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে হবে, বিশেষত, অসুবিধায় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হল লোকেরা যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায় সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়। একজন ব্যক্তি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের রেহাই নেই। অতএব, একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতিগুলির উপর চাপ দেওয়া অর্থপূর্ণ নয় কারণ সেগুলি নির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিকটি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয় উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য দেখানো। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এমন পরিস্থিতিতে থাকার জন্য চাপ না দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে

মনোনিবেশ করতে হবে কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলমান উভয় জগতে সফল হতে চায় তবে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাজ করা । উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

এবং কঠিন সময়ে তাদের অবশ্যই ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে জেনে শুনে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যা বেছে নেন, যদিও তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১৭

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, যে ভালো বীজ বপন করে সে শীঘ্রই তাদের ইচ্ছার ফসল কাটবে এবং যে মন্দ বপন করবে সে শীঘ্রই অনুশোচনা করবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৬৬ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উত্তম বীজ বপনের সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

কেউ সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা এই দোয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে

পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্ণতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ১৮

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, মানুষ এই পৃথিবীতে শুধুই মেহমান, অবশেষে মেহমান চলে যাবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৬৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখন লোকেরা, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে, ছুটিতে যায় তারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি প্যাক করে এবং হয়ত একটু অতিরিক্ত কিন্তু তারা অতিরিক্ত প্যাকিং এড়াতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা যে পরিমাণ অর্থ তাদের সাথে নিয়ে যায় তা তারা বিদেশে থাকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে। যখন তারা পৌঁছায় তখন তারা প্রায়ই এমন একটি হোটেলে থাকে যেখানে সাধারণত কিছু অতিরিক্ত জিনিসের সাথে বসবাসের প্রধান প্রয়োজনীয়তা থাকে। যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে একই গন্তব্যে ফিরে আসবে না তারা কখনই একটি বাড়ি কিনবে না কারণ তারা দাবি করবে যে তাদের থাকার সময় কম এবং তারা ফিরে আসবে না। তারা তাদের ছুটির সময় চাকরি পায় না এই দাবি করে যে তারা ছোট থাকে তাই তাদের বেশি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নেই। তারা বিয়ে করে না বা বাচ্চাদের দাবি করে যে ছুটির গন্তব্য তাদের জন্মভূমি নয় যেখানে তারা বিয়ে করবে এবং সন্তান ধারণ করবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি হল ছুটির নির্মাতাদের মনোভাব এবং মানসিকতা।

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা শীঘ্রই এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে যার অর্থ, তারা ছুটিতে থাকার মতোই এই পৃথিবীতে থাকা অস্থায়ী, এবং তারা বিশ্বাস করে যে পরকালে তাদের থাকার স্থায়ী হবে, তারা এর

জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয় না। তারা যদি সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের কাছে ছুটির মতোই স্বল্প সময় আছে, তবে তারা তাদের বাড়িতে খুব বেশি প্রচেষ্টা নিবেদন করবে না এবং পরিবর্তে একটি সাধারণ বাড়িতে সন্তুষ্ট থাকবে যেমন ভ্রমণকারী একটি সাধারণ হোটেলে সন্তুষ্ট। সুতরাং বাস্তবে, এই পৃথিবীটি উদাহরণে ছুটির গন্তব্যের মতো এখনও, মুসলমানরা এটিকে একের মতো বিবেচনা করে না। পরিবর্তে, তারা অনন্ত পরকালকে অবহেলা করে তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা তাদের দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য উৎসর্গ করে। কখনও কখনও বিশ্বাস করা কঠিন যে কিছু মুসলমান প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী পরকালে বিশ্বাস করে যখন কেউ দেখে যে তারা অস্থায়ী জগতের জন্য কতটা প্রচেষ্টা নিবেদন করে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং দুনিয়ার প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার উপদেশ দিয়েছেন সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা যেন এই পৃথিবীকে স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ না করে বরং এর মতো আচরণ করে। একটি ছুটির গন্তব্য।

# আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-১৯

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে মানুষ এই পৃথিবীতে কেবল অতিথি এবং তাদের যা আছে তা কেবল একটি ধার করা আমানত। অবশেষে অতিথি চলে যাবে এবং ধার করা ট্রাস্ট অবশ্যই তার সঠিক মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৬৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন তা উপহার নয় বরং ঋণ। একটি উপহার মালিকানা নির্দেশ করে যেখানে একটি ঋণ মানে আশীর্বাদ অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক অর্থাৎ মহান আল্লাহকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই জড় জগতের নিয়ামত, যা মানুষকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে, তা ফেরত দেওয়ার একমাত্র উপায় হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, এটি তাঁকে ভয় করার একটি দিক। এটি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করে যার ফলস্বরূপ উভয় জগতের আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."*

পার্থিব নিয়ামত যা মানুষকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক ফেরত দিতে হবে। যদি

তা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা অনেক সওয়াব পাবে কিন্তু যদি তা জোরপূর্বক ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে, তাহলে এই নিয়ামত আখেরাতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

পক্ষান্তরে, একজন মুসলমান জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে অর্থ, তাদেরকে এর মালিকানা উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। এই কারণেই মুসলিমরা জান্নাতে যা খুশি তা করতে স্বাধীন থাকবে কারণ তাদেরকে এর মালিকানা দেওয়া হবে।

মুসলমানদের জন্য উপহার/মালিকানা এবং ঋণের মধ্যে পার্থক্য বোঝা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা এই বস্তুগত জগতের আশীর্বাদগুলোকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়।

## আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ২০

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তির উচিত সত্য ও ন্যায়বিচার গ্রহণ করা, যদিও তারা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে আসে এমনকি তারা যে কাউকে চিনতে পারে না বা এমনকি তাদের অপছন্দের কাছ থেকেও আসে। এবং তাদের মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত, এমনকি যদি এটি তাদের প্রিয় ভাইবোনের কাছ থেকে আসে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৬৮ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের বিদায়ের পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যৌক্তিক যে একটি দলে যত বেশি লোকের সংখ্যা বেশি হবে সেই দলটি তত শক্তিশালী হবে কিন্তু মুসলিমরা এই যুক্তিকে কোনো না কোনোভাবে অস্বীকার করেছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম জাতির শক্তি কমেছে। এটি হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2 এর সাথে সংযুক্ত:

*"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."*

মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো ভালো বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কোনো বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন না করতে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এটিই করেছে কিন্তু অনেক মুসলমান তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক মুসলমান এখন তারা কী করছে তা দেখার পরিবর্তে কে একটি কর্ম করছে তা পর্যবেক্ষণ করে। যদি ব্যক্তিটি তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে, উদাহরণস্বরূপ, একটি আত্মীয়, তারা তাদের সমর্থন করে যদিও জিনিসটি ভাল না হয়। একইভাবে, যদি ব্যক্তির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক না থাকে তবে জিনিসটি ভাল হলেও তারা তাদের সমর্থন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মনোভাব ধার্মিক পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এটি করছে তা নির্বিশেষে তারা ভালভাবে অন্যদের সমর্থন করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর আমল করতে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা এমনকি তাদের সমর্থন করবে যেগুলিকে তারা মেনে নিতে পারেনি যতক্ষণ না এটি একটি ভাল জিনিস ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল যে অনেক মুসলমান একে অপরকে ভালোভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে সে তাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় করে যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং তারা যাদের সাহায্য করবে তারা সমাজে আরও সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয়, ততক্ষণ অন্যদের ভাল কাজে সহায়তা করা সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে আনবেন যদিও তাদের সমর্থন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তখন উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজেই খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এবং তাঁর পক্ষে প্রচুর সমর্থন

পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, আবু বক্কর সিদ্দিককে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর বিন খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি যদি অন্য ব্যক্তিকে সমর্থন করেন তবে সমাজ তাকে ভুলে যাওয়ার চিন্তা করতেন না। তিনি পরিবর্তে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের আদেশ পালন করেছেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছেন। সহীহ বুখারি নম্বর 3667 এবং 3668 তে পাওয়া হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্মান ও সম্মান কেবলমাত্র এই কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সচেতন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট।

মুসলমানদের অবশ্যই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং যারাই এটি করছে তা নির্বিশেষে অন্যদের ভালো করতে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং তাদের সমর্থন তাদের সমাজে বিস্মৃত হওয়ার ভয়ে পিছপা হবে না। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো বিস্মৃত হবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতেই তাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ২১

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, একবার তাঁর সাহাবীদের বললেন, যদিও তারা রোজা রাখে, নামায পড়ে এবং (কিছু) সাহাবীদের চেয়ে বেশি অধ্যয়ন করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তবুও তারা তাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন। এর কারণ এই যে, তারা তাদের চেয়ে এই দুনিয়ার প্রতি কম অনুরক্ত ছিল এবং তারা তাদের চেয়ে আখেরাতের প্রতি বেশি আকাঙ্ক্ষিত ছিল। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৭৮ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি অবলম্বন করলেই কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করবে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং

বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

## আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- 22

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, কিয়ামতের দিন আফসোস করা সবচেয়ে খারাপ দুঃখ। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখনই তারা কোন ধরনের পার্থিব ব্যর্থতা বা অনুশোচনার সম্মুখীন হয় তখনই তাদের আখেরাতের অনুশোচনার কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, যেমন ৪9 আল ফজর, 24 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

*"সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"*

এই পৃথিবীতে একজনের অনুশোচনা সর্বদা অন্য একটি সুযোগ বা অন্য বিকল্প দ্বারা অনুসরণ করা হবে যা তারা আবার সাফল্য অর্জনের জন্য অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু পরকালের অনুশোচনা ও ব্যর্থতা এমন একটি বিষয় যার অর্থ সংশোধন করা যায় না, পরকালের দ্বিতীয় কোনো সম্ভাবনা নেই। ভিন্নভাবে কাজ করার জন্য কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ পাবে না।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত দুনিয়ার ব্যর্থতা ও অনুশোচনার কারণে আখেরাতে যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে পারে তা নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে এই পৃথিবীতে বৈধ সাফল্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের সর্বদা দুনিয়ায় সাফল্য লাভের চেয়ে পরকালে সাফল্য অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিকতা যা মুসলমানদের এমন একটি দিনে পৌঁছানোর আগে গ্রহণ করা উচিত যেখানে তাদের ব্যর্থতা এবং অনুশোচনার প্রতিফলন তাদের সামান্যতম সাহায্য করবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

*"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"*

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- 23

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, পরকালের জন্য সর্বোত্তম বিধান হল তাকওয়া। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

*"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."*

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয়। এ

কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

# আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- 24

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, অন্তরে আঁকড়ে ধরা সর্বোত্তম জিনিস হল দৃঢ়তা। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমানের ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয়। যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমানের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলমান বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণরূপে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

*"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"*

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং

জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ২৫

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে সবচেয়ে খারাপ অন্ধত্ব হল (আধ্যাত্মিক) হৃদয়। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের কলুষতা এবং কঠোরতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সহীহ বুখারি, 52 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয় তখন পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায়। এই দুর্নীতি তখন একজনের কথা ও কাজে প্রতিফলিত হয়। একইভাবে, পবিত্র কোরান কোমল ও সুস্থ হৃদয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেছে এই পরামর্শ দিয়ে যে কেউ বিচার দিবসে তাদের সম্পদ বা আত্মীয়দের থেকে উপকার লাভ করবে না যদি না তারা একটি সুস্থ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী হয়। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

*"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"*

কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং বিশ্বাস করে যে তারা জ্ঞানে উচ্চতর। তাদের মধ্যে আত্মসমর্পণ এবং

মহান আল্লাহর ভয়ের অভাব রয়েছে, যা সৎকাজ পরিত্যাগ, পাপ, অত্যধিক ভালবাসা এবং জড় জগতের জন্য সংগ্রাম করার দিকে নিয়ে যায় এবং অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য উদাসীন থাকে। কঠিন হৃদয়ের লোকেরা সহজেই শয়তান দ্বারা পাপ করতে এবং ভাল কাজগুলিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রভাবিত হয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 53:

*"[তা হল] যাতে তিনি শয়তান যা নিক্ষেপ করে [অর্থাৎ দাবী করে] তা তাদের জন্য পরীক্ষায় পরিণত করতে পারেন যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং যারা কঠিন হৃদয়..."*

কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি দ্বারা দুটি নির্দিষ্ট দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হয়। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে খ্যাতি অর্জনের মতো তাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণের জন্য ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের অপব্যাখ্যা করে। তারা তাদের সমালোচনা করে যারা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য মেনে চলার চেষ্টা করে, কারণ তারা চায় মানুষ তাদের চিন্তাভাবনা অনুসরণ করুক এবং বস্তুগত জগতের প্রতি প্রেম করুক। দ্বিতীয়টি হল যে তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আয়াত এবং হাদিস বেছে নেয়। তারা যারা সমস্ত আয়াত ও হাদিস গ্রহণ ও আমল করার চেষ্টা করে তাদেরকে চরমপন্থী বলে আখ্যা দেয় যার ফলে তাদের নিজস্ব মনোভাব অন্যদের কাছে আনন্দদায়ক বলে মনে হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 13:

*“অতএব তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমরা তাদের অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের হৃদয়কে কঠোর করে দিয়েছি। তারা তাদের [যথাযথ] স্থান [অর্থাৎ, ব্যবহার] থেকে শব্দ বিকৃত করে এবং যে বিষয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার*

*একটি অংশ ভুলে গেছে। এবং আপনি এখনও তাদের মধ্যে প্রতারণা লক্ষ্য করবেন, তাদের কয়েকজন ছাড়া..."*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যারা মহান আল্লাহকে উল্লেখ না করে অতিরিক্ত কথা বলে , তারা আধ্যাত্মিক কঠোর হৃদয় গ্রহণের প্রবণতা পোষণ করে। যে ব্যক্তি কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী সে মহান আল্লাহ থেকে দূরে থাকে। জামি আত তিরমিযী, 2411 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করে, যার মধ্যে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত, তারা কঠোর হৃদয়ে অভিশপ্ত হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 13:

*"অতএব তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমরা তাদের অভিশাপ দিয়েছিলাম এবং তাদের হৃদয়কে কঠোর করে দিয়েছিলাম ..."*

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত হাসে সে কঠিন হৃদয়ে পরিণত হবে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে কেউ হাসতে পারে না কারণ এটিকে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা দাতব্য কাজ হিসাবে

শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। জামি আত তিরমিযী, 1970 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতিরিক্ত হাসলে এমন একটি মানসিকতা গ্রহণ করা হয় যেখানে তারা কেবল মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এটি মৃত্যু এবং বিচার দিবসের মতো গুরুতর সমস্যাগুলি এড়াতে পারে। যদি কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে তবে তারা কীভাবে তাদের জন্য প্রস্তুত হতে পারে? প্রস্তুতির অভাব একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে কঠিন হয়ে উঠবে।

কেউ কেউ বলেন অতিরিক্ত খাওয়া আধ্যাত্মিক হৃদয়ের কঠোরতা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে একজন অলস হয়ে যায়। অলসতা ভাল কাজের হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে যা আধ্যাত্মিক হৃদয়কে কঠিন হতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, 3334 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, যখন একজন ব্যক্তি পাপ করলে তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। পাপের সংখ্যা বাড়লে এই কালোত্ব বাড়ে যা কঠিন আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

*"না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।"*

এই কারণেই বলা হয়েছে যে ক্রমাগত পাপ করা আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

মুসলমানদের জন্য তাদের হৃদয়কে কোমল করার চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তার শুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরামর্শ অনুযায়ী, যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পবিত্র হয়ে যায়। এই পরিশুদ্ধি একজনকে সৎ কাজ করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাপ পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করবে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ২৬

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে নেশা হচ্ছে প্রতিটি মন্দের উৎস। এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ইমাম আল আসফাহানীর, হিলিয়াত আল আউলিয়া, সংখ্যা ২৮৯।

সুনানে ইবনে মাজা, 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একজন মুসলমানকে কখনই অ্যালকোহল সেবন করা উচিত নয় কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে । এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি যেমন এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তারা তাদের শরীরের ক্ষতি করে যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যেমন তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

*"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"*

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করার বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, 68 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া জান্নাত লাভের চাবিকাঠি। তবুও, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মুসলমানদের পরামর্শ দেয় যে নিয়মিত মদ পান করে এমন কাউকে সালাম না করার জন্য।

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদীসে দশটি ভিন্ন কোণ থেকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এতে অ্যালকোহল নিজেই অন্তর্ভুক্ত, যিনি এটি তৈরি করেন, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি ক্রয় করে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি

পান করে এবং যে এটি ঢেলে দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত কিছু নিয়ে কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ২৭

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে কান্নাকাটি একটি পৌত্তলিক কাজ। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা, কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা এবং কষ্টের সময়ে অনুরূপ কাজ করা, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যুতে করা একটি বড় পাপ।

এটি প্রমাণকারী অনেক হাদিস রয়েছে যেমন সুনানে আবু দাউদ , 3128 নম্বরে পাওয়া যায়, যেখানে দুঃখের সময় কান্নাকাটিকারীকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে তারা মৃত ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রকাশ করেনি যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য প্রকাশ্যে কান্নাকাটি করে। এটি আসলে একটি দ্বিগুণ পাপ কারণ তারা দুঃখের সময় বিলাপ করে যা একটি বড় পাপ কিন্তু তারা এটি অন্যদের কাছে দেখানোর জন্যও করে যা অন্য পাপ।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে কষ্টের সময়ে কান্না করা অনুমোদিত নয় , যেমন প্রিয়জনকে হারানো । এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ নম্বর 3126-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায় তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নাতি যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্নার জন্য বা তাদের হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে তারা যদি পছন্দের বিষয়ে তাদের অধৈর্যতা দেখিয়ে শব্দ উচ্চারণ করে তবে তারা শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে মহান আল্লাহ।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হারাম জিনিসগুলি হল কান্না, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা দুঃখে মাথা ন্যাড়া করা । যারা এইভাবে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর সতর্কবাণী। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। এইভাবে কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে যদি মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয় তবে তারাও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে

মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 18:

*"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না..."*

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ২৮

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, একজন মুমিনের সম্পত্তির পবিত্রতা তাদের জীবনের মতোই পবিত্র। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ৬৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি ও সম্মান পবিত্র।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় যে, সফলতা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ আল্লাহর অধিকার, যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট ভাল নয়।

একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলমান সেই ব্যক্তি যে নিজের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের জন্য তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে অন্যদের ক্ষতি না করা জরুরী।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যের সম্পত্তিকে সম্মান করতে হবে এবং অন্যায়ভাবে সেগুলি অর্জন করার চেষ্টা করবেন না, উদাহরণস্বরূপ, একটি আইনি মামলায়। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিস, 353 নম্বরে সতর্ক করা হয়েছে যে যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে জাহান্নামে যাবে, যদিও তাদের অর্জিত জিনিসটি একটি গাছের ডালের মতো নগণ্য হয়। মুসলমানদের উচিত অন্যের সম্পত্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা এবং তাদের মালিককে খুশি করার উপায়ে ফিরিয়ে দেওয়া।

গীবত বা অপবাদের মতো কাজ বা কথার মাধ্যমে একজন মুসলমানের সম্মান লঙ্ঘন করা উচিত নয়। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে, কারণ এটি তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, অন্যেরা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে অন্যের নিজের, সম্পত্তি বা সম্মানের প্রতি অন্যায় করা এড়াতে হবে। যেমন একজন নিজের জন্য এটি পছন্দ করে তাদের অন্যদের জন্য এটি পছন্দ করা উচিত এবং তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা উচিত। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত মুমিনের চিহ্ন।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ২৯

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যে অন্যের গুনাহ মাফ করে দেয়, মহান আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই

নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"*

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৩০

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাদের রাগকে গ্রাস করবে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেবেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ উপকারী হতে পারে উদাহরণস্বরূপ, আত্মরক্ষায় । এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল একজন ব্যক্তির উচিত তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে এটি তাকে পাপের দিকে নিয়ে না যায়। উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

প্রথমত, এই উপদেশ এমন সব ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজনকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য। এই হাদিসটিও ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তি তার রাগ অনুযায়ী কাজ করবে না। পরিবর্তে, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার

জন্য তাদের নিজেদের সাথে লড়াই করা উচিত যাতে এটি তাদের পাপের দিকে নিয়ে না যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 134:

*"...যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"*

ইসলামের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, রাগ শয়তানের সাথে যুক্ত এবং অনুপ্রাণিত হওয়ায় সহীহ বুখারি, 3282 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন ক্ষুব্ধ মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সেজদা করবে। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি একজন নিষ্ক্রিয় শরীরের অবস্থান নেয় ততই তাদের রাগ করার সম্ভাবনা কম। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উপদেশের উপর কাজ করা একজনকে তাদের রাগকে নিজের মধ্যে বন্দী করার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না এটি চলে যায় যাতে এটি অন্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না করে।

একজন মুসলমান যে রাগান্বিত হয় তার উচিত সুনানে আবু দাউদ, 4784 নম্বরে পাওয়া হাদিসে দেওয়া উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাগান্বিত মুসলমানকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হল জল ক্রোধের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে কাউন্টার করে, তাপ। যদি কেউ তখন প্রার্থনা করে তবে এটি তাদের রাগকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি মহান পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে।

এ পর্যন্ত আলোচনা করা পরামর্শ একজন রাগান্বিত মুসলমানকে তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কারো কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাগ হলে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শব্দগুলি প্রায়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অন্যদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। রাগের মাথায় বলা কথার কারণে অগণিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে। এই আচরণ প্রায়ই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলমানের জন্য সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান গুণ এবং যে ব্যক্তি এটি আয়ত্ত করে তাকে সহীহ বুখারি, 6114 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্রোধ, অর্থ, তারা তাদের ক্রোধের কারণে কোন পাপ করে না, তাদের অন্তর শান্তি ও সত্য বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4778 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র হৃদপিণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একমাত্র হৃদয় যা কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88 এবং 89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আগেই বলা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ উপকারী হতে পারে। এটি নিজের নফস, বিশ্বাস এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত যা সঠিকভাবে করা হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ হিসাবে গণ্য হয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা, যিনি কখনো নিজের কামনা-বাসনার জন্য রাগান্বিত হননি। তিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন, যা সহীহ মুসলিম, 6050 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহীহ মুসলিম, 1739 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তা নিয়ে খুশি হবেন এবং যা রাগান্বিত হবে তাতে রাগান্বিত হবেন।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু এই রাগ যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা দোষারোপযোগ্য হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হলেও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুনান আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 4901 নম্বর, এমন একজন উপাসককে সতর্ক করে যে ক্রোধের সাথে দাবি করে যে আল্লাহ, মহান, একটি নির্দিষ্ট পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। ফলস্বরূপ এই উপাসককে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং বিচারের দিনে পাপীকে ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উত্স চারটি জিনিস নিয়ে গঠিত: নিজের ইচ্ছা, ভয়, খারাপ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদীসের উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের চরিত্র ও জীবন থেকে এক চতুর্থাংশ মন্দতা দূর করবে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, তাই এটি তাদের এমনভাবে কাজ বা কথা বলে না যা তাদের এই দুনিয়া এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়।

# আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৩১

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, উপার্জনের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল সুদ (আর্থিক সুদ) থেকে সৃষ্ট সম্পদ। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আর্থিক সুদ সেই পরিমাণকে বোঝায় যা একজন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদের একটি নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় অনেক ধরনের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল যে বিক্রেতা একটি নিবন্ধ বিক্রি করেছিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল, এই শর্তে যে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু নিবন্ধের দাম বাড়িয়ে দেবে। আরেকটি হল যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি পরিমাণ অর্থ ধার দেন এবং শর্ত দেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপটি ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সুদের হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সময়ে সুদের হার বাড়বে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য এই ধরনের লেনদেন।

যারা এটি বিশ্বাস করে তারা বৈধ বিনিয়োগ এবং আর্থিক স্বার্থ থেকে অর্জিত লাভের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যদি

ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ হালাল হয় তবে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন হারাম বলে গণ্য হবে? তারা যুক্তি দেয় যে একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে এর থেকে লাভ করে। এমন পরিস্থিতিতে কেন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ পরিশোধ করবেন না? তারা চিনতে ব্যর্থ হয় যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনো উদ্যোগই লাভের পরম গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটা ঠিক নয় যে একা অর্থদাতাকে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির যে কোনও সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটা ন্যায়ের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনো নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না যেখানে তাদের সম্পদ ধার দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা আইটেম থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা আইটেম তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায়সঙ্গতভাবে ঘটে না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের দেওয়া ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ধার করা তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি যদি ধার করা তহবিল প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোন লাভ হবে না। এমনকি যদি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তবে একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়েরই সুযোগ থাকে। তাই একটি সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির লাভ এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ ব্যবসা আর্থিক সুদের সমান নয়।

উপরন্তু, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদ যেভাবে কাজ করে তার কারণে ঋণ পরিশোধ করার পরেও তাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পরিমাণ প্রায়ই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক চাপ অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরনের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরা আরও ধনী হয় যখন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও বাহ্যিকভাবে আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করলে একজন ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি অনেক রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভাল এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা অর্জন করতে পারত যদি তারা আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার কারণে তারা তাদের মূল্যবান বেআইনি সম্পদ ব্যয় করতে পারে যার ফলে তাদের আনন্দদায়ক উপায়ে এটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে ততই তাদের লোভ অর্থে পরিণত হয়, তাদের পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারা দিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য বিষয়ে যাবে এবং তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা হালাল ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে থাকা অনুগ্রহ হারিয়েছে। এমনকি এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও

বেআইনি সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আখেরাতের ক্ষতি আরো সুস্পষ্ট। হাশরের দিন তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ হারামের মধ্যে নিহিত কোনো ভালো কাজ যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান করা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কোথায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিত লাগে না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পূর্বেরটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে পরেরটি তার পতনের দিকে নিয়ে যায়। স্বভাবগতভাবে স্বার্থ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। এটি সম্পদের পূজার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে সহানুভূতি ও ঐক্য বিনষ্ট করে। সুতরাং এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দাতব্য হল উদারতা এবং করুণার ফলাফল। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার কারণে সমাজের ইতিবাচক বিকাশ ঘটবে যার ফলে সবাই উপকৃত হবে। এটা স্পষ্ট যে, যদি এমন একটি সমাজ থাকে যার ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে তাদের লেনদেনে স্বার্থপর হয়, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সরাসরি বিরোধী হয়, সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর নির্ভর করে না। এমন সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবর্তে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাড়তে বাধ্য।

উপসংহারে বলা যায়, মানুষ যখন তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করবে এবং তারপর তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ দিয়ে দাতব্য উপায়ে ব্যয় করবে বা পারস্পরিকভাবে বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেবে তখন

এমন সমাজে ব্যবসা, শিল্প ও কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং সেখানে উৎপাদন অনেক বেশি হবে সেই সমাজের তুলনায় যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সংকুচিত হয়।

## আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৩২

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে, সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে অন্যের দুর্ভাগ্যের পেছনের কারণের দিকে খেয়াল রাখে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের নিজেদের পার্থিব বিষয়ে খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটছে এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী কারণ এটি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা ফলস্বরূপ একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন তখন তাদের কেবলমাত্র প্রার্থনা করা হলেও, তাদের যে কোন উপায়ে তাদের সাহায্য করা উচিত নয়, তবে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি চিন্তা করা উচিত এবং বুঝতে হবে যে তারাও শেষ পর্যন্ত তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারাবে। একটি অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যু দ্বারা। এটি তাদের তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাবে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি।

যখন তারা একজন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখেন তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য দুঃখ বোধ করা উচিত নয় বরং তারা বুঝতে পারে যে

একদিন তাদের অজানা তারাও মারা যাবে। তাদের বোঝা উচিত যে ধনী ব্যক্তিকে যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার তাদের কবরে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তারাও তাদের কবরে কেবল তাদের কৃতকর্ম নিয়েই থাকবে। এটি তাদের কবর ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব একজন পর্যবেক্ষণ করে এমন সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত। একজন মুসলমানের উচিত তাদের চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

*"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""*

যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং যারা তাদের পার্থিব জীবনে খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা উদাসীন থাকবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৩৩

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, যে ব্যক্তি প্রতিকূলতার মূল্য জানে সে তা বহন করবে এবং যে তা বোঝে না সে তাদের পেছনের কারণ নিয়ে প্রশ্ন করবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

*"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টার [1- এ থাকে যা] আমরা এটিকে সৃষ্টি করার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."*

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলমানের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে আফসোস করা উচিত নয়

যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তান তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে। একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থেই বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না। অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলমানকে বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ তৃপ্তি।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর কাজ করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি অবস্থাই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল বা সন্তুষ্ট আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ও সিদ্ধান্তে, সহজ ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং

উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলমান কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

*“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"*

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে আচরণ করা, যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করবে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তেতো ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জেনে তাদের গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান তাদের যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবেন।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি পর্যালোচনা করা, যা ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে দেওয়া পুরস্কারের বিষয়ে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা একজন মুসলিমকে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সময় অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের উৎকর্ষ হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

*"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"*

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন একজন কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবে না যার ভয় ছিল, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

# আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-৩৪

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে দ্বীনের সর্বোত্তম অংশ হল যখন একজন ব্যক্তি কখনই মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে বঞ্চিত হয় না। ইমাম বায়হাকির জুহদ আল কাবীর, ৮২৬- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তির মতো। একটি মৃত ব্যক্তি।

মুসলমানদের জন্য যারা মহান আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে চায়, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে যতটা সম্ভব সফলভাবে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে তার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাকে স্মরণ করবে ততই তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবে।

মহান আল্লাহর স্মরণের তিনটি স্তরে কার্যত আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। প্রথম স্তর হল মহান আল্লাহকে অন্তরে ও নীরবে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বন্ধন দৃঢ় করার সর্বোচ্চ ও কার্যকরী উপায় হল

কার্যতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা। তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। এর জন্য একজনকে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ ও সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুই স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে পুরষ্কার পাবে কিন্তু তারা আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৩৫

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি জান্নাত কামনা করে, তবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের সমালোচনাকে ভয় করা উচিত নয়। ইমাম বায়হাকির জুহদ আল কাবীর, ৮২৬- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং

মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৩৬

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, এমন একটি গুণ যা জান্নাতে নিয়ে যায় যখন প্রকাশ্যে তার ভালো কাজগুলো গোপনীয়তার মতোই হয়। ইমাম বায়হাকির জুহদ আল কাবীর, ৮২৬- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2347 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর প্রকৃত বন্ধু সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা, প্রকাশ্যে ও গোপনে। একান্তে এটি করা একজন ব্যক্তির মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়, যার অর্থ, তারা কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। এই সেই ব্যক্তি যে দৃঢ়ভাবে মনে রাখে যে তারা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের সত্তার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিকগুলি সর্বদা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। যদি কেউ এই বিশ্বাসের উপর অটল থাকে তবে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করবে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ তারা কাজ করে, যেমন সালাত আদায় করা, যেন তারা মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাদের দেখছে। এটি সৎকাজকে উৎসাহিত করে এবং পাপ থেকে বিরত রাখে।

## আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-37

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মানুষকে অন্তরের বিদ্বেষ থেকে সাবধান হতে সতর্ক করেছিলেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ২/২০৭- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4860 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার বিরুদ্ধে লোকদের সতর্ক করেছেন কারণ এটি মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এটা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যায়। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি সবচেয়ে বড় অভিযোগ, যেমন বাবা-মা প্রায়ই থাকে। তারা ভাবছে কেন তাদের সন্তানরা আলাদা হয়ে গেছে যদিও তারা একসময় দৃঢ়ভাবে একসাথে ছিল।

আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল কারণ কেউ একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছে। এটি প্রায়শই পরিবারের সদস্য দ্বারা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার অন্য সন্তানের কাছে তার ছেলে সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবেন। এতে দুই আত্মীয়ের মধ্যে শত্রুতা বাড়ে এবং সময়ের সাথে সাথে তা গড়ে ওঠে এবং উভয়ের মধ্যে

ফাটল সৃষ্টি করে। যারা এক সময় একজনের মতো ছিল তারা একে অপরের অপরিচিতের মতো হয়ে যায়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ ফেরেশতা নয়। খুব অল্প কিছু বাদে, যখন একজন ব্যক্তির কাছে অন্যের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক কথা বলা হয় তখন তারা এটি ঘটতে না চাইলেও তারা এতে প্রভাবিত হবে। এই শত্রুতা এখনও ঘটবে এমনকি যদি প্রাথমিক ব্যক্তি যে কারো আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছিল সে আত্মীয়দের মধ্যে ফাটল তৈরি করতে চায় না। কেউ কেউ প্রায়শই অভ্যাসের বাইরে এইভাবে কাজ করে এবং সম্পর্কের ক্ষতি করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা প্রায়শই এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ুক বা ভেঙে যাক।

এই মনোভাব মানুষের মানসিকতার উপর এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে এটি এমন আত্মীয়দেরও প্রভাবিত করে যারা একে অপরের সাথে খুব কমই দেখা বা কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক জিনিসগুলি উল্লেখ করবে যদিও তার আত্মীয় এমনকি তাদের মতো একই দেশে বাস নাও করতে পারে। এই আচরণ তাদের হৃদয়ে শত্রুতা জাগিয়ে তোলে এবং সময়ের সাথে সাথে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের দূরবর্তী আত্মীয়কে অপছন্দ করে যদিও তারা তাদের খুব কমই জানে।

এই সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে যখন দুজন ব্যক্তি অন্য লোকেদের সামনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যদিও, তারা তাদের সন্তানদের সরাসরি কিছু বলছে না,

এটি এখনও তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যদি কেউ সত্যিই এক মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয় তবে তারা বুঝতে পারবে যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ অসুস্থ অনুভূতি সেই ব্যক্তি যা করেছে বা তাদের সরাসরি বলেছে তার কারণে হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি একটি তৃতীয় পক্ষের কারণে ঘটেছে যারা তাদের কাছে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু উল্লেখ করেছে।

এমন ক্ষেত্রে যেখানে একজন অন্যকে বিপদের বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করছে, তখন অন্য ব্যক্তিকে নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। যদি কেউ অন্য ব্যক্তিকে একটি পাঠ শেখানোর চেষ্টা করে, উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের একজনকে তাদের ভাইবোনের মতো আচরণ না করতে শেখাতে চান তবে তাদের উচিত মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ব্যক্তির নাম না করে নেতিবাচক জিনিস উল্লেখ করুন। এই সুন্দর মানসিকতার একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির নাম না করে একটি নেতিবাচক জিনিস উল্লেখ করা কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের আত্মীয় বা অন্যদের সম্পর্কে, ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে নেতিবাচক কথা বলার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা। অন্যথায়, তারা ভালভাবে দেখতে পারে যে সময় কাটানোর সাথে সাথে তাদের পরিবার আলাদা হয়ে যায় এবং একে অপরের থেকে মানসিকভাবে দূরে থাকে।

# আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৩৮

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর গজব অর্জন করে মানুষকে খুশি না করা। ইবনুল জাওযীর , সিফাতুল সাফওয়াহ, 1/217- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."*

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহুর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৩৯

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, লোকেরা বক্তৃতা দিতে উত্তম। কিন্তু যার কথা তাদের কাজের সাথে মিলে যায় সেই ব্যক্তিই যার কল্যাণের অংশ রয়েছে। ইবনুল জাওযীর , সিফাতুল সাফওয়াহ, 1/217- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সময় নিজেদের উপদেশের বিরোধিতা করে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপদেশ দিয়ে নেককার পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, অনেকে অন্যান্য কারণে যেমন জনপ্রিয়তা এবং পার্থিব জিনিস লাভের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পণ্ডিত প্রায়শই সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানের স্পটলাইটে থাকার চেষ্টা করে এবং তারা একটি কেন্দ্রীয় আসনের আকাঙ্ক্ষার কারণে একদিকের আসন নিয়ে সন্তুষ্ট হন না। যখন তাদের অভিপ্রায় এইরূপ হয়ে গেল, মহান আল্লাহ তাদের উপদেশের ইতিবাচক প্রভাব দূর করে দিলেন এবং এইভাবে তারা এখন তাদের শ্রোতাদের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এক কথা বলে অন্য কাজ না করে তাদের বাস্তব উদাহরণ দেখানো উচিত ছিল। এতে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে পড়ে।

অন্যকে আদেশ করার আগে মুসলমানদের সর্বদা তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা উচিত কারণ এই পদ্ধতিতে আচরণ করা মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

*"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"*

এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে কারণ এটি সম্ভব নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে তাদের কর্মের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। শুধুমাত্র এই মনোভাব থাকলেই তারা এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তি থেকে বাঁচবে। এই নীতিতে কাজ করার ব্যর্থতার কারণে মুসলমানদের উপদেশ অকার্যকর হয়ে পড়েছে যদিও বছরের পর বছর ধরে উপদেষ্টার সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৪০

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। ইমাম বায়হাকির জুহদ আল কাবীর, ৯৮৫- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 1302 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কষ্টের শুরুতে প্রকৃত ধৈর্য দেখানো হয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকারের ধৈর্য দেখানো হয় দুর্যোগের মানে, কঠিন শুরু থেকেই। প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া, অবশেষে সময়ের সাথে সাথে সবার সাথেই ঘটে। এটি গ্রহণযোগ্যতা সত্য ধৈর্য নয়।

মুসলমানদের তাই নিশ্চিত করা উচিত যে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্য ধরে বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা সর্বোত্তম হয়, এমনকি যদি তারা পছন্দের পিছনের জ্ঞানগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে, তাদের অনেকবার চিন্তা করা উচিত যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে এখনও কিছু ভাল ছিল, এটি খারাপ এবং এর বিপরীতে পরিণত হয়েছিল। মানুষের চরম অদূরদর্শীতা এবং সীমিত জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বোঝা একজন মুসলিমকে অসুবিধার শুরু থেকে ধৈর্য দেখাতে সাহায্য করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

উপরন্তু, মুসলমানদের জন্য তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য প্রদর্শন চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি সহজে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে এমনকি যদি তারা শুরু থেকেই ধৈর্য্য ধরে অধৈর্যতা প্রদর্শন করে। এটি শয়তানের একটি অত্যন্ত মারাত্মক ফাঁদ। সে ধৈর্য ধরে কয়েক দশক ধরে অপেক্ষা করে শুধু একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করার জন্য। পবিত্র কোরান স্পষ্ট করে বলেছে যে একজন মুসলমান বিচার দিবসে যা নিয়ে আসবে তার জন্য পুরষ্কার পাবে, অর্থাত্, তারা মারা গেলে তাদের সাথে নিয়ে যাবে এটি ঘোষণা করে না যে তারা কেবল একটি কাজ করার পরে পুরস্কার পাবে, যেমন শুরুতে ধৈর্য প্রদর্শন করা। একটি অসুবিধা অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 160:

*"যে ব্যক্তি [বিচারের দিনে] নেক আমল নিয়ে আসবে..."*

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) – ৪১

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তির মনে করা উচিত নয় যে তাদের কাছে অনেক সময় আছে এবং তারা আশাকে তাদের উদাসীন করে তোলা উচিত নয়। ইবনুল জাওযীর সিফাতুল সাফওয়াহ, ১/২১৫ এ আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলিমের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে

এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

*“আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"*

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- 42

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, জিহ্বার চেয়ে দীর্ঘ কারাবাসের প্রয়োজন আর কিছু নেই। তিনি মানুষকে ভালো ও উপকারী কথা বলার জন্য এবং মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেছিলেন যাতে তারা নিরাপত্তা লাভ করে। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, ৩/২৫১।

এটি অধ্যায় 4 আন নিসা, 114 শ্লোকের সাথে সংযুক্ত:

*"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।*

এই আয়াতে মহান আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন যে, অন্যদের সাথে কথা বলার সময় মানুষের কীভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তারা নিজের এবং অন্যদের জন্য উপকৃত হয়। প্রথমটি হল যখন মুসলমানরা একত্রিত হয় তখন তাদের আলোচনা করা উচিত কিভাবে অন্যদের উপকার করা যায় যা সম্পদ এবং শারীরিক সাহায্যের আকারে দাতব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি একজন মুসলিম একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় না থাকে তবে এটি তাদের সাহায্য করার সমান পুরস্কার অর্জনের একটি চমৎকার উপায়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া

একটি হাদিস, নম্বর 6400, পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যকে ভাল কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে যেন সে নিজেই ভাল কাজ করেছে। যদি কেউ অসুবিধায় কাউকে সাহায্য করতে না পারে বা অন্যকে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে না পারে তবে তারা অন্তত অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা ফেরেশতাদের প্রার্থনাকারীর জন্য প্রার্থনা করতে বাধ্য করে। সুনান আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই মানসিকতা দলটিকে অভাবী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে যা তাদের মানসিক সহায়তা প্রদান করে। এটি একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে এবং তাদের কষ্ট মোকাবেলা করার সময় তাদের শক্তির একটি নতুন মোড প্রদান করে। লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে যখন কেউ একজন অভাবী ব্যক্তির পরিস্থিতি উল্লেখ করে তখন তাদের উদ্দেশ্য তাদের প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করা উচিত। সময় কাটানোর জন্য এবং তাদের উপহাসের লক্ষ্যে পরিণত করা কখনই উচিত নয়।

আশীর্বাদ লাভের দ্বিতীয় উপায় হল যখন কেউ বৈধ কোন বিষয়ে কথা বলে যা ইহকাল বা পরকালে কারো উপকারে আসে। এই দিকটির মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো কাজ করার এবং মন্দ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া।

এই আয়াতে উল্লিখিত তৃতীয় দিকটি হল একটি গঠনমূলক মানসিকতার সাথে অন্যদের সাথে কথোপকথন করা যা মানুষকে ধ্বংসাত্মক মানসিকতার অধিকারী করার পরিবর্তে ইতিবাচক উপায়ে একত্রিত করে যা সমাজের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। যদি একজন ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসার উপায়ে একত্রিত করতে না পারে তবে তারা ন্যূনতম যা করতে পারে তা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না। এমনকি

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হলে এটি একটি ভাল কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এটি সহীহ বুখারী, 2518 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই বিরোধী মুসলমানের মধ্যে মিলন স্বেচ্ছায় নামায ও রোযার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সমাজের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি ভালো জিনিসই ছিল এই ধার্মিক মনোভাবের ফল যেমন স্কুল, হাসপাতাল ও মসজিদ নির্মাণ।

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজন মুসলমান তখনই এই আয়াতে উল্লিখিত মহান পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করবে। প্রতিটি ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নয় তাদের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে পুরস্কৃত করা হবে। এটি সহীহ বুখারী, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অকৃত্রিম মুসলিম দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে যে তারা তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- 43

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে নিজেকে নিচু করে, মহান আল্লাহ তাকে উত্থিত করবেন। যে ব্যক্তি নিজেকে অহংকার থেকে উন্নীত করে, মহান আল্লাহ তাকে নামিয়ে দেন। ইমাম আবু লাইছ সমরকান্দীর তানবীহুলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে গাফিলীন , সাদ/১৪৩।

মহান আল্লাহ আব্বাসকারী ও শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর নাফরমানিকারীদের লাঞ্ছিত করেন। একজন অবাধ্য ব্যক্তি কিছু পার্থিব সাফল্য লাভ করলেও তা শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যকারীদেরকে উঁচু করেন। এমনকি যদি একজন আনুগত্যকারী মুসলিম বিশ্বের পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই মহান আল্লাহ কর্তৃক উন্নীত হবে।

একজন মুসলিম যে এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে তাই সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে বা পার্থিব জিনিসের মাধ্যমে পার্থিব সাফল্য অন্বেষণ করবে না যদি এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, কারণ তারা জানে যে এই পথটি কেবল উভয় জগতে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা এবং অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই ঐশী নামের উপর কাজ করতে হবে যা মহান আল্লাহ উত্থাপিত করেছেন এবং মহান আল্লাহ যা অপছন্দ করেছেন তার প্রশংসা করে। শুধু কথায় নয় কর্মের মাধ্যমে এটা দেখাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ , তাদের অবশ্যই পরকালের প্রশংসা করতে হবে এর জন্য প্রস্তুত করার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে। এবং তারা অবশ্যই এই জড় জগতের আধিক্যকে অপছন্দ করবে, মহান আল্লাহ জেনেও এটিকে হেয় করেছেন কারণ এটি একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেয়।

# আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৪৪

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, ঈমান দুই ভাগে গঠিত। এক অর্ধেক হল ধৈর্য এবং অর্ধেক হল কৃতজ্ঞতা। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, 4/316।

সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য বরকতময়। একমাত্র শর্ত এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে হবে, বিশেষত, অসুবিধায় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হল লোকেরা যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায় সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়। একজন ব্যক্তি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের রেহাই নেই। অতএব, একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতিগুলির উপর চাপ দেওয়া অর্থপূর্ণ নয় কারণ সেগুলি নির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিকটি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয় উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য দেখানো। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এমন পরিস্থিতিতে থাকার জন্য চাপ না দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলমান উভয় জগতে সফল হতে চায় তবে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং

সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

এবং কঠিন সময়ে তাদের অবশ্যই ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে জেনে শুনে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যা বেছে নেন, যদিও তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৪৫

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে অনেক হজযাত্রী কোনো কারণ ছাড়াই পবিত্র তীর্থযাত্রা করবেন, তাদের জন্য ভ্রমণ সহজ হবে এবং তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। তারা ফিরে আসবে বঞ্চিত ও অপদস্থ হয়ে। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, 4/225।

সহীহ বুখারি, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র তীর্থযাত্রার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তাদের বাড়ি, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা রেখে যায়, এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে যখন তারা তাদের পরকালের শেষ যাত্রা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভাল-মন্দ, তাদের সাথে থাকে।

যখন একজন মুসলমান তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় এটি মনে রাখে তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এই মুসলিম একটি পরিবর্তিত

ব্যক্তি হিসাবে দেশে ফিরে আসবে কারণ তারা এই জড় জগতের অতিরিক্ত দিকগুলিকে একত্রিত করার চেয়ে পরকালে তাদের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সচেষ্ট থাকবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের পূর্ণ করার জন্য দুনিয়া থেকে নেয়া। প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়া।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রাকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটা করার জায়গা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়। এটা অবশ্যই মুসলমানদের পরকালে তাদের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে যে যাত্রার কোনো প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এটিই একজনকে পবিত্র তীর্থযাত্রা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

# আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৪৬

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনকে ভালোবাসে, তবে সে মহান আল্লাহকে ভালোবাসে। যদি তারা পবিত্র কুরআনকে ভালোবাসে না, তবে তারা মহান আল্লাহকে ভালোবাসে না। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, ৫/২২৭।

মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভালবাসার নিদর্শন হল পবিত্র কুরআনকে ভালবাসা। এটিকে কেবল চুম্বন করে, একটি সুন্দর কাপড়ে মুড়ে এবং তারপর নিজের বাড়িতে একটি উঁচু শেলফে স্থাপন করার মাধ্যমে নয়, এর শিক্ষার উপর কাজ করার মাধ্যমে এটি অবশ্যই দেখানো উচিত। পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করার জন্য একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের দিকগুলি পূরণ করতে হবে। প্রথমত, তারা অবশ্যই শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সাথে সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কুরআনের শিক্ষা বোঝার জন্য তাদের অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। সবশেষে, তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর শিক্ষার উপর কাজ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। একজন মুসলমানকে সর্বদা এর শিক্ষার উপর কাজ করতে হবে এবং শুধুমাত্র যখন এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে বা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বা সময়ে, যেমন পবিত্র রমজান মাসে, তখনই নয়।

উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার একটি অংশ হল এটিকে নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করা। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ

কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করেছে এবং যখন তারা কোন পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনই তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে। এবং তাদের সমস্যা ঠিক হওয়ার মুহূর্তে তারা তাদের পরবর্তী পার্থিব সমস্যা না হওয়া পর্যন্ত এটিকে সরিয়ে দেয়। তারা এটিকে একটি টুলের মতো আচরণ করে যা শুধুমাত্র কিছু ঠিক করার জন্য টুলবক্স থেকে বের করা হয়। যদিও পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় কিন্তু এটি এর মূল কাজ নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল প্রকৃত নির্দেশনা যাতে কেউ নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে পারে। এটির প্রধান ফাংশন উপেক্ষা করা এবং শুধুমাত্র অন্য কিছুর জন্য এটি ব্যবহার করা বোকামি। এটা সেই লোকের মত যে একটা দামী গাড়ি কেনে যার ইঞ্জিন নেই শুধু তার ভিতরে লাগানো টেলিভিশন দেখার জন্য। এই ব্যক্তি একটি বোকা লেবেল করা হবে না? যদি একজন মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সঠিকভাবে আচরণ করে তবে তারা দেখতে পাবে এটি কেবল তাদের জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে না বরং এটি তাদের পার্থিব সমস্যারও সমাধান করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

*"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"*

# আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- 47

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, যে ব্যক্তির বুদ্ধি নেই সে দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় করে। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, সাদ/200।

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ হল যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে তার সম্পদ। উত্তরাধিকারী

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায় তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা নিয়ামতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে সে বিচারের দিন খালি হাতে থাকবে। অথবা তাদের উত্তরাধিকারী নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যা নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে শিক্ষা না দেয়, তাহলে দোয়াগুলোকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি একটি কর্তব্য। তাদের উপর এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা হাশরের দিনে খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে।

# আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)- ৪৮

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী মক্কায় পৌঁছানোর আগে বেশ কয়েকটি স্টপেজ করেছিল এই স্থানগুলির মধ্যে একটি ছিল আল আকাবা। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থানীয় গাছ থেকে ফল সংগ্রহের জন্য কিছু লোককে পাঠালেন। একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন একটি গাছে আরোহণ করে তার ফল তুলছিলেন, তখন কিছু লোক তাঁর ছোট এবং পাতলা পা দেখে তামাশা করেছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেছেন যে তার পাতলা পা কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় উহুদ পর্বতের চেয়েও বেশি ওজনের হবে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 390-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে

বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ১

জাবির একবার মন্তব্য করেছিলেন যে মুআয, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে খোলামেলা ব্যক্তি। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 557- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, ২৮৬৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, জীবদ্দশায় দান করা মৃত্যুর সময় দান করার চেয়ে 100 গুণ উত্তম।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক মুসলমান নির্বোধভাবে বিশ্বাস করে যে তারা হয় তাদের সম্পদ সঞ্চয় করতে পারে বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব ইচ্ছাপূরণের উপায়ে ব্যয় করতে পারে এবং যখন তারা তাদের মৃত্যুশয্যায় পৌঁছে তখন তারা প্রচুর পরিমাণে দান করবে। সম্পদের প্রথমত, এই হাদীসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে একজন মুসলিম এইভাবে আচরণ করলে অনেক সওয়াব হারাবে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে এবং তাদের মূল্যবান সম্পদ এখন তাদের কাছে তুচ্ছ এবং অকেজো হয়ে পড়েছে কারণ তারা তা তাদের সাথে নিতে পারে না। মহান আল্লাহকে অকেজো কিছু দান করা প্রকৃতপক্ষে একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়, এটি প্রকৃত বিশ্বাস ও তাকওয়ার পরিপন্থী। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

*"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া এবং এমন উপায়ে ব্যয় করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যার মধ্যে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের শেষ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি হঠাৎ আসতে পারে এবং এই সময়ে ব্যয় করা তাদের পক্ষে তেমন ফলদায়ক হবে না।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)-২

মুআয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি যতটা ইচ্ছা শিখতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের জ্ঞানের কোন উপকার করবেন না যতক্ষণ না তারা তার উপর আমল করার চেষ্টা করবে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 285- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

*"...অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."*

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ৩

মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মানুষকে বিদআত থেকে সাবধান হওয়ার জন্য সতর্ক করেছিলেন, কারণ বিদআত সঠিক পথ থেকে বিপথগামী হয়। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 583 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি

উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ৪

মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করে, নিরাপদ বোধ করে এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে, সে যেন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করে এবং যে ব্যক্তি বাড়িতে নামায আদায় করে, সে তার জন্য গৃহীত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে সরে এসেছেন এবং যে এটা করবে সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 593 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

*"... আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।*

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 550 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের এই দাবি করা উচিত নয় যে তারা অন্য ধার্মিক কাজ করছে যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এটি করে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে না তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করছে যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)-৫

মুআয বিন জাবাল, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার বলেছিলেন যে প্রাথমিক পরীক্ষায় কঠোর অসুবিধা এবং সীমিত সংস্থান ছিল যার জন্য ধৈর্য এবং সহনশীলতার প্রয়োজন ছিল। যাইহোক, ভবিষ্যত পরীক্ষাগুলো সান্ত্বনা ও সমৃদ্ধি নিয়ে গঠিত হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬০০ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছিলেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্রকে ভয় করেন না। পরিবর্তে তিনি ভয় করেছিলেন যে পৃথিবী তাদের জন্য প্রাপ্ত করা সহজ এবং প্রচুর হয়ে উঠবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে কারণ এই একই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি শুধুমাত্র সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই সতর্কবার্তাটি মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং একজনের জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পেশার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ এই জিনিসগুলি অনুসরণ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য রাখে, যদিও সেগুলি হালাল হলেও, তাদের প্রয়োজনের বাইরে এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। এটা তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে নিয়ে যাবে যেমন অপব্যয় ও অসংযত হওয়া এবং এমনকি এই জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য তাদের পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলি পেতে ব্যর্থ হলে অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা

এবং অবাধ্যতার অন্যান্য কাজ হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে কারণ তারা এই জিনিসগুলি যেমন সম্পদ অর্জন করার জন্য বা ছুটিতে যাওয়ার জন্য আনন্দের সাথে মধ্যরাতে উঠবে কিন্তু স্বেচ্ছায় রাতের প্রস্তাব দেওয়ার পরামর্শ দিলে তা করতে ব্যর্থ হবে। নামাজ বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজে অংশ নেওয়া।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলি একজন ব্যক্তির প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি যখন এর বাইরে চলে যায় তখন তারা তাদের আখেরাতের ক্ষতির বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কারণ একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের কামনা-বাসনাকে অনুসরণ করবে ততই তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কম চেষ্টা করবে। আর তাই তাদের জন্য এই হাদীসে প্রদত্ত সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে।

## মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ৬

মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে জান্নাতবাসীরা তাদের মধ্যে মহান আল্লাহকে স্মরণ না করে (পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে) যে মুহূর্তগুলি অতিবাহিত করেছে তা ছাড়া আর কিছুই অনুশোচনা করবে না। ইমাম গাজ্জালীর ইহইয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উলুম আল দীন, ১/৩৯২।

অনেক মুসলমান আছে যারা তাদের অনেক সময়, শ্রম এবং সম্পদ এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে যা সৎ কাজ বা পাপ নয়, এগুলো নিরর্থক জিনিস। নিরর্থক জিনিসগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জন করাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেমন প্রয়োজনের বাইরে নিজের ঘরকে সুন্দর করা। যদিও, তারা তাদের দাবিতে সঠিক হতে পারে যে তারা পাপ করছে না, একটি সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যথা, সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান উপহার, যা একবার চলে গেলে লাভ করা যায় না। সময় ছাড়া অন্য সব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করা যায়। সুতরাং যখন কেউ তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদ যেমন সম্পদকে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত জিনিসের অর্থ, নিরর্থক জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, তখন তা বিচার দিবসে একটি বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়। এটি তখন ঘটবে যখন তারা তাদের সময়কে সদ্ব্যবহার করে এবং সৎকাজ সম্পাদনকারীদের প্রদত্ত পুরষ্কার দেখে। সময় নষ্টকারীরা পাপ এড়িয়ে যেতে পারে যা তাদের শাস্তি থেকে বাঁচায় কিন্তু তারা অযথা কাজে সময় নষ্ট করার কারণে তারা সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। এবং তারা অবশ্যই তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তারা যে পুরষ্কার অর্জন করতে পারত তা অবশ্যই হারাবে।

উপরন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যত বেশি নিরর্থক জিনিসে লিপ্ত হয় সে তত বেশি বাড়াবাড়ি এবং অপচয়ের মধ্যে পড়ে যা উভয়ই দোষের যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, যারা আশীর্বাদ নষ্ট করে তারা শয়তানের ভাইবোন বলে বিবেচিত হয়। এবং এটি তর্ক করা যেতে পারে যখন কেউ নিরর্থক জিনিসের জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে সময়ের মূল্যবান আশীর্বাদকে নষ্ট করেছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"*নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই..*"

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ৭

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আবু মূসা ও মুআয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ইয়েমেনের দুটি প্রদেশে শাসন করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তাদের নম্র হতে, কঠোর না হওয়ার এবং সুসংবাদ দিতে এবং মানুষকে ভয় না দেখানোর পরামর্শ দেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 135-136-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে নিজেদের জন্য সহজ করে তোলা যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে পারে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর কাজ করতে পারে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা। এটি তাদের অপব্যয় বা অযৌক্তিক না হয়ে বৈধ জিনিস উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় সরবরাহ করবে। একজন মুসলমানের উচিত স্বেচ্ছাকৃত সৎ কাজের ব্যাপারে তাদের শক্তি অনুযায়ী কাজ করা এবং নিজের উপর বোঝা চাপানো নয় কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি সর্বদা সর্বোত্তম।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য বিশেষ করে, ধর্মীয় বিষয়ে সহজ করা যাতে লোকেরা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে এবং বিশ্বাস করে যে এটি একটি বোঝা ধর্ম, যখন এটি আসলে একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম। ইমাম বুখারীর

আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অন্যদের, বিশেষ করে শিশুদের শেখানো গুরুত্বপূর্ণ। যদি শিশুরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলাম একটি কঠিন ধর্ম, তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে এটি থেকে দূরে সরে যাবে। শিশুদের শেখানো উচিত যে ইসলামের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা পূরণ করতে খুব বেশি সময় লাগে না এবং তাদের ভালো উপায়ে মজা করার জন্য প্রচুর সময় দেয়।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মীয় বিষয়ে নিজের বা অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান অলস হওয়া উচিত এবং অন্যকে অলস হতে শেখানো উচিত কারণ ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলি সর্বদা পূরণ করতে হবে যদি না কেউ ইসলামের দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়। যে অলসভাবে কাজ করে সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না, কেবল নিজের ইচ্ছা।

অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করার আরেকটি দিক হল একজন মুসলিম অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে না। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হলে শাস্তি হতে পারে। অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য একজন মুসলমানের তাই শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং যদি তাদের কাছে কোন সমস্যা ছাড়াই তা করার উপায় থাকে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং

এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন। কিন্তু যারা অন্যদের জন্য কঠিন করে তোলে তারা দেখতে পায় যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য উভয় জগতেই কঠিন করে দেন।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজেকে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং তিনি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মুসলমানদেরকে যে মহান পুরষ্কার দান করেন, যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্য করেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে। এই পন্থা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে আরও কার্যকর। শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে যখন কেউ ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত হয় এবং মহান আল্লাহকে অমান্য করে, এবং আশা করে যে তারা সফল হবে, একজন মুসলমানের উচিত তাদেরকে তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা, তাদের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয়কে উদ্‌বুদ্ধ করা।

একটি ভারসাম্য সর্বোত্তম যেখানে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আশা ব্যবহার করে, পাপ প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর আনুগত্য ও ভয়কে উত্সাহিত করতে। এবং যখনই কেউ ভারসাম্যহীন বোধ করে বা অন্যদেরকে দেখে যারা

ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে একজন মুসলমানের উচিত নিজেকে এবং অন্যদেরকে সঠিক মধ্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথভাবে কাজ করা।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)-৮

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আবু মূসা ও মুআয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ইয়েমেনের দুটি প্রদেশে শাসন করার জন্য প্রেরণ করেন। একবার মুআয আবু মূসার সাথে দেখা করতে গেলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মতো ভাল কাজ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। তাঁর রাত্রিকালীন রুটিন উল্লেখ করার সময় মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছেন যে তিনি রাতের প্রথম অংশে ঘুমাতেন তারপর তিনি উঠে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে এই রুটিন থেকে তিনি তার ঘুম এবং তেলাওয়াত উভয়ের জন্য মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 136-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি এই পুরষ্কার আশা করেছিলেন কারণ ঘুমানোর জন্য তার উদ্দেশ্য ছিল তার শরীরকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়া যাতে তিনি পরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য রাতে জেগে উঠতে পারেন। এই ধার্মিক নিয়তের কারণে তিনি তার ঘুম ও তেলাওয়াত উভয়ের জন্য সওয়াব লাভ করেছিলেন।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু

সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ৯

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আবু মূসা ও মুআয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ইয়েমেনের দুটি প্রদেশে শাসন করার জন্য প্রেরণ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন যার মধ্যে একটি ছিল নির্যাতিতদের অভিশাপকে ভয় করা কারণ তাদের এবং মহান আল্লাহর মধ্যে কোন বাধা নেই। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 136-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে বিচারের দিন জুলুম অন্ধকার হয়ে যাবে।

এটা এড়ানো অত্যাবশ্যক কারণ যারা নিজেদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে তাদের পরমদেশে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র যারা একটি গাইড আলো প্রদান করা হবে সফলভাবে এটি করতে সক্ষম হবে.

নিপীড়ন অনেক রূপ নিতে পারে। প্রথম প্রকার হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে। যদিও এটি মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না, তবুও এটি ব্যক্তিকে উভয় জগতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া

একটি হাদিস অনুসারে, যখনই কেউ পাপ করে তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারা যত বেশি পাপ করবে ততই তাদের হৃদয় অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে সত্য নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে যা শেষ পর্যন্ত পরবর্তী জগতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

*"না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।"*

পরবর্তী প্রকারের নিপীড়ন হল যখন কেউ তাদের দেহ ও অন্যান্য পার্থিব নেয়ামতের আকারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আমানত পূরণ না করে নিজেদের উপর জুলুম করে। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের বিশ্বাস। ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটিকে অবশ্যই সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করতে হবে।

নিপীড়নের চূড়ান্ত ধরন হল যখন একজন অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে। অত্যাচারীর শিকার প্রথমে ক্ষমা না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ এই পাপগুলো ক্ষমা করবেন না। মানুষ অতটা দয়ালু না হওয়ায় এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতঃপর বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকাজ তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপের শাস্তি অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাই অন্যদের সাথে সেরকম আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ। একজন মুসলমানের উচিত সকল প্রকার নিপীড়ন এড়ানো, যদি তারা ইহকাল ও পরকালে পথপ্রদর্শক আলো চায়।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ১০

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনের একটি প্রদেশ শাসন করার জন্য মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর পাহাড়ের পাশে হেঁটেছিলেন। তাঁকে কিছু বিদায়ী উপদেশ দেওয়ার পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার দিকে ফিরেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর সবচেয়ে কাছের লোকেরা ধার্মিক, তারা যেই হোক না কেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 137-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ১১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনের একটি প্রদেশ শাসন করার জন্য মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উপদেশ দিয়েছিলেন: মহান আল্লাহকে ভয় করতে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, একটি ভালো কাজের সাথে একটি পাপকে অনুসরণ করতে হবে যাতে এটি আগেরটি মুছে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের সাথে আচরণ করা। ভালো চরিত্রের সাথে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 138-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে তাকওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ভয় করা। এটা অর্জিত হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সমস্ত শিক্ষা ও কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন কেউ এই পদ্ধতিতে চেষ্টা করে তারা অবশেষে শ্রেষ্ঠত্ব নামক বিশ্বাসের উচ্চ স্তরে পৌঁছাবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ কাজ করে, যেমন সালাত আদায় করা, যেন তারা আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করছে, তাদের পর্যবেক্ষণ করছে। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টি উভয়ের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে।

প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশ হল যে, একজন মুসলমানের উচিত একটি পাপকে একটি নেক আমলের সাথে অনুসরণ করা যাতে এটি পাপকে মুছে ফেলে। এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। যদি কেউ তাদের সৎ কাজের সাথে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করে তবে এটি ছোট বা বড় যে কোনও পাপ মুছে ফেলবে। কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করার একটি অংশ হল পাপের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সচেষ্ট হওয়া কারণ একটি সৎ কাজের সাথে তা অনুসরণ করার অভিপ্রায়ে পাপ করা একটি বিপজ্জনক বিপথগামী মানসিকতা। একজনকে পাপ না করার চেষ্টা করা উচিত এবং যখন সেগুলি ঘটে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

পরিশেষে, সর্বশেষ যে জিনিসটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস। জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্রকে শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে এটি গ্রহণ করা উচিত। যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তারা দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেরকম আচরণ করা যেটা তারা চায় মানুষ তাদের সাথে ব্যবহার করুক।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ১২

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনের একটি প্রদেশ শাসন করার জন্য মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। তিনি যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে বিলাসিতা থেকে সাবধান থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন কারণ মহান আল্লাহর বান্দারা বিলাসিতা খোঁজে না। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 138-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ১৩

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনের একটি প্রদেশ শাসন করার জন্য মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে চলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যদি তাকে বিচারের জন্য মামলা করা হয় তবে তিনি কী করবেন? মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যে তিনি পবিত্র কুরআন অনুযায়ী বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে, তিনি যদি পবিত্র কুরআনে মামলা ও তার বিচার না পান তাহলে কি হবে। তিনি তখন উত্তর দিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন যে, যদি তিনি তার রেওয়ায়েতে মামলা ও তার রায় না পান তাহলে কি হবে। মুআয, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অবশেষে উত্তর দিলেন যে তিনি স্বাধীন যুক্তির অর্থ ব্যবহার করবেন, এমন একটি রায় যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন প্রতিনিধি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন যা তাকে খুশি করেছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 140-141-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখনই একজন পণ্ডিত ইসলামের বিভিন্ন বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন তখনই তারা স্বাধীন যুক্তি বলে একটি স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঐতিহ্যকে তাদের পেশাগত নিরপেক্ষ রায় দিয়ে ইসলামের মধ্যে একটি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করতে দেয়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 4487 নম্বর,

এই পণ্ডিত যখন একটি ভুল রায় দেন তখন তাদের প্রচেষ্টার জন্য এক বার পুরস্কৃত করা হবে। যদি তারা সঠিক রায় দেয় তবে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে।

উপরন্তু, সঠিক নিয়তে জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আলেমদের দেখানোর জন্য, অন্যের সাথে তর্ক করার জন্য বা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। নরকে।

যদিও, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সমস্ত কল্যাণের ভিত্তি হল জ্ঞান হল মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকৃত হবে যখন তারা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সমস্ত কারণ শুধুমাত্র পুরস্কার এবং এমনকি শাস্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরনের গাছে পড়ে। ফল গাছের মতো অন্যদের উপকার করার জন্য কিছু গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে এবং কাঁটাযুক্ত গাছের মতো অন্যদের জন্য উপদ্রব হয়ে ওঠে। যদিও, বৃষ্টির জল উভয় ক্ষেত্রেই একই তবে ফলাফল খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তবে তা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতভাবে, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে তবে তা তাদের পরিত্রাণের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুসলমানদের উচিত সকল বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় সংশোধন করা কারণ তাদের এ বিষয়ে বিচার করা হবে। এটি সহীহ বুখারি, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন আলেম যিনি শুধুমাত্র অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, শুধুমাত্র সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে দরকারী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর কাজ করাই প্রকৃত উপকারী জ্ঞান।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)- ১৪

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের 17 তম বছরে, একটি বড় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দেশে, বিশেষ করে সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সিনিয়র সাহাবী, যেমন আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ এবং মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা গেছেন। তারা সকলেই মহান আল্লাহর প্রতি ধৈর্যশীল ও আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা আদেশ করেছিলেন তা সহজেই মেনে নেন।

মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যু শয্যা সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা এমন একটি সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তারা সৎকাজ করতে চাইবে কিন্তু তাদের থেকে বাধা দেওয়া হয়েছিল, তাদের সুযোগ থাকাকালীন কঠোর পরিশ্রম করার। তিনি তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা যা খেয়েছে, পান করেছে, পরিধান করেছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা ব্যয় করেছে তা তাদের কাছে আশা করা যায় না, অন্য সমস্ত সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে দেওয়া হবে। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে তিনি কেবল দীর্ঘ রাত নামাজে কাটাতে, দিনের দীর্ঘ সময় রোজা রাখার জন্য এবং আলেমদের মজলিসে অংশ নেওয়ার জন্য পৃথিবীতে থাকতে চেয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 424-430- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ হল যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে তার সম্পদ। উত্তরাধিকারী

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায় তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা নিয়ামতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে সে বিচারের দিন খালি হাতে থাকবে। অথবা তাদের উত্তরাধিকারী নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যা নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে শিক্ষা না দেয়, তাহলে দোয়াগুলোকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি একটি কর্তব্য। তাদের উপর এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা হাশরের দিনে খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে।

# মুআয বিন জাবাল (রাঃ)-১৫

খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর থেকে বেঁচে থাকেন তবে তিনি তাঁকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিয়োগ করবেন। আর যখন মহান আল্লাহ তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি উত্তর দিতেন যে, তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন মুআয রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে পুনরুত্থিত করা হবে। বিচারের সময়, তিনি পণ্ডিত এবং জ্ঞানবাদীদের নেতৃত্ব দেবেন এবং তিনি তাদের সামনে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকবেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 573 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা

পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)- ১

আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধুমাত্র অন্ধকার ঘরে গোসল করতেন এবং মহান আল্লাহর সামনে লজ্জাবতী হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন না। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 568- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সহীহ মুসলিমে 99 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহসানের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, যার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে অনুবাদ করা যেতে পারে। এই শ্রেষ্ঠত্ব বলতে বোঝায় আল্লাহ, মহান ও সৃষ্টির প্রতি একজনের আচরণ ও আচরণ। পবিত্র কুরআন জুড়ে শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 26:

*" যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য সর্বোত্তম [ পুরস্কার] - এবং অতিরিক্ত ..."*

সহীহ মুসলিমের ৪৪৯ ও ৪৫০ নম্বর হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। এই আয়াতে অতিরিক্ত শব্দটি বোঝায় কখন

জান্নাতবাসীরা আল্লাহর ঐশ্বরিক দর্শন লাভ করবে। , মহিমান্বিত। এই পুরষ্কার সেই মুসলমানের জন্য উপযোগী যারা শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করে। যেমন শ্রেষ্ঠত্ব মানে একজনের জীবন পরিচালনা করা যেন তারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দিতে পারে, সর্বদা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। যে ব্যক্তি একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারে সে কখনই তাদের ভয়ে খারাপ আচরণ করবে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা সর্বদা এমন আচরণ করে যেন তারা প্রতিনিয়ত একজন ধার্মিক ব্যক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয় যা তারা সম্মান করে। ইমাম তাবারানির আল মুজাম আল কাবীর , 5539 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে কাজ করে সে খুব কমই পাপ করবে এবং সর্বদা ভাল কাজের দিকে ধাবিত হবে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং দুনিয়াতে পরীক্ষার আগুন এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই সতর্কতা নিশ্চিত করবে যে কেউ কেবল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে না, বরং এটি তাদের সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করবে। যার শিখর হল আন্তরিকভাবে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এই ব্যক্তি জামি আত তিরমিযী, 251 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি পূরণ করবে, যা উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে।

শ্রেষ্ঠত্বের এই স্তরটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সঠিক নিয়তে কাজ করে, যা সহীহ বুখারিতে পাওয়া হাদিস অনুসারে বিশ্বাসের ভিত্তি, নম্বর 1। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে এবং সঠিক নিয়তে ভাল আচরণ প্রদর্শন করে তার জন্য সাফল্য

নিশ্চিত করা হয়, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। একজন ব্যক্তি যত বেশি ভালো কাজ করবে তার ঈমান ততই মজবুত হবে যতক্ষণ না তারা এমন একজন মুসলিম হয়ে ওঠে যারা গাফিলতি থেকে দূরে থাকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরকাল ও পার্থিব জীবনকে সুন্দর করার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে থাকে।

আশংকা করা হয় যে, যারা মহান আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে এই পুরস্কারের বিপরীতে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী দৃষ্টিকে ভয় না করে জীবনযাপন করেছে, তারা আখেরাতে তাকে দেখতে পাবে না। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 15:

*"না! নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সেদিন তারা বিভক্ত হবে।"*

যারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কাজ করার পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় তাদের অবশ্যই শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদীসে প্রদত্ত উপদেশের দ্বিতীয় অংশের উপর আমল করতে হবে। এই ব্যক্তির আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন। যদিও এই অবস্থা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের, যে ব্যক্তি এমনভাবে কাজ করে যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে, কোন অংশে কম নয়, এটি মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভয়কে অবলম্বন করার একটি দুর্দান্ত উপায়। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে এই মনোভাব একজনকে পাপ থেকে বিরত রাখবে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে। ইমাম তাবারানীর আল মুজাম আল কাবীর, ৭৯৩৫ নং নং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি এই মানসিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করবে, বিচারের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন। উচ্চাভিলাষী।

মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক উপস্থিতি পবিত্র কুরআন জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 4:

*কেন তিনি আপনার সাথে আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে মহান আল্লাহর ঐশী উপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার সাথে আছেন যে তাকে স্মরণ করে। এই কারণেই হিলিয়াত আল আউলিয়া, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 84 এবং 85-এ বিশ্বস্ত সেনাপতি আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে ছিলেন। জড় জগতের এবং শুধুমাত্র একাকী রাতে সান্ত্বনা পাওয়া. অর্থ, তিনি মানুষের সাহচর্যের চেয়ে মহান আল্লাহর সাহচর্য চেয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করা শুধুমাত্র পাপ প্রতিরোধ করে না এবং ভাল কাজের উত্সাহ দেয় তবে এটি একাকীত্ব এবং হতাশাকেও প্রতিরোধ করে। একজন ব্যক্তি খুব কমই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয় যখন তারা ক্রমাগত এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যে তাকে ভালবাসে এবং তাদের সাহায্য করে। মহান আল্লাহর চেয়ে সৃষ্টিকে কেউ বেশি ভালোবাসে না এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনিই সকল সাহায্যের

উৎস। অতএব, শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করা একজনের বিশ্বাস, কর্ম, মানসিক অবস্থা এবং বৃহত্তর সমাজকে উপকৃত করে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যারা মহান আল্লাহকে তাদের পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে তুচ্ছ মনে করে। এটি একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি সকল প্রকার পাপ এবং খারাপ আচরণের দিকে নিয়ে যায়।

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)-২

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, মানুষ পরকাল সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছে কারণ দুনিয়া তাদের সামনে এবং আখেরাত লুকিয়ে আছে। মানুষ যদি পরকাল প্রত্যক্ষ করত তাহলে তারা কখনোই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত না। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 79-80- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই এই জড় জগত ও পরকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা পূর্বের চেয়ে পরবর্তীটিকে অগ্রাধিকার দেয়।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয় তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র

অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন।

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

*"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."*

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)-3

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, পবিত্র কুরআন হয় একজন ব্যক্তির জন্য পুরস্কারের উৎস বা বোঝা হবে। অতএব, একজনকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত এবং (এর অপব্যাখ্যা করে) কখনও নিজের ইচ্ছাকে অনুসরণ করতে বাধ্য করা উচিত নয়। যে এটি অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে এবং যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনকে অনুসরণ করতে বাধ্য করবে তাকে এর দ্বারা জাহান্নামে ঠেলে দেওয়া হবে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 278- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে

তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

*"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"*

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

## আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)- ৪

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার নৌ অভিযানের সময় একটি জাহাজে ভ্রমণ করছিলেন। রাতে তিনি অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে ঘোষণা করে যে কেউ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গরম দিনে নিজেকে পিপাসার্ত রাখে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বছরের উষ্ণতম দিনে রোজা রাখতেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 567- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত সমস্ত সৎ কাজ নিজের জন্য করা হয় কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি তা করবেন। সরাসরি পুরস্কৃত করুন।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস হল একটি অনন্য ধার্মিক কাজ কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ শুধুমাত্র তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

*"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."*

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত ঈমানদার হবে না কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজাও পূর্ণ না করে তাহলে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। সারাজীবন রোজা রাখলেও সওয়াব ও আশীর্বাদ হারিয়ে যায়।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত রোজা সঠিকভাবে তাকওয়া বাড়ে. অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন তারা রোজা রাখে এই অভ্যাসটি শেষ পর্যন্ত তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা সত্ত্বেও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার

ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে । পরিশেষে, সিয়ামের সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবেও রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখা উচিত, এবং এর পরিবর্তে ভাগ্য ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে জানার জন্য নিয়ে আসে, মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন যদিও তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং অন্যদের না জানানো যদি এটি পরিহারযোগ্য হয় কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)-৫

আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের মাথার উপর নিয়ে আসা হবে এবং তাদের কাজগুলি তাদের ছায়া দেবে বা তাদের তীব্র উত্তাপে উন্মোচিত করবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৬৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। এটি সহীহ মুসলিম, 2864 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর ফলে মানুষ পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে যে কাজগুলো করেছে সে অনুযায়ী ঘাম ঝরাবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত পৌঁছাবে।

একজনকে শুধুমাত্র সেই সময়ে চিন্তা করতে হবে যে তারা গ্রীষ্মের তীব্র আবহাওয়ার শিকার হয়েছিল এবং কীভাবে তাপ তাদের মনোভাব এবং আচরণকে প্রভাবিত করেছিল। এর মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে, কিয়ামতের দিন যখন সূর্যকে তাদের এত কাছে নিয়ে আসা হবে তখন পরিস্থিতি কতটা কঠিন হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত

অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে। বিচার দিবসে তিনি শিথিলতা পাবেন। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় অলস এবং শিথিল ছিল তারা বিচার দিবসে খুব চাপের শিকার হবে। সহজ কথায়, যে এখানে চেষ্টা করবে সে সেখানে বিশ্রাম পাবে কিন্তু যে এখানে শিথিল করবে সে সেখানে কষ্ট করবে।

মানুষ যেভাবে এই জড় জগতে কঠোর পরিশ্রম করে যাতে তারা একটি আরামদায়ক জীবন এবং এমনকি একটি আরামদায়ক অবসর লাভ করতে পারে, যদিও এই অবসরের বয়সে পৌঁছানো নিশ্চিত করা যায় না, মুসলমানদের উচিত এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম মহান আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে আরও কঠোর পরিশ্রম করা। তাদের জীবনের দিকগুলি যাতে তারা এমন একটি দিনে শান্তি এবং আরাম পেতে পারে যা ঘটতে পারে। এমন একটি দিনের জন্য সংগ্রাম করা বড় অজ্ঞতার চিহ্ন যা কখনোই পৌঁছাতে পারে না, অর্থাৎ অবসর গ্রহণের দিন, এবং এমন একটি দিনের জন্য সংগ্রাম না করা যেদিন তারা পৌঁছানোর এবং অভিজ্ঞতা লাভের গ্যারান্টিযুক্ত, যথা বিচার দিবস।

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)- ৬

আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে মানুষ এমন এক সময়ে বাস করছে যেখানে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করবে, সে একটি পুরস্কার পাবে। কিন্তু তারা এমন এক সময় আসবে যখন কেউ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করবে এবং দুটি পুরস্কার পাবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৭২ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অশান্তি ও বিদ্রোহের সময় মহান আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পবিত্রে হিজরত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সা.

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজনের পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহকে মুছে ফেলে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার অর্থ হল মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া।

স্পষ্টতই এ হাদীসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য জাগতিক কামনা-বাসনা উন্মুক্ত হওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হওয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে। তাই মুসলমানদের উচিত তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া এবং বিতর্কিত বিষয় ও লোকেদের এড়িয়ে চলা এবং এই হাদীসে বর্ণিত সওয়াব পেতে চাইলে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)-৭

আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, যখন কেউ ভালো কিছু শিখে তখন অন্যকে তা শেখাতে হবে। এটি ইবনে সা'দ'স , কিতাব আল তাবাকাত আল কাবীর, 4/373 এ আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)-৮

আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বলেছিলেন যে, যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলা উচিত নয় অন্যথায় তারা দাম্ভিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং দ্বীন থেকে ছিটকে পড়বে। এটি ইবনে সা'দ'স , কিতাব আল তাবাকাত আল কাবীর, 4/373 এ আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ অদ্ভুত মনোভাব গ্রহণ করেছে। যখন তাদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা সত্য স্বীকার না করে এমন একটি উত্তর দেয় যার সত্যের খুব কম বা কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ করে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে এটি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। একজন মুসলিম ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য শাস্তি পেতে পারে যা অন্যরা কাজ করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ, মহান বা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জিনিস আরোপ করেছে। এসব লোকের কারণে ইসলামের সাথে অদ্ভুত আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি জড়িয়ে গেছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত সত্য থেকে এক বিরাট বিচ্যুতি। প্রকৃতপক্ষে, অনেক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি মুসলমানদের ইসলামের অংশ বলে বিশ্বাস করে গ্রহণ করেছে এই অজ্ঞ মানসিকতার কারণে।

এই লোকেরা বিশ্বাস করে যে যদি তারা কেবল স্বীকার করে যে তারা কিছু জানে না তবে তারা অন্যদের কাছে বোকা বলে মনে হবে। এই মানসিকতা নিজেই অত্যন্ত মূর্খ কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করার গুরুত্বের উপর জোর

দিয়েছিলেন যাতে অন্যরা বিপথগামী না হয়। প্রকৃতপক্ষে, ধার্মিক পূর্বসূরিরা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকে গণনা করতেন যে এইভাবে আচরণ করেছিল বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসাবে এবং যে তাদের কাছে উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাকে মূর্খ হিসাবে গণ্য করেছিল।

এই মনোভাব প্রায়শই প্রবীণদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যারা প্রায়শই তাদের সন্তানদেরকে তাদের অজ্ঞতা স্বীকার না করে এবং সত্য জানে এমন একজনের কাছে নির্দেশ না দিয়ে দুনিয়া ও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দেন। প্রবীণরা যখন এইভাবে কাজ করে তখন তারা তাদের নির্ভরশীলদের সঠিকভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে এবং যদি তারা কিছু জানেন না তবে তাদের তা স্বীকার করা উচিত কারণ এটি তাদের পদমর্যাদাকে কোনভাবেই হ্রাস করবে না। যদি কিছু হয় আল্লাহ, মহান, এবং মানুষ তাদের সততা প্রশংসা করবে.

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)- ৯

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আবু মূসা ও মুআয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ইয়েমেনের দুটি প্রদেশে শাসন করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তাদের নম্র হতে, কঠোর না হওয়ার এবং সুসংবাদ দিতে এবং মানুষকে ভয় না দেখানোর পরামর্শ দেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 135-136-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে নিজেদের জন্য সহজ করে তোলা যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে পারে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর কাজ করতে পারে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা। এটি তাদের অপব্যয় বা অযৌক্তিক না হয়ে বৈধ জিনিস উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় সরবরাহ করবে। একজন মুসলমানের উচিত স্বেচ্ছাকৃত সৎ কাজের ব্যাপারে তাদের শক্তি অনুযায়ী কাজ করা এবং নিজের উপর বোঝা চাপানো নয় কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি সর্বদা সর্বোত্তম।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য বিশেষ করে, ধর্মীয় বিষয়ে সহজ করা যাতে লোকেরা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে এবং বিশ্বাস করে যে এটি একটি বোঝা ধর্ম, যখন এটি আসলে একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম। ইমাম বুখারীর

আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অন্যদের, বিশেষ করে শিশুদের শেখানো গুরুত্বপূর্ণ। যদি শিশুরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলাম একটি কঠিন ধর্ম, তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে এটি থেকে দূরে সরে যাবে। শিশুদের শেখানো উচিত যে ইসলামের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা পূরণ করতে খুব বেশি সময় লাগে না এবং তাদের ভালো উপায়ে মজা করার জন্য প্রচুর সময় দেয়।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মীয় বিষয়ে নিজের বা অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান অলস হওয়া উচিত এবং অন্যকে অলস হতে শেখানো উচিত কারণ ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলি সর্বদা পূরণ করতে হবে যদি না কেউ ইসলামের দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়। যে অলসভাবে কাজ করে সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না, কেবল নিজের ইচ্ছা।

অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করার আরেকটি দিক হল একজন মুসলিম অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে না। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হলে শাস্তি হতে পারে। অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য একজন মুসলমানের তাই শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং যদি তাদের কাছে কোন সমস্যা ছাড়াই তা করার উপায় থাকে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং

এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন। কিন্তু যারা অন্যদের জন্য কঠিন করে তোলে তারা দেখতে পায় যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য উভয় জগতেই কঠিন করে দেন।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজেকে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং তিনি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মুসলমানদেরকে যে মহান পুরষ্কার দান করেন, যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্য করেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে। এই পন্থা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে আরও কার্যকর। শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে যখন কেউ ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত হয় এবং মহান আল্লাহকে অমান্য করে, এবং আশা করে যে তারা সফল হবে, একজন মুসলমানের উচিত তাদেরকে তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা, তাদের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয়কে উদ্‌বুদ্ধ করা।

একটি ভারসাম্য সর্বোত্তম যেখানে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আশা ব্যবহার করে, পাপ প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর আনুগত্য ও ভয়কে উত্সাহিত করতে। এবং যখনই কেউ ভারসাম্যহীন বোধ করে বা অন্যদেরকে দেখে যারা

ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে একজন মুসলমানের উচিত নিজেকে এবং অন্যদেরকে সঠিক মধ্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথভাবে কাজ করা।

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)- ১০

তাঁর খিলাফতকালে, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, মানুষ যাতে ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং তার উপর আমল করে তা নিশ্চিত করার জন্য মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর একটি শাখা ছিল অর্জিত জ্ঞান সঠিক ও নির্ভুল তা নিশ্চিত করা। এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি মানুষকে শেখানোর জন্য তিনি যখনই কেউ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করতেন, যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে শোনেননি, তখনই তিনি সাক্ষী আকারে প্রমাণের জন্য অনুরোধ করতেন। তিনি এমন আচরণ করেননি যেভাবে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সততা নিয়ে সন্দেহ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, বরং তিনি অন্যদের এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তারা যে জ্ঞান শিখেছেন এবং তার উপর আমল করেছেন তা নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য তিনি এটি করেছিলেন। সঠিক এবং নির্ভুল।

উদাহরণস্বরূপ, আবু মুসা আল আশআরী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার, তিনবার, খলিফা, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়নি। অতঃপর তিনি চলে গেলেন যতক্ষণ না উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি তাকে ব্যস্ত রেখেছিলেন এমন ব্যবসা শেষ করার পরে তাকে ফেরত ডাকলেন। তিনি যখন আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কেন চলে গেলেন, তিনি তাঁকে বললেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তির কাছে তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায় কিন্তু যদি তাদের অনুমতি দেওয়া হয় না তাদের জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এই কথার প্রমাণ আনতে বললেন। আবু মূসা, তারপর অন্য একজন সাহাবী, আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) কে নিয়ে আসলেন, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনিও মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বক্তব্য

শুনেছেন। এটি সহীহ বুখারী, 6245 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি থেকে একজনকে তথ্যের উপর কাজ করার আগে বা অন্যদের সাথে শেয়ার করার আগে তথ্য যাচাই করার গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি শিখতে হবে।

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এই সময়ে অসত্য খবরের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা কতটা কঠিন তা কেউ কল্পনা করতে পারেন। তাই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর কাজ করা এবং অন্যদের কাছে তথ্য না ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে তথ্য যাচাই না করে এটি করে অন্যদের উপকার করছে। অর্থ, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে এবং সঠিক। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

*" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"*

যদিও, এই শ্লোকটি একটি দুষ্ট ব্যক্তিকে সংবাদ ছড়ানোর ইঙ্গিত দেয় যা এখনও অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে এমন সমস্ত লোকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। এই আয়াতে উল্লিখিত হিসাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে যে তারা অন্যদের

সাহায্য করছে কিন্তু অযাচাইকৃত তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, যেমন মানসিক ক্ষতি। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান এই বিষয়ে অমনোযোগী এবং এটি যাচাই না করেই টেক্সট মেসেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ফরোয়ার্ড করার অভ্যাস রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে তথ্যটি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে তথ্যটি ছড়িয়ে দেওয়ার আগে যাচাই করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তারা তাদের দেওয়া ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের কাজের জন্য শাস্তি পেতে পারে। এটি সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, বিশ্বে যা কিছু চলছে এবং এটি মুসলমানদের কীভাবে প্রভাবিত করছে তার সাথে তথ্য যাচাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ঘটেনি সে বিষয়ে অন্যদের সতর্ক করা শুধুমাত্র সমাজে দুর্দশা সৃষ্টি করে এবং মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল বাড়িয়ে দেয়। এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন তারা বিচারের দিন অন্যদের সাথে যাচাই করা তথ্য শেয়ার করেননি। তবে তিনি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে, তা যাচাই করা হোক বা না হোক। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান কেবলমাত্র যাচাইকৃত তথ্য শেয়ার করবে এবং যা যাচাই করা হয় না তা জেনেও তারা ত্যাগ করবে যে তারা এর জন্য দায়ী হবে না।

# আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ)- ১১

তাঁর মৃত্যুশয্যায় আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন যে হয় তাঁর কবর চল্লিশ গজ প্রশস্ত হবে বা তাঁর কবর শক্ত হয়ে বর্শার চেয়ে ছোট হবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৭০ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তখন তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আমল। যদি একজন মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তবে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রস্তুত করবে। তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে দীর্ঘ সময় থাকা। এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

# রাবিয়াহ বিন কাব (রাঃ)- ১

রাবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু দিনরাত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করতেন। এক সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর কাছে কিছু চাইতে বললেন। রাবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু জান্নাতে তাঁর সাহচর্য কামনা করেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনেক সিজদা করার মাধ্যমে তাকে সাহায্য করতে বলেছেন। সহীহ মুসলিম, নং 1094 এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ নির্দেশ পালনের প্রথম ধাপ হচ্ছে ফরজ নামাজ কায়েম করা।

জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

এই দিন এবং যুগে এটি অনেক বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকে তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে যা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার জন্য যদি নামাযের ফরজ বাদ না দেওয়া হয় তবে তা অন্য কারো থেকে কিভাবে সরানো যাবে? অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 102:

*“এবং যখন আপনি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর কমান্ডার] তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের নামাযে নেতৃত্ব দেবেন, তখন তাদের একটি দল আপনার সাথে [প্রার্থনায়] দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্র বহন করুক। এবং যখন তারা সেজদা করে, তখন তাদের আপনার পিছনে [অবস্থানে] থাকতে দিন এবং অন্য দলটিকে এগিয়ে আসতে দিন যারা [এখনও] নামায পড়েনি এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে আপনার সাথে সালাত আদায় করুক..."*

মুসাফির বা অসুস্থ কেউই তাদের ফরয নামায পড়া থেকে রেহাই পায় না। মুসাফিরকে তাদের জন্য বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেগুলি নামায থেকে রেহাই পায়নি। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 101:

*"এবং যখন আপনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই.."*

অসুস্থদের শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যদি পানির সংস্পর্শে তাদের ক্ষতি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 6:

*"... তবে যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্বস্তির স্থান থেকে আসে বা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পেয়ে, তাহলে পরিষ্কার মাটির সন্ধান করো এবং তা দিয়ে তোমার মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."*

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা ফরজ সালাত এমনভাবে আদায় করতে পারে যা তাদের পক্ষে সহজ। অর্থ দাঁড়াতে না পারলে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং বসতে না পারলে শুয়ে ফরজ নামাজ পড়তে পারবে। জামে আত তিরমিযী, 372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আবার, অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাযের বাধ্যবাধকতা বুঝতে বাধা দেয়।

অন্য প্রধান সমস্যা হল যে কিছু মুসলমান তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং তাদের সঠিক সময়ের বাইরে নামাজ আদায় করে। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে কারণ বিশ্বাসীদেরকে তাদের ফরজ নামাজ যথাসময়ে আদায়কারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

*"... অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"*

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের নির্দেশ করে যারা অকারণে তাদের ফরজ নামাজে বিলম্ব করে। তাফসীরে ইবনে কাসীর,

খণ্ড 10, পৃষ্ঠা 603-604-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 107 আল মাউন, আয়াত 4-5:

*"অতএব যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য দুর্ভোগ। [কিন্তু] যারা তাদের নামাযের প্রতি উদাসীন।"*

এখানে যারা এই মন্দ স্বভাব অবলম্বন করেছে তাদের উপর মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকলে দুনিয়া বা পরকালে সফলতা কিভাবে পাওয়া যাবে?

সুনানে আন নাসাই নং 512-এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, ফরয নামায অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হল ফরজ নামাজ আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। অধ্যায় 74 আল মুদ্দাত্থির, আয়াত 42-43:

*সাকারে ফেলেছে?" তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।*

ফরয নামায ত্যাগ করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যে, জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যে এ পাপ করবে সে ইসলামে কাফের।

উপরন্তু, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলমানকে উপকৃত করবে না যতক্ষণ না তার ফরজ নামাজ কায়েম না হয়। সহীহ বুখারি, 553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ সালাত মিস করে তাহলে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যদি একটি ফরজ নামায পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে কি সবগুলো পরিত্যাগের শাস্তি কল্পনা করা যায়?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরয নামায পড়াকে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে নির্ণয় করা যায় যে, ফরয নামাযকে সময় অতিক্রম করতে বিলম্ব করা বা ফরয নামায আদায় করা। তাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মহান আল্লাহ দ্বারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ এক.

তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা সকল প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে তারা তাদের উপর আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং বাচ্চাদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে। যে শিশুদের শুধুমাত্র ফরয নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন এটি তাদের উপর ফরয হয়ে যায় তারা খুব কমই তাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কয়েক বছর লেগে যায়। আর দোষটা

পড়ে পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ওপর। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উত্সাহিত করে।

আরেকটি প্রধান সমস্যা অনেক মুসলমানের মুখোমুখি হয় যে তারা বাধ্যতামূলক নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সঠিকভাবে তা করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং এর পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 757 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে আদৌ নামাজ পড়েনি। অর্থ, তারা তাদের সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং তাই তাদের বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হয়নি। জামে আত তিরমিযী, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার দোয়া কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি নামাজে সঠিকভাবে রুকু বা সেজদা করে না তাকে নিকৃষ্ট চোর বলে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই নম্বর 9, হাদিস নম্বর 75-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান যারা তাদের ফরয এবং অনেক স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করেছে তারা দেখতে পাবে যে তাদের কেউই গণনা করেনি এবং এইভাবে তারা হবে। যারা তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি তাকে হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1313 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

*"... আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।*

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 550 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের এই দাবি করা উচিত নয় যে তারা অন্য ধার্মিক কাজ করছে যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এটি করে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে না তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করছে যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

আলোচ্য মূল হাদিস পূরণের পরবর্তী ধাপ হল স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা।

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি প্রদান করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম। আর এটা তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের নিদর্শন। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

*"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"*

জামে আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সমস্ত মুসলমান তাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে চায়। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের

বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে।

# আমর বিন তাঘলিব (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে কিছু পার্থিব জিনিস দিয়েছেন এবং অন্যদের ছেড়ে দিয়েছেন। বাদ পড়াদের মধ্যে কেউ যখন বিচলিত হয়ে দেখা দিল, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করলেন যে, তিনি কিছু লোককে তাদের অধৈর্যতা ও বিক্ষুব্ধতার ভয়ে দিয়েছিলেন এবং যারা কিছুই দেয়নি, তিনি তাদেরকে কল্যাণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এবং স্বাধীনতা, মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে স্থাপন করেছিলেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে আমর বিন তাগলিব রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী দল থেকে ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 617- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট। যে সর্বদা অধিক জাগতিক জিনিসের প্রয়োজন সে অভাবী, যা গরীবদের জন্য আরেকটি শব্দ, যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট সে অভাবী নয় এবং তাই তাদের কাছে সামান্য সম্পদ বা পার্থিব জিনিস থাকলেও সে ধনী।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তাতে যে সন্তুষ্ট, তাকে অনুগ্রহ প্রদান করা হবে যা তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে এবং এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে, যারা সন্তুষ্ট নয় তারা এই অনুগ্রহ লাভ করবে না যার ফলে তাদের মনে

হবে যেন তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এটি তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তির জন্য যা পছন্দ করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্য। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিৎ, সর্বদা তার বান্দার জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যদি তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

যদি একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করে, যেমন কঠিন সময়ে ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা, তাহলে তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করা হবে।

# শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ)- ১

শাদ্দাদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, প্রায়ই রাতে ঘুমাতে না পেরে একপাশ থেকে অন্য দিকে ঘুরতেন। তখন তিনি মন্তব্য করতেন যে জাহান্নামের আগুন তাকে ঘুমাতে বাধা দেয়। তারপর সকাল পর্যন্ত স্বেচ্ছায় নামাযের জন্য দাঁড়াতেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 632- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মনে রাখার বিষয় হল যে বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যারা জাহান্নামে শেষ হবে তারা তাদের পাপের আকারে এই দুনিয়া থেকে তাদের সাথে জাহান্নামে আগুনের মুখোমুখি হবে। যখন একজন মুসলমান এই বাস্তবতাকে তাদের মনের মধ্যে খোদাই করে, তখন তারা প্রতিটি পাপ, বড় বা ছোট, অসহনীয় আগুনের টুকরো হিসাবে পর্যবেক্ষণ করবে। একজন ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়াতে আগুন এড়িয়ে চলে, সেভাবে তার পাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, কারণ প্রকৃতপক্ষে গুনাহ গুপ্ত আগুনের মতো যা তাকে পরকালে দেখানো হবে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তারা এই মৌখিক সমর্থন ছাড়াই কেবলমাত্র আল্লাহ, মহান, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা দাবি করতে পারে। কর্ম সহ ঘোষণা। যদি এটা সত্য হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এতটা কঠোর পরিশ্রম করতেন না এবং তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম ও বিচার দিবসকে তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে ভালো বুঝতেন। সহজ কথায়, কর্ম ছাড়া প্রেমের ঘোষণা কাউকে জাহান্নাম থেকে

বাঁচাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, কিছু মুসলমান বিচার দিবসে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যে মুসলিমরা ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করা ছেড়ে দেয় তাদের বোঝা উচিত যে তাদের মনোভাব তাদের মৃত্যুর আগে তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে যাতে তারা বিচার দিবসে অমুসলিম হিসাবে প্রবেশ করে , যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

একইভাবে বর্ম ও ঢাল ছাড়া যুদ্ধে প্রবেশ করা যাবে না একজন মুসলমানের সৎকর্মের বর্ম ও ঢাল ছাড়া বিচার দিবসে প্রবেশ করা উচিত নয়। অন্যথায়, যে সৈনিকের কোন সুরক্ষা নেই সে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, একইভাবে একজন মুসলমান যে বিচার দিবসে পৌঁছাবে, যিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা ব্যতীত, যার মধ্যে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। তার নিষেধ এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করা। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা যে বস্তুজগতের ভোগ-বিলাস ও ভোগ-বিলাস উপভোগ করেছে তা জাহান্নামে শেষ হলে তাদের ভালো লাগবে না। আসলে, এটা তাদের খারাপ বোধ করবে।

# আবু তালহা (রাঃ)- ১

আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা তাঁর বাগানে সালাত আদায় করছিলেন। নামাজের সময়, বাগানের মধ্যে একটি পাখিকে উড়তে দেখে তিনি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি কতগুলি প্রার্থনা করেছিলেন। তার নামায শেষ করার পর তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং বাগানটি সদকা করে দিলেন, কারণ এটি তার প্রার্থনা থেকে বিভ্রান্ত হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 149- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি নামাজের চারপাশে একজনের জীবনকে ঢালাই করার এবং এমন জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে যা একজনের নামাজে আপস করতে পারে।

মুসলমানরা প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কিভাবে তারা তাদের পার্থিব জীবনের সাথে মানানসই করার জন্য তাদের বিশ্বাসকে ঢালাই করার পরিবর্তে তাদের জীবনকে তাদের বিশ্বাসের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি অর্জনের একটি উপায় হল মহিলাদের জন্য ফরয নামায পড়ার সাথে সাথেই আদায় করা এবং পুরুষদের জন্য মসজিদে ফরয নামায পড়া। যেহেতু নামাজ কায়েম করা ইসলামের প্রধান স্তম্ভ, যা জামি আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যখন কেউ এটিকে বর্ণনা অনুযায়ী পালন করে তখন এটি তাদের পার্থিব কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করে যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক নামাজের আশেপাশে মানানসই হয়। পক্ষান্তরে, যখন কেউ তাদের ফরজ নামাজ দেরিতে

আদায় করে বা মসজিদের পরিবর্তে ঘরে বসে ফরজ নামাজ আদায় করা সহজ হয়ে যায় তার পার্থিব সময় টেবিলের চারপাশে যা তাদের পার্থিব জীবনে তাদের ঈমানকে ঢালাই করে। সঠিক মনোভাব একজনকে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধা দেবে, যেমন অপ্রয়োজনীয়ভাবে শপিং সেন্টার পরিদর্শন করা, কারণ এটি প্রায়শই একজন মুসলমানকে সময়মতো বা মসজিদে তাদের বাধ্যতামূলক নামাজ পড়তে বাধা দেয়। এই অপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা একজনকে তাদের ধর্মের চারপাশে তাদের জীবনকে ঢালাই করতে দেয়।

উপরন্তু, সময়মত ফরয নামায পড়া যেহেতু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলির মধ্যে একটি, সুনানে আন নাসাই, 611 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের এই অভ্যাসটি মেনে চলা উচিত এবং তাদের ফরয নামায স্থগিত করা উচিত নয়। একটি অত্যন্ত ভাল কারণ ছাড়া যা শুধুমাত্র খুব কমই ঘটে। যদি কেউ তাদের জীবনকে তাদের বিশ্বাসের সাথে ঢালাই করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই সময়মতো তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে হবে যত তাড়াতাড়ি তারা মহিলাদের জন্য হবে এবং পুরুষদের উচিত মসজিদে জামাতের সাথে পূরণ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এই জড় জগতের আধিক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে।

# ফুদাআলা বিন উবায়দ (রাঃ)- ১

ফুদাআলা , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার লোকেদেরকে তারা যে শিক্ষাগুলি শিখেছিলেন তা শিখতে, শেখান এবং সংশোধন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 256-260- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে তবে স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। কেবলমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ে আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা বাস্তবে আমল না করলেও 1000 সাইকেল নামাজ পড়ার সওয়াব পাবে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠরা আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তাদের আচরণ এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম কারণ তারা মহান আল্লাহর উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা তারা বোঝে না। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

## উবাই বিন কাব (রাঃ)- ১

যখন লোকেরা উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করত যে আইনগত বিধি-বিধান সমাজে ঘটেনি, তখন তিনি তাদের বলতেন যে এটি না হওয়া পর্যন্ত তাকে ছেড়ে চলে যেতে এবং তারপরে তিনি তাদের জন্য সঠিক রায় খুঁজে বের করার জন্য নিজেকে চেষ্টা করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 267- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি বুদ্ধিমান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং গবেষণার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিম, 3257 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন কারণ এটি অতীতের জাতিগুলির ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছিল। বরং মুসলমানদের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যা আদেশ করা হয়েছে তা করা এবং যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা।

মুসলমানদের এই মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত নয় কারণ যাদের অনেক বেশি প্রশ্ন করার অভ্যাস রয়েছে তারা প্রায়শই তাদের দায়িত্ব পালনে এবং উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয় কারণ তারা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং গবেষণা করতে ব্যস্ত থাকে। এই মানসিকতা একজন

ব্যক্তিকে এই ধরণের বিষয় নিয়ে তর্ক করতে এবং বিতর্ক করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোভাব আজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ বিস্তৃত কারণ তারা প্রায়শই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ না করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে অ-বাধ্য এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তর্ক করে , সঠিক অর্থ, পরিপূর্ণতা। তাদের সম্পূর্ণ শিষ্টাচার এবং শর্তাবলী সহ।

একজন মুসলমানের উচিত সেই বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করা এবং জিজ্ঞাসা করা যা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় তারা এই হাদীসে বর্ণিত লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং কেবল তাদের নিজের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে।

## উবাই বিন কাব (রাঃ)-২

উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 288- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার

এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

# উবাই বিন কাব (রাঃ)- ৩

একবার যখন উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, তিনি তাঁর সমস্ত সময় আধ্যাত্মিক অনুশীলনে নিবেদিত করতেন এবং তাঁর প্রতি সালাম ও সালাম প্রেরণ করতেন। এবং তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, উত্তর দিলেন যে তার সমস্ত উদ্বেগের যত্ন নেওয়া হবে এবং তাকে ক্ষমা করা হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৭ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 484 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসে যে ব্যক্তি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সে সেই ব্যক্তি হবে যে তার প্রতি সর্বাধিক দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। .

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ পবিত্র কুরআনে মৌখিকভাবে আদেশ করা হয়েছে এবং অনেক হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, ৩৩৭০ নম্বরে পাওয়া যায়। অধ্যায় ৩৩ আল আহজাব, আয়াত ৫৬ :

*"নিশ্চয়ই, আল্লাহ নবী এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি বরকত বর্ষণ করেন [তাঁকে তা করতে বলেন]। হে ঈমানদারগণ, তাঁর প্রতি রহমত প্রার্থনা কর এবং [আল্লাহর কাছে] শান্তি প্রার্থনা কর।"*

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি সঠিকভাবে তার প্রতি আশীর্বাদ ও অভিবাদন পাঠাতে চায় তবে তাদের অবশ্যই তার ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে তাদের কথাকে সমর্থন করতে হবে। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঐতিহ্যের অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস করা উচিত নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম পদক্ষেপ যা একজনকে পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াত, অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 31 নং আয়াতটি পূরণ করার অনুমতি দেয়:

*"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

তাদের পার্থিব কর্তব্যকে অবহেলা না করে এই জড় জগতের উপর পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে দেয় । অর্থ, এটা তাদের দেখাবে কিভাবে সঠিকভাবে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করা। এটি একজনকে প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে নেভিগেট করার অনুমতি দেবে যে সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা অসুবিধার সময় হোক না কেন নিজেকে বস্তুজগত, তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা বা অন্যান্য লোকেদের কাছে নিবেদিত করার ক্ষেত্রে অতিবাহিত না হয়ে। এই মনোভাব তাদেরকে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের সঠিক জায়গায় স্থাপন করার অনুমতি দেবে কোন কিছু বা কোন ব্যক্তির প্রতি অবহেলা বা অতিরিক্তভাবে নিজেকে নিবেদিত না করে।

মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এমন কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন না, যা অনুসরণ করা ও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

*"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"*

প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী এটি অর্জন করতে পারে তবে এর জন্য একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন যা কর্ম দ্বারা সমর্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের প্রকৃত অর্থ এটাই।

# উবাই বিন কাব (রাঃ)- ৪

উবাই বিন কাআব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে তারা যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন, তখন তারা এক সম্মুখে এবং এক আকাঙ্খা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পরই তারা ডানে-বামে ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৩৪ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সময়ের সাথে সাথে লোকেরা প্রায়শই বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে তারা যে শক্তিশালী সংযোগ ছিল তা হারিয়ে ফেলে। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যেখানে, বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

*"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."*

# উবাই বিন কাব (রাঃ)-৫

উবাই বিন কাআব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার লোকদেরকে এর উপর জ্ঞান অর্জন এবং অনুশীলন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারা এটি দিয়ে নিজেদেরকে সুন্দর করার জন্য এটি খোঁজা উচিত নয়। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে এমন একটি সময় আসতে পারে যখন জ্ঞানকে পোশাকের মতোই স্ব-সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করা হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বারের জামে বায়ান আল ইলম ওয়া-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ফাদলুহু , 2/8।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আলেমদের দেখানোর জন্য, অন্যের সাথে তর্ক করার জন্য বা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। নরকে।

যদিও, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সমস্ত কল্যাণের ভিত্তি হল জ্ঞান হল মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকৃত হবে যখন তারা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সমস্ত কারণ শুধুমাত্র পুরস্কার এবং এমনকি শাস্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরনের গাছে পড়ে। ফল গাছের মতো অন্যদের উপকার করার জন্য কিছু গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে।

অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে এবং কাঁটাযুক্ত গাছের মতো অন্যদের জন্য উপদ্রব হয়ে ওঠে। যদিও, বৃষ্টির জল উভয় ক্ষেত্রেই একই তবে ফলাফল খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তবে তা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতভাবে, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে তবে তা তাদের পরিত্রাণের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুসলমানদের উচিত সকল বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় সংশোধন করা কারণ তাদের এ বিষয়ে বিচার করা হবে। এটি সহীহ বুখারি, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন আলেম যিনি শুধুমাত্র অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, শুধুমাত্র সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে দরকারী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর কাজ করাই প্রকৃত উপকারী জ্ঞান।

যে ব্যক্তি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই জ্ঞান গোপন করবে বিচারের দিন তাকে আগুনে লাগাতে হবে। জামি আত তিরমিযী, 2649 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের উপকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে হবে। এটা নিছকই বোকামি, কারণ এটি এমন একটি সৎ কাজ যা একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 241 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে শেয়ার করেছিল তারা মানবজাতির আলেম ও শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

# আমর ইবনুল আস (রাঃ)- ১

মিশর অভিযানের সময় মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়ার রাজার সাথে বৈঠক করেন। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মিশন এবং কিভাবে মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন তা জানিয়েছিলেন। বাদশাহ জবাব দিলেন যে, মহান আল্লাহ, মহানবী (সাঃ) তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং যখন তারা তাদের নবীদের শিক্ষা মেনেছেন, তখন মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেছেন। কিন্তু যখন তারা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আচরণ করতে শুরু করল তখন তারা তাদের নবী (সা.)-এর শিক্ষা ত্যাগ করল। তিনি আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ তিনি এবং মুসলমানরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা অনুসরণ করবেন, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের সকল শত্রুর উপর বিজয় দান করবেন। কিন্তু যখন তারা এই শিক্ষা ত্যাগ করবে তখন তারা অন্য জাতির মতো হবে। আমর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, মন্তব্য করেছেন যে তিনি তার চেয়ে ভাল উপদেশ দেওয়ার পরে এমন কারো সাথে কথা বলেননি। ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর , হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 681-682- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কমেছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে যে এটি তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লাভের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলিমরা যে দুর্বলতা ও শোক অনুভব করছে তা দূর করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

*" সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"*

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উভয় জগতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন অন্যের জন্য ভালোবাসা, যা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামিক শিক্ষা ও আমল করতে হবে। শিক্ষা এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আর মুসলমানরা যদি তা অর্জন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করে তাদের উচিত এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা এবং এর উপর আমল করা।

# আমর ইবনুল আস (রাঃ)- ২

আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কে এবং তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে যিনি সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং অতীতে যা ঘটেছিল তা থেকে শিক্ষা নিয়ে কী ঘটতে চলেছে তা জানেন। ইবনু আবদে রাব্বিহ এর আল ইকাদ আল ফরিদ, ২/৯৭ এ আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের নিজেদের পার্থিব বিষয়ে খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটছে এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী কারণ এটি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা ফলস্বরূপ একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন তখন তাদের কেবলমাত্র প্রার্থনা করা হলেও, তাদের যে কোন উপায়ে তাদের সাহায্য করা উচিত নয়, তবে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি চিন্তা করা উচিত এবং বুঝতে হবে যে তারাও শেষ পর্যন্ত তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারাবে। একটি অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যু দ্বারা। এটি তাদের তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাবে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি।

যখন তারা একজন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখেন তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য দুঃখ বোধ করা উচিত নয় বরং তারা বুঝতে পারে যে একদিন তাদের অজানা তারাও মারা যাবে। তাদের বোঝা উচিত যে ধনী

ব্যক্তিকে যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার তাদের কবরে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তারাও তাদের কবরে কেবল তাদের কৃতকর্ম নিয়েই থাকবে। এটি তাদের কবর ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব একজন পর্যবেক্ষণ করে এমন সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত। একজন মুসলমানের উচিত তাদের চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

*"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""*

যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং যারা তাদের পার্থিব জীবনে খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা উদাসীন থাকবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

# আমর ইবনুল আস (রাঃ) – ৩

আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে একজন সত্যিকারের সহনশীল ব্যক্তি অন্যের প্রতি সহনশীল হয় যখন তারা তার প্রতি অসহিষ্ণু হয়। ইমাম আবু লাইছ সমরকান্দীর তানবীহুলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে গাফিলীন , সাদ/105।

মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু একজন মুসলিমকে বিশেষ করে তোলে যখন তারা মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দেয়। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করা কোনভাবেই একজন ব্যক্তির পদমর্যাদা হ্রাস করবে না। অন্যথায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে আমল করতেন না। প্রকৃতপক্ষে, জামি আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যখন কেউ মন্দের জবাব ভাল দিয়ে দেয়, যেমন অন্যকে ক্ষমা করা, মহান আল্লাহ তাদের সম্মানে উন্নীত করেন । সুতরাং এই মনোভাব শুধুমাত্র অন্যদের উপকারে আসে না বরং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি মুসলমানদের নিজেদের উপকার করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

*" এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"*

উপরন্তু, এই আয়াত দ্বারা উপদেশ হিসাবে কেউ যদি এই মনোভাব অবলম্বন করে তারা দেখতে পাবে যে যারা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না তারা অবশেষে তাদের কর্মের জন্য লজ্জিত হবে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবে। এমনকি সবচেয়ে কঠিন হৃদয়ও শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হয় যখন এই পদ্ধতিতে চিকিত্সা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করেন তখন তার পক্ষে নেতিবাচক উত্তরের ঊর্ধ্বে উঠে তার পরিবর্তে একটি সুন্দরভাবে উত্তর দেওয়া ভাল। এতে স্বামী তার স্ত্রীকে আরও বেশি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণ হবে। কর্মক্ষেত্রে একজন সহকর্মী যখন খারাপ আচরণ দেখায় তখন তাকে উত্তম আচার-ব্যবহার করে একজন সত্যিকারের মুসলমানের গুণ দেখান । যখন কেউ এইরকম আচরণ করে তখন তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের আরও বেশি শ্রদ্ধা করবে এবং ভালবাসবে যা তাদের জীবনকে আরও সহজ করে তুলবে। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেয় তখন সে সবসময় অন্যদের কাছ থেকে আরও মন্দের মুখোমুখি হয় যা উভয় জগতেই তাদের জীবনকে কঠিন করে তুলবে। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এটি সম্পর্কে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন একজনকে নিজেকে রক্ষা করা এবং ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ চরিত্রের জবাব ভালো চরিত্র দিয়ে দিতে হবে।

# আমর ইবনুল আস (রাঃ)- ৪

সপ্তম বছর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধাত আস সালাসিলে একটি সামরিক অভিযানের নেতা নিযুক্ত করা হয় । আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য অনেক সিনিয়র সাহাবীকে সাধারণ সৈনিক হিসাবে অভিযানে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একটি শীতল রাতে আমর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তার লোকদেরকে কোন আগুন না জ্বালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ তিনি চাননি যে শত্রুরা তাদের দেখতে পাবে। এর ফলে শত্রুপক্ষের অপ্রত্যাশিত আক্রমণ হতে পারে। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাঁর আদেশের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে পারেননি এবং তাঁর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, যেমন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। কিন্তু আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের শান্ত করেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের নেতা নিযুক্ত করেছেন কারণ তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নেতার প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা । এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের

সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে , এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."*

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

# আমর ইবনুল আস (রাঃ)-৫

খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব, আমর ইবনে আল আস , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মিশরের দিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, যা রোমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। যখন তিনি এর একটি শহর আল ফার্মা জয় করেন, তখন তিনি তার সৈন্যদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মিশরের জনগণকে জানা উচিত যে তারা শান্তির সৈন্য এবং তারা যেন দেশে কোনো দুর্নীতি না করে। পরিবর্তে, তাদের উচিত এর বিষয়গুলি সংশোধন করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা থেকে একটি উত্তম উদাহরণ স্থাপন করা। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 312-313- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুর্নীতি হল যখন একজন ব্যক্তি তার কাছে থাকা আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, বিশেষ করে তাদের সামাজিক প্রভাব, পার্থিব জিনিস, যেমন ক্ষমতা এবং সম্পদ লাভের জন্য। এটি মহান আল্লাহর প্রতি একজন মুসলমানের কর্তব্যকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের বিরুদ্ধে অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন নিপীড়ন।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে যখন সাধারণ জনগণ একে অপরের সাথে আর্থিকভাবে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচারী নেতা নিয়োগ করে তাদের শাস্তি দেন। এই নিপীড়নের একটি দিক হলো দুর্নীতি যা সাধারণ জনগণকে চরম দুর্ভোগের কারণ। একই হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হবে যারা তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। আবার, এটি দুর্নীতির একটি দিক যেখানে প্রভাবশালী

ব্যক্তিরা, যেমন সরকারি কর্মকর্তারা পরিণতির ভয় ছাড়াই অন্যের জিনিসপত্র অবাধে নিয়ে যায়। যখন সাধারণ জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তখন তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা এই আচরণকে সাধারণ জনগণ গ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করে একইভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয় । এটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ করার সাহস করবে না এবং সাধারণ জনগণ এর পক্ষে দাঁড়াতে পারবে না। এবং পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদিস অনুসারে, সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের প্রভাবশালী পদে লোক নিয়োগ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবেন যারা ন্যায়বিচারে রয়েছেন।

বিশ্বে পরিলক্ষিত ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অন্যকে দোষারোপ করার অপরিপক্ক পথ গ্রহণ না করে মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের আচরণের প্রতি সত্যিকারভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তাদের মনোভাব সামঞ্জস্য করা। তা না হলে সময়ের সাথে সাথে সমাজে দুর্নীতি বাড়বে। কেউ বিশ্বাস করবেন না যে তারা প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে না থাকায় সমাজে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত দুর্নীতি সাধারণ জনগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে ঘটে এবং তাই সাধারণ জনগণের ভালো আচরণের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

*"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."*

## আমর ইবনুল আস (রাঃ)- ৬

মিশরে অভিযানের সময়, বলবিস বিজয়ের ফলে মিশরের শাসকের কন্যাকে বন্দী করা হয়। মুসলিম জেনারেল, আমর ইবন আল আস , তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর সৈন্যদেরকে কল্যাণের সাথে নেকীর প্রতিদান দেওয়ার ইসলামী নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: অধ্যায় 55 আর রহমান, আয়াত 60:

*"ভালোর প্রতিদান কি ভাল ছাড়া [কিছুই]?"*

তারপর তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে মিশরের শাসক বহু বছর আগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের উচিত এই অনুগ্রহের প্রতিদান তাঁর কাছে তাঁর কন্যা এবং তাঁর সাথে বন্দী হওয়া সমস্ত লোককে পাঠিয়ে দেওয়া এবং সম্পদ। যা তার সাথে জব্দ করা হয়েছে। তারা এতে সম্মত হয় এবং তার বাবা মুসলমানদের আচরণে সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 314-316- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে সকল নেয়ামতের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নয়, মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ কখনো কখনো একজন ব্যক্তিকে তার পিতামাতার মতো অন্যদের সাহায্য করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন। যেহেতু মাধ্যমগুলো মহান আল্লাহ সৃষ্টি ও ব্যবহার করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং সর্বদা অন্যদের কাছ থেকে যে কোনো সাহায্য বা সমর্থন প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, তার আকার নির্বিশেষে। তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুযায়ী নেয়ামতকে ব্যবহার করে তিনিই আশীর্বাদের উৎস এবং সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত কারণ তারাই আল্লাহর সৃষ্টি ও মনোনীত মাধ্যম। একজন মুসলমানের উচিত মৌখিকভাবে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কার্যত তাদের উপায় অনুযায়ী তাদের দয়ার কাজটি শোধ করা যদিও তা তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাই হয়। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 216 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না এবং তাই তাকে নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

যদি একজন মুসলমান আশীর্বাদ বৃদ্ধি করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে, যেমন আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি।

# আমর ইবনুল আস (রাঃ)- ৭

ফুসতাতে প্রথম জুমার খুতবার সময় , আমর ইবনে আল আস , তাঁর সাথে, মুসলমানদের স্থানীয়দের সাথে ভাল আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ তাদের সাথে তাদের শান্তির চুক্তি হয়েছিল এবং তারা তাদের সাথে বিবাহের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছিল। (তাদের পূর্বপুরুষের মাধ্যমে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী, হাজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি মিশরীয় ছিলেন)। তিনি মুসলমানদেরকে তাদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের দৃষ্টি নত করে তাদের নারীদের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 342- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

# আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ)- ১

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন যে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৭৬৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4860 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার বিরুদ্ধে লোকদের সতর্ক করেছেন কারণ এটি মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এটা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যায়। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি সবচেয়ে বড় অভিযোগ, যেমন বাবা-মা প্রায়ই থাকে। তারা ভাবছে কেন তাদের সন্তানরা আলাদা হয়ে গেছে যদিও তারা একসময় দৃঢ়ভাবে একসাথে ছিল।

আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল কারণ কেউ একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছে। এটি প্রায়শই পরিবারের সদস্য দ্বারা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার অন্য সন্তানের কাছে তার ছেলে সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবেন। এতে দুই আত্মীয়ের মধ্যে শত্রুতা বাড়ে এবং সময়ের সাথে সাথে তা গড়ে ওঠে এবং

উভয়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। যারা এক সময় একজনের মতো ছিল তারা একে অপরের অপরিচিতের মতো হয়ে যায়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ ফেরেশতা নয়। খুব অল্প কিছু বাদে, যখন একজন ব্যক্তির কাছে অন্যের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক কথা বলা হয় তখন তারা এটি ঘটতে না চাইলেও তারা এতে প্রভাবিত হবে। এই শত্রুতা এখনও ঘটবে এমনকি যদি প্রাথমিক ব্যক্তি যে কারো আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছিল সে আত্মীয়দের মধ্যে ফাটল তৈরি করতে চায় না। কেউ কেউ প্রায়শই অভ্যাসের বাইরে এইভাবে কাজ করে এবং সম্পর্কের ক্ষতি করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা প্রায়শই এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ুক বা ভেঙে যাক।

এই মনোভাব মানুষের মানসিকতার উপর এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে এটি এমন আত্মীয়দেরও প্রভাবিত করে যারা একে অপরের সাথে খুব কমই দেখা বা কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক জিনিসগুলি উল্লেখ করবে যদিও তার আত্মীয় এমনকি তাদের মতো একই দেশে বাস নাও করতে পারে। এই আচরণ তাদের হৃদয়ে শত্রুতা জাগিয়ে তোলে এবং সময়ের সাথে সাথে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের দূরবর্তী আত্মীয়কে অপছন্দ করে যদিও তারা তাদের খুব কমই জানে।

এই সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে যখন দুজন ব্যক্তি অন্য লোকেদের সামনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যদিও, তারা তাদের সন্তানদের সরাসরি কিছু বলছে না,

এটি এখনও তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যদি কেউ সত্যিই এক মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয় তবে তারা বুঝতে পারবে যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ অসুস্থ অনুভূতি সেই ব্যক্তি যা করেছে বা তাদের সরাসরি বলেছে তার কারণে হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি একটি তৃতীয় পক্ষের কারণে ঘটেছে যারা তাদের কাছে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু উল্লেখ করেছে।

এমন ক্ষেত্রে যেখানে একজন অন্যকে বিপদের বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করছে, তখন অন্য ব্যক্তিকে নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। যদি কেউ অন্য ব্যক্তিকে একটি পাঠ শেখানোর চেষ্টা করে, উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের একজনকে তাদের ভাইবোনের মতো আচরণ না করতে শেখাতে চান তবে তাদের উচিত মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ব্যক্তির নাম না করে নেতিবাচক জিনিস উল্লেখ করুন। এই সুন্দর মানসিকতার একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির নাম না করে একটি নেতিবাচক জিনিস উল্লেখ করা কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের আত্মীয় বা অন্যদের সম্পর্কে, ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে নেতিবাচক কথা বলার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা । অন্যথায়, তারা ভালভাবে দেখতে পারে যে সময় কাটানোর সাথে সাথে তাদের পরিবার আলাদা হয়ে যায় এবং একে অপরের থেকে মানসিকভাবে দূরে থাকে।

# আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) – ২

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ঘৃণা করেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৭৬৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভন্ডামির লক্ষণ হল একজন ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়ায়। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একটি পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ হওয়া সমস্ত সামাজিক স্তরকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের ব্যক্তি লোকেদের ভালোর জন্য একত্রিত হতে দেখতে অপছন্দ করেন কারণ এটি অন্যদের পার্থিব মর্যাদা তাদের নিজের থেকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি তাদের গীবত এবং অপবাদের দিকে চালিত করে যাতে লোকেরা একে অপরের বিরুদ্ধে পরিণত হয়। তাদের মন্দ মনোভাব তাদের আত্মীয়তার বন্ধনকে ধ্বংস করে এবং যখন তারা সুখী অন্য পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করে তখন তাদের সুখকেও নষ্ট করে দেয়। তারা দোষ সন্ধানকারী যারা তাদের সামাজিক মর্যাদা নিচে টেনে আনতে অন্যের ভুল উন্মোচন করার জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে। তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা অন্যদের সম্পর্কে গসিপ করা শুরু করে এবং যখনই ভালো কথা বলা হয় তখন বধির আচরণ করে। শান্তি এবং শান্ত তাদের বিরক্ত করে তাই তারা নিজেদের বিনোদনের জন্য সমস্যা তৈরি করতে চায়। তারা সুনানে ইবনে মাজা, 2546 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এটি উপদেশ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যের দোষ ঢেকে রাখবে, মহান আল্লাহ তাদের দোষগুলো ঢেকে দেবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজবে এবং উন্মোচন করবে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। সুতরাং বাস্তবে, এই ধরনের ব্যক্তি সমাজের কাছে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের দোষগুলো উন্মোচন করছে যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যের দোষগুলো প্রকাশ করছে।

# আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) – ৩

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে, একজন পরিকল্পনাকারী সেই গর্তে পড়ে যাবে যা তারা অন্য ব্যক্তির জন্য খনন করে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৭৭০ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজনের কখনই একটি মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

*“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."*

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে, মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের

জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

*"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ[অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?*

# সালেম মাওলা আবু হুদাইফা (রা.)- ১

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সালেম মাওলা আবু হুতাইফা , আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৯৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সত্যিকারের ভালবাসার সাথে আন্তরিকতা জড়িত।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত 5।

*"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি...।"*

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

*"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না...।"*

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# সালেম মাওলা আবু হুদাইফা (রাঃ) – ২

খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, আবু হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মুক্তকৃত ক্রীতদাস সালেম যদি সেই সময়ে জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি তাঁকে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করতেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা পৃষ্ঠা ১৪১- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে প্রকৃত আভিজাত্য একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের শক্তিতে নিহিত।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের

মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি

বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

# আবু হুরায়রা (রাঃ)- ১

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার কাউকে (স্বল্প) শীতের দিনে স্বেচ্ছায় রোজা রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং একে সহজ লুঠ বলে উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১০৪০ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত সমস্ত সৎ কাজ নিজের জন্য করা হয় কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি তা করবেন। সরাসরি পুরস্কৃত করুন।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস হল একটি অনন্য ধার্মিক কাজ কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ শুধুমাত্র তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয়

এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

*"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."*

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত ঈমানদার হবে না কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

*"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজাও পূর্ণ না করে তাহলে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। সারাজীবন রোজা রাখলেও সওয়াব ও আশীর্বাদ হারিয়ে যায়।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত রোজা সঠিকভাবে তাকওয়া বাড়ে. অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া

তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন তারা রোজা রাখে এই অভ্যাসটি শেষ পর্যন্ত তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা সত্ত্বেও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, সিয়ামের

সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবেও রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখা উচিত, এবং এর পরিবর্তে ভাগ্য ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে জানার জন্য নিয়ে আসে, মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন যদিও তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং অন্যদের না জানানো যদি এটি পরিহারযোগ্য হয় কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

# আবু হুরায়রা (রাঃ)- ২

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং দিনে বারো হাজার বার তাঁর কাছে তওবা করেছেন। তিনি যোগ করেছেন যে প্রতিটি বিশ্বাসী তাদের ধর্মীয় অঙ্গীকারের স্কেল অনুসরণ করে তা করে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১০৪৩ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3540 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিস মহান আল্লাহর ক্ষমার গুরুত্ব ও বিশালতার পরামর্শ দেয়। হাদিসের প্রথম অংশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁর রহমতের আশায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের ক্ষমা করবেন।

এই প্রতিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনে সমস্ত বৈধ প্রার্থনার জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে কেবল ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নয়। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

*"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"...*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে প্রার্থনা একটি ইবাদত অর্থ, একটি সৎ কাজ। সুনানে আবু দাউদ, 1479 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যতক্ষণ না তা বৈধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি দোয়া বিভিন্ন উপায়ে কবুল হয়। ব্যক্তিকে হয় তারা যা অনুরোধ করেছে তা মঞ্জুর করা হবে বা পরকালে তাদের জন্য একটি পুরস্কার সংরক্ষিত থাকবে বা তাদের সমতুল্য পাপ ক্ষমা করা হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই দোয়ার শর্ত ও শিষ্টাচারগুলো পূরণ করতে হবে।

একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বড় মিনতি হল ক্ষমার জন্য কারণ এটি একজনের আশীর্বাদ পাওয়ার, দুনিয়ার অসুবিধা এড়ানো এবং জান্নাত লাভের এবং পরের পৃথিবীতে জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়। অধ্যায় 71 নূহ, আয়াত 10-12:

*“আর বললেন, তোমার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। প্রকৃতপক্ষে, তিনি চিরস্থায়ী ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করবে এবং তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহের ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের জন্য নদী প্রবাহিত করবে।"*

আলোচনার প্রধান হাদিস দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর অসীম রহমতের আশা করা, যখন প্রার্থনা করা ক্ষমার শর্ত। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, তাঁর সম্পর্কে তাঁর বান্দার মতামত অনুসারে কাজ করেন, যা সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি হল যখন একজন মুসলমান কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা করে যে, তাদেরকে পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিবেন এই জেনে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের ক্ষমা করতে বা শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, মানুষ যত পাপই করুক না কেন মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা তার চেয়ে বড়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সীমাহীন তাই একজন ব্যক্তির সীমিত পাপ কখনই এটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যা প্রার্থনা করে তা বড় করে দেখানোর জন্য, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এত বড় কিছুই নেই। এটি সহীহ মুসলিম, 6812 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে, যা অনেক আয়াত ও অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষমা চাওয়ার এই কাজটি আন্তরিক অনুতাপের একটি অংশ। এটা বোঝা যায় যে ক্ষমা চাওয়া জিহ্বার একটি কাজ এবং বাকি আন্তরিক অনুতাপ কর্মের মাধ্যমে পাপ থেকে দূরে সরে যাওয়া জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত অনুশোচনা অনুভব করা, আবার পাপ না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করা। এটা মনে রাখা জরুরী যে, একই পাপের উপর অবিচল না থাকা তাওবা কবুল হওয়ার শর্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 135:

*“এবং যারা, যখন তারা কোন অনৈতিক কাজ করে বা [অপরাধের মাধ্যমে] নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে - এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? - এবং [যারা] তারা যা করেছে তার উপর স্থির থাকে না যখন তারা জানে।"*

একজন মুসলমানের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ, প্রতিটি অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ এবং এমন জায়গা থেকে সমর্থনের দিকে নিয়ে যায় যেখানে কেউ আশা করতে পারে না। সুনানে আবু দাউদ, 1518 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণ, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। মহান আল্লাহর সাথে শরীক করা দুই প্রকার: বড় শিরক এবং ছোট শিরক। প্রধান ধরন হল যখন কেউ আল্লাহ, মহান বা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ সংস্করণ হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কাজ করে, যেমন প্রদর্শন করা। সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে, বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাকে বলবেন যে, তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে তারা দেখতে পাবে যে তারা শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে উন্মোচিত হবে এবং তারা অন্যদের সাথে যতই ভাল আচরণ করুক না কেন তারা তাদের প্রকৃত ভালবাসা বা সম্মান অর্জন করতে পারবে না। তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭০৫ নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যখন কেউ মহান আল্লাহর একত্বকে উপলব্ধি করে , তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য চিন্তা করে, কাজ করে এবং কথা বলে, ভয় ও ভালোবাসার কারণে। এই আচরণ পাপ করার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় এবং যা কিছু গুনাহ ঘটবে তা মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, ৩৭৯৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই এই বক্তব্য সকল অন্যায় কাজ দূর করে দেয়।

এই আচরণটি সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত। এর ভিত্তি হচ্ছে মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা।

# আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ)- ১

একবার মক্কার একজন অত্যন্ত সম্মানিত অমুসলিম নেতা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথোপকথন করছিলেন। পরেরটি তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি করাতে আগ্রহী ছিল কারণ এর অর্থ তার পুরো গোত্রও তাকে ইসলামে অনুসরণ করবে। তাদের কথোপকথনের সময় একজন অন্ধ ও দরিদ্র সাহাবী, ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু, অজান্তে তাদের কথোপকথনে বাধা দিয়েছিলেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তাকে ইসলাম সম্পর্কে আরও শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিম নেতার সাথে তার কথোপকথন বন্ধ করতে চাননি তিনি সাময়িকভাবে দরিদ্র সাহাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাকে উত্তর দেননি। আশা করি তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন এবং পরে ফিরে আসবেন। এই মুহুর্তে, মহান আল্লাহ, অধ্যায় ৪0 আবাসা, আয়াত 1-10 অবতীর্ণ করেছেন:

*" তিনি [অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ভ্রুকুটি করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন । কারণ সেখানে অন্ধ লোকটি তার কাছে এসেছিল। কিন্তু আপনি কি উপলব্ধি করবেন যে সম্ভবত তিনি পবিত্র হতে পারেন। নাকি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে এবং স্মরণ করলে তার উপকার হবে? যে নিজেকে বিনা প্রয়োজনে ভাবে। আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিন। আর তোমার উপর [কোন দোষ নেই] যদি সে পবিত্র না হয়। কিন্তু যিনি আপনার কাছে এসেছেন [জ্ঞানের জন্য] চেষ্টা করে। যখন সে [আল্লাহকে] ভয় করে। তার থেকে তুমি বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছ।"*

ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 36-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

# আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ)- ২

যখনই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে বিদায় নিতেন, তিনি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সর্বদা এর কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে নিয়োগ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, তিনি বুহরান নামক স্থানে একটি অভিযানের জন্য রওনা হন এবং একজন অন্ধ ও দরিদ্র সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুমকে নিযুক্ত করেন , আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। তার সাথে মদীনার দায়িত্বে ছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 2 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

*"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."*

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

# যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাদের একদল তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে একটি কূপ ঘিরে ফেলে। কূপের আশেপাশের এলাকা উপচে পড়ায় দু'জন সাহাবী (রা.) ছোটখাটো ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এই সুযোগটি নিয়ে আরও বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এই দাবি করে যে, মক্কার হিজরতকারীরা তাদের সমস্যা সৃষ্টি করছে। মক্কার হিজরতকারীদের মদিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য তিনি অন্যান্য মুনাফিকদের সমালোচনা করতে শুরু করেন। জায়েদ বিন আরকাম ( রাঃ) নামে এক শিশু তার খারাপ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খবর দিল। আবদুল্লাহ বিন উবাইকে তলব করা হয়েছিল কিন্তু তিনি বিশাল শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি এই শব্দগুলি কখনও বলেননি। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 213-214-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিমুখী হওয়া ভন্ডামির লক্ষণ। এই সেই ব্যক্তি যে তাদের আচরণ পরিবর্তন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করার জন্য যাতে কিছু পার্থিব জিনিস লাভ করার ইচ্ছা থাকে। তারা বিভিন্ন লোকেদের প্রতি তাদের সমর্থন দেখিয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তাদের প্রতি অপছন্দকে আশ্রয় করে। তারা লোকদের প্রতি আন্তরিক হতে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যদি তারা তাওবা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা পরকালে নিজেদেরকে আগুনের দুটি জিভ দিয়ে দেখতে পাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 14:

*“যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন তারা বলে: “আমরা ঈমান এনেছি” কিন্তু যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সাথে দেখা করে (গোপনে), তারা বলে: “নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা নিছক ঠাট্টা করছিলাম।"*

# সাফওয়ান বিন আল মুআত্তাল (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বনুদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। আল মুসতালিক । তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর সাথে ছিলেন। যাত্রার সময় মহিলারা একটি ছোট বগির ভিতরে বসতেন যা একটি উটের উপর স্থাপন করা হত। সেনাবাহিনী যখন আয়েশা (রা.) শিবির স্থাপন করেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন নিজেকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য চলে যান এবং ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ফেরার সময় সে লক্ষ্য করল তার নেকলেস হারিয়ে গেছে। তারপরে তিনি এটি না পাওয়া পর্যন্ত তার পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করেছিলেন। যখন তিনি আবার ক্যাম্পে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে তারা তাকে ছাড়াই চলে গেছে। এটি ঘটেছিল যখন একটি উটের উপর তার বগি স্থাপন এবং বেঁধে রাখার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছিল যে সে ইতিমধ্যে ভিতরে রয়েছে। সাফওয়ান বিন আল মুয়াত্তাল (রাঃ) একজন সাহাবী, সাফওয়ান বিন আল মুআত্তাল (রাঃ) এর পাশ দিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি পরিত্যক্ত ক্যাম্পসাইটে ছিলেন। তাকে সেনাবাহিনী থেকে পিছিয়ে যাওয়ার এবং ভ্রমণকারী সেনাবাহিনী থেকে অজান্তে পড়ে থাকা যে কোনও লাগেজ তুলে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি আয়েশাকে চিনতে পারলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, যেমনটি তিনি তাকে দেখেছিলেন ইসলামে নারীদের পর্দা করা ফরজ হওয়ার আগে। তিনি সসম্মানে তাকে তার উটটি চড়ার প্রস্তাব দিলেন যখন তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। যখন তারা সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছল তখন লোকেরা আয়েশাকে সাক্ষী করল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করছেন। এই সুযোগে মুনাফিকরা তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে এবং লোকেরা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। মদিনায় অপবাদের প্রভাব যখন তীব্র হয় তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসেন এবং সদয়ভাবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মহান আল্লাহ যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তওবা করে তাকে ক্ষমা করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কথাগুলো শোনা মাত্রই তিনি কান্না বন্ধ করে দিলেন। তিনি তার পিতামাতার জন্য অপেক্ষা

করেছিলেন যেন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করেন, কিন্তু তার প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার কারণে তারা নীরব ছিলেন। তারপর তিনি সরাসরি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন, ঘোষণা দিয়ে যে তিনি যা করেননি তা তিনি কখনই স্বীকার করবেন না এবং তার একমাত্র বিকল্প ছিল হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মতো ধৈর্য ধরে থাকা। পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হারানোর সময় তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে, এমনকি তাঁর আসন থেকে উঠার সুযোগ পেয়েছিলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা এমন আয়াত নাজিল করেছিলেন যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুক্ত ও সম্মানিত করেছিল এবং যারা তাদের কঠোর সমালোচনা করেছিল। শুরু করেন এবং তার বিরুদ্ধে অপবাদে অংশ নেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 11-26:

*“নিশ্চয় যারা মিথ্যা নিয়ে এসেছে তারা তোমাদেরই একটি দল। এটা তোমার জন্য খারাপ মনে করবেন না; বরং, এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক... তারা [অর্থাৎ, নিন্দুকদের] যা বলে তারা নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহৎ রিযিক।"*

ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 220-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

*"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে আমরা একে সৃষ্টি করার আগে তা একটি রেজিস্টারে থাকে - প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."*

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলমানের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে আফসোস করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তান তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে। একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থেই বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না। অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলমানকে বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ তৃপ্তি।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর কাজ করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি অবস্থাই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল বা সন্তুষ্ট আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ও সিদ্ধান্তে, সহজ ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলমান কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

*"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"*

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে আচরণ করা, যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করবে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তেতো ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জেনে তাদের গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান তাদের যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবেন।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি পর্যালোচনা করা, যা ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে দেওয়া পুরস্কারের বিষয়ে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা একজন মুসলিমকে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সময়

অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের উৎকর্ষ হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

*"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"*

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন একজন কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবে না যার ভয় ছিল, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

# আবু জান্দাল (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, যাতে তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করা যায় তবে কিছু শর্ত স্থির করা হয়। যার একটি ছিল মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণকারী কেউ মদিনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গেলে তাদের মদিনায় ফেরত পাঠানো হবে না। যখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন একজন সাহাবী আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি মক্কায় বন্দী ছিলেন, তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছান। কিন্তু চুক্তিটি সম্মত হওয়ায় আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় ফিরে যেতে হয়েছিল এবং অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মদীনায় যেতে পারেননি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এটা দেখে সাহাবায়ে কেরামকে খুব কষ্ট দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধৈর্য ধরতে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাকে এবং মক্কায় আটকে থাকা অন্যান্য সাহাবীদের জন্য ত্রাণ ও সাহায্য করবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 229-230-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী অধ্যয়ন করে, তবে তারা বুঝতে পারবে যে এই ঘটনার মতো আলোচিত বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধার সাথে জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

# ইকরিমা ইবনে আবু জাহল (রা.)-১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশাল মুসলিম বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিল, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তারা সেদিন মক্কা জয় করবে। ইসলামের এক কট্টর শত্রু যে প্রথম দিন থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্ষতি করার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করেছিল, ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, মক্কা বিজয়ের দিন থেকে পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তার সুরক্ষার জন্য অনুরোধ করেন, যা তিনি মঞ্জুর করেন। তিনি ইকরিমাকে খুঁজে বের করলেন এবং তাকে কী ঘটেছে তা বললেন। যদিও তার বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিল সে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে তার অতীত আচরণকে উপেক্ষা করেছেন এবং ক্ষমা করেছেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 403-404 এ আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা

বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান

আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"*

# ইকরিমা ইবনে আবু জাহল (রা.)-২

ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় মুসলিম সেনাবাহিনীর অন্যতম নেতা ইকরিমা ইবনে আবু জাহল (রা.) এবং তার অনেক সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। যুদ্ধের ময়দানে শুয়ে তাদের পানীয় জলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা নিজেরা পান করার পরিবর্তে জল-বাহককে আগে অন্যদের দিতে নির্দেশ দিত। ফলে তাদের অনেকেই পানির স্বাদ না খেয়ে মারা যায়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬৭৮-৬৭৯-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ছিল তাদের একে অপরের প্রতি গভীর আন্তরিকতার স্তর।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

*"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."*

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ

থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

*"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."*

# উসমান বিন তালহা (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশাল মুসলিম বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিল, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তারা সেদিন মক্কা জয় করবে। আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু অমুসলিমদের কাছ থেকে নেওয়ার পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসেছিলেন, মহান আল্লাহর ঘর কাবার চাবি নিয়ে। পূর্বে চাবির দায়িত্বে ছিলেন উসমান বিন তালহা। আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে চাবিগুলো নিজের কাছে রাখার অনুরোধ করেন যাতে তিনি কাবার রক্ষক হতে পারেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উসমান বিন তালহাকে তলব করেন এবং তার কাছে চাবি ফিরিয়ে দেন এবং তাকে বলেন যে এই দিনটি তাকওয়া ও ধার্মিকতার দিন। উসমান বিন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 408-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

*"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."*

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ

করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

*"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"*

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

# সাফওয়ান বিন উমাইয়া (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ ) যুদ্ধের জন্য মুসলিম সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও বর্ম ধার দেওয়ার জন্য একজন অমুসলিম সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে অনুরোধ করেছিলেন। সাফওয়ান জিজ্ঞেস করলেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কি এখন মক্কার উপর নিয়ন্ত্রণ করার কারণে বলপ্রয়োগ করে সরঞ্জামাদি নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন? কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এটি কেবল একটি ঋণ এবং তিনি তাকে সবকিছু ফিরিয়ে দেবেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম ইবনে কাথির, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 439-440-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে যখন সাধারণ জনগণ একে অপরের সাথে আর্থিকভাবে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচারী নেতা নিয়োগ করে তাদের শাস্তি দেন। এই নিপীড়নের একটি দিক হলো দুর্নীতি যা সাধারণ জনগণকে চরম দুর্ভোগের কারণ। একই হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হবে যারা তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। আবার, এটি দুর্নীতির একটি দিক যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, যেমন সরকারি কর্মকর্তারা পরিণতির ভয় ছাড়াই অন্যের জিনিসপত্র অবাধে নিয়ে যায়। যখন সাধারণ জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তখন তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা এই আচরণকে

সাধারণ জনগণ গ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করে একইভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। এটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায় । কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ করার সাহস করবে না এবং সাধারণ জনগণ এর পক্ষে দাঁড়াতে পারবে না। এবং পূর্বে উদ্ধৃত হাদিস অনুসারে, সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের প্রভাবশালী পদে লোক নিয়োগ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবেন যারা ন্যায়বিচারে রয়েছেন।

বিশ্বে পরিলক্ষিত ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অন্যকে দোষারোপ করার অপরিপক্ক পথ গ্রহণ না করে মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের আচরণের প্রতি সত্যিকারভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তাদের মনোভাব সামঞ্জস্য করা। তা না হলে সময়ের সাথে সাথে সমাজে দুর্নীতি বাড়বে। কেউ বিশ্বাস করবেন না যে তারা প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে না থাকায় সমাজে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত দুর্নীতি সাধারণ জনগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে ঘটে এবং তাই সাধারণ জনগণের ভালো আচরণের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

*"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."*

## আত্তাব বিন আসীদ (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হুনাইনের বিজয়ের পর কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তায়েফের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়ারত (উমরা) করেন এবং তারপর মদিনায় ফিরে যান। মক্কা ত্যাগ করার সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাব বিন আসিদকে মক্কার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাকে দিনে একটি রৌপ্য মুদ্রার বেতন দিয়েছিলেন। আত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, একজন ব্যক্তিকে ক্ষুধার্ত ও লোভী রাখতে যদি তারা দিনে একটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে সন্তুষ্ট হতে ব্যর্থ হয়। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে সেই দিনটির পরে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তার কাউকে প্রয়োজন ছিল না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 500-501-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক,

বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

# ধু আল বিজাদায়েন (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করতে এবং প্রয়োজনে মহান বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সাম্রাজ্য। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। অভিযানের সময় একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে আলো দেখতে পেলেন। যখন তিনি অনুসন্ধান করতে সেখানে গেলেন তখন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), আবু বকর সিদ্দিক এবং উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) কে দেখতে পেলেন, তিনি একজন সাহাবী যুল বিজাদায়েনের জন্য একটি কবর খনন করছেন। তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যিনি মারা গেছেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে ছিলেন যখন আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা যুল বিজাদায়েন রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর মৃতদেহকে কবরে নামিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দেহকে কবরে সঠিকভাবে স্থাপন করার পর তিনি মহান আল্লাহকে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যেভাবে তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই বলতেন যে, তিনি তাঁর কবর হতে চান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 22-23-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিস কবর সম্পর্কে আলোচনা করে যা সকল মানুষ কোন না কোন আকারে বা ফ্যাশনের মুখোমুখি হবে। যেহেতু এটা অবশ্যম্ভাবী তাই মুসলমানদের অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কারণ কবরের আলো বা অন্ধকার কবর থেকে আসে না। এটা তার কর্ম যা তার কবরকে অন্ধকার করে বা আলোকিত করে। একইভাবে, এটি একজনের কাজ যা নির্ধারণ করে যে তারা তাদের কবরে

শাস্তি বা করুণার সম্মুখীন হবে কিনা। এর জন্য প্রস্তুতির একমাত্র উপায় হল তাকওয়া যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

মুসলমানরা প্রায়ই তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের কবর দেওয়ার জন্য কবরস্থানে যান। কিন্তু খুব কম লোকই সত্যিই বুঝতে পারে যে একদিন, শীঘ্রই বা পরে, তাদের পালা আসবে। যদিও, মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের পরিবারকে খুশি করার জন্য এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে সম্পদ উপার্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে, নেক আমলের মাধ্যমে জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই দুটি জিনিসকে মুসলিমরা অগ্রাধিকার দেয়। তাদেরকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং তাদের সাথে কেবল তাদের আমল অবশিষ্ট থাকবে। অতএব, একজন মুসলমানের জন্য তাদের পরিবারকে খুশি করার জন্য এবং অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের জন্য নেক আমল অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া বোধগম্য। এর অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের পরিবার এবং সম্পদ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু এর অর্থ হল তাদের উচিত হবে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের কর্তব্যকে অবহেলা না করে, এবং এটি অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জন করা। যখন এটি সঠিকভাবে করা হয় তখন এটি একটি ন্যায় কাজও হয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কেউ তাদের পরিবার বা সম্পদের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে কখনই পরিত্যাগ করবে না কারণ এটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন, একাকী এবং অন্ধকার কবরের দিকে নিয়ে যাবে।

# উসমান ইবনে আবু আল আস (রাঃ)- ১

তাকিফের অমুসলিম গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে দেখা করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গোত্রীয়দের একজনকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন, উসমান ইবনে আবু আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি এটি করেছিলেন যদিও তিনি সর্বকনিষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন কারণ তিনি পবিত্র কুরআন বোঝার প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অনেক বেশি পছন্দ করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 40-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

# আশাজ্জ আল মুন্দির বিন আমির (রহঃ) – ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে একটি প্রতিনিধি দল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে এবং দেখে একজন ব্যক্তি ছাড়া বাকি সবাই তাদের পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে তার কাছে দ্রুত এগিয়ে গেল। পিছনে থাকা লোকটি, আশহাজ্জ আল মুন্দির বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর উটটি বেঁধে নামলেন। তারপর তিনি বের করলেন এবং দুটি সাদা পোশাক পরলেন যা তিনি তার লাগেজে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য প্রতিনিধিদের উট বেঁধে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপর তাঁকে বললেন, তাঁর মধ্যে দুটি গুণ রয়েছে যা মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবাসতেন, যথা- বিচক্ষণতা ও বিচক্ষণতা। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 63-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকৃত বিচক্ষণতা কেবল ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব জ্ঞান যতই থাকুক না কেন তাদের ধর্মীয় জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। যদিও, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে দরকারী পার্থিব জ্ঞান অর্জন প্রশংসনীয় কারণ এটি একজনের জন্য তাদের নিজের এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য এখনও বৈধ বিধান পাওয়ার একটি দুর্দান্ত উপায়, তবুও তাদের ধর্মীয় জীবনের মাধ্যমে নিরাপদে পরিচালিত করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পার্থিব জ্ঞান কাউকে শেখায় না যে কীভাবে নিরাপদে কোনো অসুবিধা বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এমনভাবে যাত্রা করতে হয় যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার লাভ করে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাধ্যতামূলক কর্তব্য ও ঐতিহ্য, শুধুমাত্র পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী একজন মুসলিম দ্বারা আমল করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মীয় জ্ঞান একজনকে উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে যেখানে পার্থিব জ্ঞান শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে কাউকে সাহায্য করবে। যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলবে, যার ফলশ্রুতিতে এমন বরকত ও অনুগ্রহ আসবে যে তারা উভয় জগতেই সফলতা পাবে। অথচ জাগতিক জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শক তথা ধার্মিক পূর্বসূরিদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ না করে ধর্মে তাদের নিজস্ব পথ নির্ণয় করতে অনুপ্রাণিত করবে। ধর্ম নিজের পথ তৈরি করা নয়, কেবল ইসলামি শিক্ষা মেনে চলা।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী তারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করেন না যা শুধুমাত্র উভয় জগতে তাদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। অতএব, মুসলমানদের উচিত উভয় জগতের সফলতা কামনা করলে ধর্মীয় ও উপকারী পার্থিব জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করা। এই কারণেই সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য।

উপরন্তু, বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি পাপ প্রতিরোধ করে। জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা বোঝার এবং তার উপর কাজ করার জন্য মুসলমান যারা অনেক সৎ কাজ করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্রোধের সাথে কিছু খারাপ শব্দ

উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং অসুবিধা, যেমন তর্ক-বিতর্ক, ঘটতে পারে কারণ লোকেরা জিনিসগুলি চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই আগে আসে যখন তারা জানে যে তাদের কথা বা কাজ পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে ভাল এবং উপকারী।

যদিও, একজন মুসলমানের এখনও সৎকাজ সম্পাদনে বিলম্ব করা উচিত নয়, তবুও তাদের সেগুলি সম্পাদন করার আগে কিছু চিন্তা করা উচিত। এর কারণ হল একটি সৎ কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর শর্ত ও শিষ্টাচার কারোর তাড়াহুড়ার কারণে পরিপূর্ণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করার পরেই একজনকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কেবল তাদের পাপগুলিকে কম করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াবে, তবে তারা তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং মতানৈক্যের মতো সমস্যাগুলিকে কমিয়ে দেবে।

# জারির বিন আবদুল্লাহ আল বাজালি (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে জারির বিন আবদুল্লাহ আল বাজালি নামে এক ব্যক্তি মদিনায় আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অঙ্গীকার করতে বলেছিলেন যে তিনি ফরজ নামাজ আদায় করবেন, ফরজ দান-সাদকা দেবেন এবং সকল মুসলমানের প্রতি অনুগত থাকবেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 106-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই দিন এবং যুগে মুসলমানরা প্রায়শই এই অঙ্গীকারে উল্লিখিত প্রথম দুটি বিষয়ের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেয় যেমন, ফরজ নামাজ এবং বাধ্যতামূলক দাতব্য কিন্তু তারা প্রায়শই সমস্ত মুসলমানের প্রতি আন্তরিক এবং অনুগত হওয়াকে উপেক্ষা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দুটি স্তম্ভের সাথে এই দায়িত্ব যে অর্পণ করেছেন তা ইঙ্গিত দেয় যে এটি পালন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, মুসলমানদের সর্বদা অন্য মুসলমানদের সাথে বন্ধন বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। এটি সমস্ত মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য, তারা সম্পর্কযুক্ত হোক বা না হোক এবং তারা একে অপরকে চেনে বা না জানুক। পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে মুসলমানদের অনেক অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সেগুলি শিখতে ও পূরণ করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি অধিকার তালিকাভুক্ত করেছেন একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের পাওনা।

প্রথমত, তারা শান্তির সালামের জবাব দিতে হবে যদিও উত্তর তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একজন মুসলমানকে তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের প্রতি শান্তি ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে শান্তির ইসলামী অভিবাদন পূর্ণ করতে হবে। এটাই হলো শান্তির ইসলামি অভিবাদনের প্রকৃত অর্থ।

একজন মুসলমানের উচিত অসুস্থ মুসলমানদের শারীরিক ও মানসিক সহায়তা প্রদানের জন্য দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করা। সমস্ত অসুস্থ মুসলমানের সাথে দেখা করা কঠিন হবে তবে প্রতিটি মুসলমান যদি তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে যান তবে বেশিরভাগ অসুস্থ ব্যক্তি এই সহায়তা পাবেন। সকল প্রকার নিরর্থক বা পাপপূর্ণ কথাবার্তা এবং কাজ এড়িয়ে চলতে হবে যেমন, পরচর্চা করা, অন্যথায় একজন মুসলমান আশীর্বাদের পরিবর্তে পাপ অর্জন করবে।

একজন মুসলমানের যখন সম্ভব তখন অন্য মুসলমানদের জানাজায় যোগদান করা উচিত কারণ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অতএব, যত বেশি মুসলমান উপস্থিত থাকবেন তত ভাল। যেমন একজন চায় যে অন্যরা তাদের জানাজায় অংশ নেবে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করবে তাদেরও অন্যদের জন্য এটি করা উচিত। এই বিশেষ কাজটি একজন মুসলমানের জন্য একটি ভাল অনুস্মারক যে তারাও শেষ পর্যন্ত মারা যাবে। আশা করা যায়, এটি তাদের আচরণকে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করবে যাতে তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করার মাধ্যমে তাদের নিজের মৃত্যুর জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের খাবার এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত যতক্ষণ না কোনো বেআইনি বা অপছন্দনীয় কার্যকলাপ সংঘটিত না হয়, যা এই দিনে এবং যুগে খুবই বিরল। লক্ষণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কিছু মুসলমান সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয় যেখানে বেআইনি বা অপছন্দনীয় জিনিসগুলি ঘটে এবং তাদের কাজকে সমর্থন করার জন্য এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য খোদায়ী শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা উচিত নয় কারণ এটি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং খোদায়ী শাস্তির আমন্ত্রণ।

পরিশেষে, প্রধান হাদিসটি মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়ে উপদেশ দিয়ে শেষ হয় যে, যারা হাঁচি দেওয়ার পর মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে তার জন্য দোয়া করতে।

সহীহ বুখারী, ২৭১৪ নং হাদিসে পাওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

প্রথমত, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলকে ভালো পরামর্শ দেওয়া উচিত। সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি স্পষ্টভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেভাবে উপদেশ দেওয়া যেভাবে তারা তাদের উপদেশ দিতে চায়। একজনের খারাপ অনুভূতি তাদের এই দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া উচিত নয় কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ পরামর্শ দেয় সে দেখতে পাবে যে লোকেরা তাদের ভুল পরামর্শ দেয়। আন্তরিক উপদেশ প্রদান করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, জামে আত তিরমিযী, 1925 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এই দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ

করতেন। প্রার্থনা হিসাবে। সত্য যে আন্তরিকভাবে অন্যদের উপদেশ এই বাধ্যতামূলক কর্তব্যের সাথে স্থাপন করা হয়েছে এর গুরুত্ব তুলে ধরে। তাই একজন মুসলমানকে কখনোই এই সত্যকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তি, ধর্ম নির্বিশেষে, এমন জিনিস পেতে ভালবাসে যা তাদের উপকার করবে এবং ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্য মুসলমানদের জন্য তা পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। অন্যদের কাছে উপলব্ধ যেকোনো উপায়ে তারা নিজের জন্য পছন্দ করে এমন জিনিসগুলি পেতে চেষ্টা করে এটিকে একজনের কর্মের মাধ্যমে দেখানো উচিত। একজন মুসলমানের কেবল তাদের কথার মাধ্যমে এই দাবি করা উচিত নয়।

সকল মুসলমানের আরেকটি অধিকার হল, তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা উচিত। এটি একে অপরের প্রতি করুণাময় হওয়ার একটি দিক যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 29:

*" মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; এবং তার সাথে যারা... নিজেদের মধ্যে করুণাময়..."*

প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান অন্যের জন্য প্রার্থনা করে তখন তারা নিজেরাই এর দ্বারা উপকৃত হয়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 6927 নম্বর, যখন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানদের জন্য গোপনে প্রার্থনা করে তখন একজন ফেরেশতা তাদের জন্য প্রার্থনা করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল একজন মুসলমানের উচিত অন্য মুসলমানদের জন্য তা পছন্দ করা এবং ঘৃণা করা যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আন্তরিক বিশ্বাসের শর্ত করেছেন।

একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের বৈধ আনন্দে খুশি হওয়া উচিত এবং আশা করা উচিত যে এটি তাদের জন্য স্থায়ী হয়। অন্য মুসলমান যখন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তাদের দুঃখিত হওয়া উচিত এবং তাদের সাহায্য করা উচিত, এমনকি যদি এটি তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাই হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মুসলমানরা একটি দেহের মত। শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হলে বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়।

একজন মুসলমান কখনই অন্য মুসলিম বা অমুসলিমকে তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা উচিত নয় কারণ জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদত্ত মুসলমানের সংজ্ঞা এটিই। , সংখ্যা 2627। প্রকৃতপক্ষে, মানুষকে নিজের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা একটি দাতব্য কাজ যা একজন ব্যক্তি নিজের জন্য করে। সহীহ মুসলিম, 250 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি নিজের জন্য একটি দাতব্য কাজ কারণ এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করে।

অন্যান্য মুসলমানদের অধিকারের মধ্যে রয়েছে তাদের পথ থেকে যেকোনো বাধা দূর করা। এতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি রূপক বাধা রয়েছে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 6670 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তিকে এমন একটি গাছ অপসারণ করার জন্য জান্নাত দেওয়া হবে যেটি সহ-মুসলিমদের দ্বারা ব্যবহৃত পথকে বাধা দিচ্ছিল।

এটা একজন মুসলমানের অধিকার যে, অন্য মুসলমানরা যখন তাদের উপর নিপীড়িত হয় তখন তাদের সাহায্য করে যেমন, আর্থিক সাহায্য, এবং যারা নিপীড়ন করে তাদের এই আচরণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে সাহায্য করে। এটি সহীহ বুখারি, 6952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, উপদেশ শুধুমাত্র তখনই দেওয়া উচিত যখন উপদেষ্টা জালিমের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে।

একজন মুসলমানকে পার্থিব কারণে তিন দিনের বেশি অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি নেই। এটি অনেক হাদিসে স্পষ্ট করা হয়েছে যেমন জামি আত তিরমিযী, 1932 নম্বরে পাওয়া একটি। অন্য মুসলমানের কাছ থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এমন একটি গুরুতর বিষয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সতর্ক করেছিলেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1740 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দেন যারা অন্য মুসলমানকে ত্যাগ করেছে যতক্ষণ না তারা পুনর্মিলন করে।

আরেকটি অধিকার হল, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে অহংকারপূর্ণ আচরণ করবে না। পরিবর্তে, তাদের নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত যা সর্বদা স্নেহ এবং সমাজের মধ্যে প্রেমের বিস্তারের দিকে পরিচালিত করে।

সুনানে আবু দাউদ, 4895 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে, অহংকার এবং অহংকার শুধুমাত্র সামাজিক বাধা এবং সমাজের বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করে। যদি কোন মুসলমানের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা হয় তবে তাদের একইভাবে উত্তর দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের ধৈর্য এবং ক্ষমা করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে অন্যের প্রতি বিনয়ী হওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য। সুনানে আন নাসাই, 1415 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি কখনোই গরীব ও অভাবীদের সাথে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য হাঁটা অপছন্দ করবেন না।

একজন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমানদের সম্পর্কে গুজব বা গসিপের প্রতি কখনই মনোযোগ না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি হয় সম্পূর্ণ অসত্য বা কল্পকাহিনীর সাথে মিশ্রিত কয়েকটি তথ্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, এমনকি কারো অশুভ ইচ্ছা পূরণের জন্য সত্যকেও প্রেক্ষাপটের বাইরে মোচড় দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত যা বলা হয়েছে তা উপেক্ষা করা এবং পরচর্চাকারীকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত। তাদের কখনই অন্যদের কাছে পরচর্চার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয় বা অন্যদের কাছে পরচর্চাকারীর উল্লেখ করা উচিত নয়। এটা গোপন করে তাদের আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ উভয় জগতে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে কখনই অন্য মুসলমানদের গীবত করা বা অপবাদ দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি বড় পাপ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ

মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 290 নম্বর, সতর্ক করে যে গল্প বহনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

একজন মুসলমানের কর্তব্য যে কোনো দুর্দশা থেকে অন্য মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য তাদের সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এটি করবে সে কিয়ামতের দিন কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। একই হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমের আর্থিক ভার লাঘব করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয় জগতেই উপশম করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত তাদের প্রতি সদয় হওয়া যারা তাদের কাছে ঋণী।

অন্য মুসলমানদের উপর একজন মুসলমানের আরেকটি অধিকার হলো, কোনো মুসলমান যদি অন্য কোনো মুসলমানের ওপর অন্যায় করে এবং তারপর তাদের কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করতে হবে। এর ফলে মহান আল্লাহ তাদের পাপের শিকারকে ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."*

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 6592 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করে, সে আরও সম্মানিত হবে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানদের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা উচিত যা জামি আত তিরমিযী, 1921 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ, বড়দের সম্মানের সাথে এবং ছোটদের সাথে করুণার সাথে আচরণ করা উচিত। এই হাদিসটি সতর্ক করে যে, যারা এ ধরনের আচরণ করে না তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 357 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহকে সম্মান করার একটি অংশ হল বয়স্কদের সম্মান দেখানো। সকল মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টিরই অংশ, তাই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সম্মান করা আসলে সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান করা, অর্থাৎ মহান আল্লাহ।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে তারা যা দেয় তাই তারা পাবে। জামে আত তিরমিযী, 2022 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখন একজন যুবক একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে তার বয়সের কারণে সম্মান ও সম্মান করে, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে তাদের সম্মান করার জন্য কাউকে নিয়োগ করবেন।

অন্য মুসলমানদের প্রতি একজন মুসলমানের পাওনা আরেকটি অধিকার হল, যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ পরিহার করা হয় ততক্ষণ তাদের সাথে প্রফুল্ল থাকা। প্রকৃতপক্ষে, অন্য মুসলমানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাদের হাসি দেওয়া একটি দাতব্য হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 1956 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যার সাথে সহজ আচরণ করা যায়, অন্য মুসলমানদের প্রতি নরম ও মৃদু আচরণ করা হয় তাকে জামে আত তিরমিযী, 2488 নং হাদিসে জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারি, 7512 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে এটি এমন একটি আমল যা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এটির উপর আমল করে তাকে জান্নাতে একটি সুন্দর কক্ষের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে জামে আত তিরমিযী, 1984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

অন্য মুসলমানদের মধ্যে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমস্যা সংশোধন করা মুসলমানদের দায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2509 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, এটি করা স্বেচ্ছায় নামায, রোজা বা দানের চেয়ে উত্তম।

অন্য মুসলমানের উপর একজন মুসলমানের আরেকটি অধিকার হলো, তার দোষ-ত্রুটি গোপন করা। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমের দোষ ঢেকে দেবেন যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের দোষ গোপন করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 2546 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যের পাপ উপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু এর অর্থ হল তাদের মৃদুভাবে এবং গোপনে পাপীকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং অন্যদের কাছে তাদের পাপের কথা উল্লেখ না করার পরামর্শ দেওয়া উচিত। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদেরকে অনুরূপ পাপ না করতে শেখাতে চায় তবে তাদের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা এবং মানুষের নাম না করে অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া। এর একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে লিপিবদ্ধ

করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত অন্যের দোষত্রুটি স্ক্রীন করা যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের ত্রুটি এবং অন্য সকলের ভুল স্ক্রীন করেন।

একজন মুসলমানকে সবসময় এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে যা অন্য মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও সন্দেহের জন্ম দেয়। এটি তাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য যা সন্দেহজনক অন্যরা করতে পারে যেমন গীবত এবং অপবাদ। অন্য মুসলমানদের কাছে এই সুরক্ষা প্রসারিত করা তাদের জন্য ভাল ভালবাসার একটি অংশ যেমন একজন নিজের জন্য ভাল পছন্দ করে। সহীহ বুখারী, 3101 নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার রাতে তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলেন। একই সাথে দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ডেকে জানিয়েছিলেন যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করছেন, অপরিচিত মহিলা নয়। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে একটি ভুল চিন্তাও তাদের মাথায় আসেনি। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সমস্ত মুসলমানদের শেখানোর জন্য শুধুমাত্র এই পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে অন্য মুসলমানদের চিন্তাভাবনা রক্ষা করার জন্য সন্দেহজনক হিসাবে দেখা যেতে পারে এমন কোনও কার্যকলাপকে স্পষ্ট করা উচিত।

এটি আরেকটি ধার্মিক বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত। অন্য মুসলমানদের খারাপ বোধ না করার জন্য যখন কেউ বৈধ কাজগুলি এড়িয়ে চলে তখন এটি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্বামী প্রকাশ্যে তার বোনের মতো অন্যান্য মুসলমানদের সামনে তার স্ত্রীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন না। যদিও, এটি সম্পূর্ণরূপে বৈধ কিন্তু তার বোনের সামনে এটি করা তার খারাপ অনুভব করতে পারে বিশেষ করে যদি তার স্বামী তার সাথে এমন কিছু না করে। এটি একটি উচ্চ স্তরের মহৎ চরিত্র যা বাধ্যতামূলক নয় বরং একটি মহান গুণ।

অন্য মুসলমানদের উপর মুসলমানদের আরেকটি অধিকার আছে যে, তাদেরকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন দিয়ে বরণ করা উচিত। এর মধ্যে এমন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যারা একজন চেনেন এবং যাদের একজন মুসলিম জানেন না। অনেক হাদীসে এ নেক আমল করার গুরুত্ব ও ফজিলত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে ইবনে মাজাহ 68 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, অন্য মুসলমানদের কাছে শান্তির শুভেচ্ছা জানানোর সাথে জান্নাতে প্রবেশের যোগসূত্র রয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 86:

*" এবং যখন তোমাকে সালাম দেওয়া হয়, তখন [প্রতিদানে] তার চেয়ে উত্তম দ্বারা সালাম কর অথবা [অন্তত] [অনুরূপভাবে] প্রত্যাবর্তন কর..."*

জামি আত তিরমিযী, 2706 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান যখন অন্য মুসলমানের সাথে দেখা করে এবং যখন তারা তাদের ছেড়ে যায় তখন শান্তির শুভেচ্ছা জানানো উচিত।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, শান্তির ইসলামিক অভিবাদন একটি ইঙ্গিত যে একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ শব্দ দিয়ে একজন মুসলমানকে স্বাগত জানাতে হবে না বরং প্রতিটি কথোপকথনের সময় তাদের অবশ্যই সদয় শব্দ বজায় রাখতে হবে। উপরন্তু, শান্তির এই বিস্তার একজন মুসলমানের কর্মের মাধ্যমে দেখানো উচিত নয় শুধু কথার মাধ্যমে। এটি অন্যদের কাছে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন প্রসারিত করার প্রকৃত অর্থ।

একজন মুসলমানেরও উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা, অন্য মুসলমানরা যখন তাদের প্রতি সালাম জানায় তখন তাদের সাথে করমর্দন করে। প্রকৃতপক্ষে, যে মুসলমানরা এটি করে এবং তাদের কথোপকথনের সময় যে কোনও পাপ এড়িয়ে চলে তাদের পৃথক হওয়ার আগে তাদের ছোট ছোট গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 5212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অন্য মুসলমানদের যতটা সম্ভব অধিকার রক্ষা করা সকল মুসলমানের কর্তব্য, তারা পাপ না করে বা নিজেদের ক্ষতি না করে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের উচিত অন্যান্য মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করা যা প্রায়শই তাদের পিঠের পিছনে গীবত এবং অপবাদের আকারে লঙ্ঘিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের ইজ্জত রক্ষা করবে সে বিচারের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

যদি অন্য মুসলমান খারাপ আচরণ করে তবে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখা অন্য মুসলমানদের কর্তব্য। উপরন্তু, তাদের উচিত তাদের ব্যক্তিগতভাবে তাদের চরিত্র পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া। জনসমক্ষে এটি করা তাদের বিব্রতকর অবস্থার কারণ হতে পারে এবং এটি একজন মুসলমানের কর্তব্য যে অন্য মুসলমানদের বিব্রত না করা। এছাড়াও, যে ব্যক্তি বিব্রত হয় সে সম্ভবত রাগান্বিত হয়ে উঠবে এবং তাই তাদের দেওয়া ভাল উপদেশ গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম।

# তামিম আল দারি (রহঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে তামিম আল দারি (রা.) নামে এক সাহাবী মদিনায় আসেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, তার অদ্ভুত যাত্রার। তামিম, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একটি জাহাজে ভ্রমণ করছিলেন যখন এটি চলে যায়। ক্রুদের একটি অজানা দ্বীপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা পানীয় জলের সন্ধানে জাহাজ ছেড়ে চলে গেল এবং অবশেষে শিকল দিয়ে বেঁধে থাকা এক ব্যক্তির দেখা পেল। বন্দী তাদের জিজ্ঞাসা করল তারা কারা এবং তারা উত্তর দিল যে তারা আরব। বন্দী তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে একজন লোক শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হওয়ার ঘোষণা দিয়ে এসেছেন? তারা উত্তর দিল যে তারা ছিল এবং লোকেরা তাকে বিশ্বাস করছে, তাকে অনুসরণ করছে এবং তাকে সত্যবাদী মনে করছে। এটাই তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো বলে মন্তব্য করেন বন্দি। তারপর তিনি হিজাজে অবস্থিত আইন জারের খবর জানতে চাইলেন। লোকেরা তাকে বলল এবং বন্দী আনন্দিত হয়ে উঠল। বন্দী তখন জিজ্ঞাসা করলেন আল ইয়ামামায় অবস্থিত বায়সানের খেজুর ফল দিচ্ছে কিনা। লোকেরা উত্তর দিল যে তারা ছিল এবং সে আবার আনন্দিত হয়ে উঠল। বন্দী অবশেষে মন্তব্য করেন যে যদি তাকে অনুমতি দেওয়া হয় তবে তিনি তাইবার জমি ব্যতীত অন্য দেশে ভ্রমণ করবেন । তামিম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পর এই ঘটনা বর্ণনা করেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মন্তব্য করেন যে বন্দী ছিল খ্রিস্টবিরোধী এবং তাইবার দেশ মদিনা । ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 119-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ্রীষ্ট বিরোধীদের বিচারকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, সুনানে ইবনে মাজা, 4077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, পৃথিবীতে তাদের জীবনে মুসলমানরা সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তাই

ভবিষ্যতের এই ঘটনা থেকে মুসলমানদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়া উচিত। প্রথমটি হল দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী হওয়ার গুরুত্ব। দুর্বল ঈমানের অধিকারীরাই তার দ্বারা বিপথগামী হবে। দৃঢ় বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের জীবনের প্রতিটি পরীক্ষা বা অসুবিধার বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে সর্বদা, মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে, প্রতিদান এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে প্রতিটি অসুবিধাকে অতিক্রম করবে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের প্রদর্শন করা উচিত। অথচ যারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী তারা সহজে বিপথগামী হয় এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিপথগামী হয়, তারা তাদের জীবনে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয় ঠিক তেমনি দুর্বল ঈমানের লোকেরাও খ্রীষ্টবিরোধীদের দ্বারা বিপথগামী হয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

*"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"*

দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা। এটি একজন মুসলিমকে পরীক্ষা ও পরীক্ষার কারণ ও প্রজ্ঞা বুঝতে সাহায্য করবে। এটি তাদের সফলভাবে তাদের কাটিয়ে উঠতে অনুমতি দেবে।

এই মহান ঘটনা থেকে শেখার আরেকটি বিষয় হল সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলার গুরুত্ব। যেভাবে একজন ব্যক্তি যে সীমান্তের কাছাকাছি যাত্রা করে, একইভাবে এটি অতিক্রম করার সম্ভাবনা বেশি, একজন মুসলিম যে প্রলোভনে আবদ্ধ থাকে তার বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে ব্যক্তি পাপের দিকে প্রলুব্ধ করে এমন স্থান ও জিনিস এড়িয়ে চলে সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা

করবে । জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলমানদের উচিত এমন জিনিস, স্থান এবং লোকেদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে তাদের ঈমানের হেফাজত করা যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ বা প্রলুব্ধ করে এবং তাদের নির্ভরশীলদের নিশ্চিত করা। যেমন তাদের সন্তানরাও তাই করে।

# কাব বিন উজরা (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে ওয়াইলা বিন আল আসকা (রাঃ ) নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাবুকের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন কারণ তাকে অন্য একজন সাহাবী কাব বিন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আরোহণের জন্য একটি উট দেওয়া হয়েছিল। যখন ওয়াইলা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি কাব বিন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধের গনীমতের নিজস্ব অংশ অর্পণ করেন, কারণ তিনি তাঁকে উট চড়ার জন্য দিয়েছিলেন। চালু। কিন্তু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু নিতে অস্বীকার করেন এবং উত্তর দেন যে উটটি তাকে দেওয়া হয়েছিল যাতে সে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে, যার অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 124-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। সহীহ বুখারির ১ নম্বর হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিচার করেন। একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত ধর্মীয় এবং দরকারী পার্থিব কর্ম সম্পাদন করে, যাতে তারা উভয় জগতে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করুন।

এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততাকে প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে কারণ তারা মনে করে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে।

# বুরাইদা বিন হুসাইব (রাঃ)- ১

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন, বুরায়দা , আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি স্বীকার করেছিলেন যে সে সময় অন্য একজন সাহাবী, আলী বিন আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এই অভিযানের পর যুদ্ধের গনীমতের মাল বন্টন করা দরকার ছিল এবং তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই কাজের জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। এই ঘটনার পর বুরায়দা , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে আসেন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমালোচনা করেন, যদিও তিনি কোনো অন্যায় করেননি। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন , তিনি যদি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অপছন্দ করেন, যার উত্তর তিনি সম্মতিতে দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বলেছিলেন যে তাকে অপছন্দ না করতে এবং তার পরিবর্তে তার প্রতি তার ভালবাসা বৃদ্ধি করতে কারণ সে এর যোগ্য। এই মন্তব্যের পর বুরাইদা , আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, আন্তরিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আলীকে যতটা ভালোবাসতেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন তার চেয়ে বেশি কাউকে তিনি ভালোবাসেন না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 142-143-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে সর্বকালের সর্বোত্তম দল। তারা যে শারীরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় পর্যবেক্ষণ করেছেন তা অবশ্যই একটি বিষয়। কিন্তু যে কেউ তাদের জীবন এবং তাদের

সৎকর্ম সম্পর্কে জানে সে বোঝে যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই অনন্য এবং মহান কাজের চেয়েও বেশি কিছু।

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ এই ঘটনা এবং সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে জড়িত একটি হাদীসে দেখানো হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমের ৬৫১৫ নম্বরে পাওয়া যায়। ইবনে উমর রা. , একবার মরুভূমিতে তার পরিবহনে চড়ে বেড়াচ্ছিলেন যখন তিনি একজন বেদুইনকে দেখতে পেলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদুইনকে অভিবাদন জানালেন, বেদুঈনের মাথায় তার পাগড়ী রাখলেন এবং বেদুইনকে তার বাহনে আরোহণের জন্য জোর দিলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছিল যে তিনি বেদুইনকে যে সালাম দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল কারণ বেদুইনরা মহান সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। , তাকে অভিবাদন। তবুও, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যান এবং বেদুইনদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন যে, তিনি এটা করেছেন শুধুমাত্র কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করতে পারে এমন একটি সর্বোত্তম উপায় হল তাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা। পিতামাতার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন যে, বেদুঈনের পিতা তাঁর পিতার বিশ্বস্ত সেনাপতি উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন।

এই ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তারা কেবল বাধ্যতামূলক দায়িত্বই পালন করেনি এবং সমস্ত পাপ পরিহার করেনি বরং তাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় সুপারিশ করা সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছে। তাদের আত্মসমর্পণ তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বেদুইনকে সহজেই উপেক্ষা করতে

পারতেন কারণ তার করা কোনো কাজই এখনও বাধ্যতামূলক ছিল না, অনেক মুসলিম যারা এই অজুহাত ব্যবহার করবে তার বিপরীতে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যেভাবে করেছিলেন সেভাবে কাজ করেছিলেন। .

ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের অভাবই মুসলমানদের ঈমানকে দুর্বল করে দিয়েছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং অন্যান্য সৎ কাজ থেকে দূরে সরে যায়, যেমন স্বেচ্ছায় দাতব্য, যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী বলে দাবি করে যে কাজগুলি বাধ্যতামূলক নয়। সকল মুসলমান পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে শেষ হতে চায়। কিন্তু তাদের পথ বা পথে না চললে এটা কিভাবে সম্ভব? কোন মুসলমান যদি তাদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ অনুসরণ করে তাহলে তারা কিভাবে তাদের সাথে মিলিত হবে? তাদের সাথে শেষ করতে তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে যেমনটি তারা করেছিল, তার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে।

# রাবীআ আল আসলামী (রহঃ)- ১

রাবীআ আল আসলামীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে কিছু কড়া কথা বললেন এবং তিনি যা করেছেন তার জন্য তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হলেন। যখন তিনি রাবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে অনুরোধ করলেন, যা ঘটেছিল তার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাঁর সাথে অনুরূপ কথা বলার জন্য, তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিষয়টি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হলে তিনি রাবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আবু বক্কর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার পরামর্শ দেন। বিন্দু পরের তাদের মিটিং কাঁদতে ছেড়ে. মুসনাদে আহমদ, 4/58-59-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও এটা স্পষ্ট ছিল যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি পাপপূর্ণ এবং নোংরা কথা বলেননি, কারণ এটি তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধে ছিল, কম নয়, তিনি তার কঠোরতার জন্য অনুতপ্ত ছিলেন কারণ তিনি অন্যদের প্রতি অন্যায়ের পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। , পরিণতি, যা মুসলমানরা প্রায়ই ভুলে যায়।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু লোকেরা এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিন তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

# রাফাই ইবনে আমর (রহঃ)- ১

ধাত আস সালাসিলের সামরিক অভিযানের সময় , যা সপ্তম বছরের পর ঘটেছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, অন্য একজন সাহাবী কিছু সাধারণ পরামর্শ চেয়েছিলেন। রাফাই ইবনে আমর রা . তিনি তাকে নেতা না হওয়ার পরামর্শ দেন, এমনকি দুই জনের উপরেও। তিনি আরও বলেন, এমন সময় আসবে যখন নেতৃত্বের লাগাম ছিন্নভিন্ন মানুষের হাতে ছড়িয়ে পড়বে। যখন এই লোকেরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে না, মহান আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিশোধ নেবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৩৪-১৩৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয় । প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

# মিরান ইবনে ধী (রহঃ)- ১

ধর্মত্যাগী যুদ্ধের সময়, কিছু আরব উপজাতি যারা ধর্মত্যাগ করেছিল তাদের সহযোগী উপজাতিদের পরামর্শ ও প্রচারের মাধ্যমে ইসলামে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার সাথে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এই লোকেরা তাদের জীবন এবং তাদের পরিবারের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। এর একটি উদাহরণ ছিল মিরান ইবনে ধী , আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, যিনি পরিণামের কোন ভয় ছাড়াই প্রকাশ্যে তাঁর জনগণকে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর গোত্রকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 420-421-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4340 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করার গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে সকল প্রকারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। তাদের শক্তি এবং উপায় অনুযায়ী মন্দ. এই হাদিসে বর্ণিত সর্বনিম্ন স্তর হল মন্দকে অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা।

এটি দেখায় যে অভ্যন্তরীণভাবে খারাপ কাজগুলিকে অনুমোদন করা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4345 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ সংঘটিত হলে উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে সে সেই ব্যক্তির মতো যে উপস্থিত ছিল না। . কিন্তু যে অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজটি অনুমোদন করেছে সে সেই ব্যক্তির মত যে এটি করার সময় উপস্থিত ছিল।

মন্দের প্রতি আপত্তি করার প্রথম দুটি দিক, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হল একজনের শারীরিক কাজ ও কথাবার্তা। এটি শুধুমাত্র একজন মুসলিমের উপর একটি কর্তব্য যার তা করার শক্তি আছে উদাহরণস্বরূপ, তারা তাদের কাজ বা কথার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নিজের হাত দিয়ে মন্দকে আপত্তি করা মানে লড়াই করা নয়। এটি অন্যের মন্দ কাজগুলিকে সংশোধন করাকে বোঝায়, যেমন বেআইনিভাবে লঙঘন করা হয়েছে এমন কারো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি এখনও এটি করার অবস্থানে রয়েছে, সে তা করা থেকে বিরত থাকে তাকে একটি শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4338 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

মহানবী (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তারা যেন সৃষ্টিকে ভয় না করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সৃষ্টির ভয়কে তাদের মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করা থেকে বিরত রাখতে দেয় তাকে সেই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজেকে ঘৃণা করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা সমালোচিত হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4008 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি উল্লেখ্য যে, এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় না যে ক্ষতির ভয়ে চুপ থাকে কারণ এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত, তবে এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে নীরব থাকে কারণ মানুষ তাদের চোখে ধরে রাখে স্ট্যাটাস।

সুনানে আবু দাউদ, 4341 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি যখন অন্যরা তাদের লোভের আনুগত্য করে, তাদের ভুল মতামত ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে এবং যখন তারা পরকালের চেয়ে বস্তুগত দুনিয়াকে পছন্দ করে তখন তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে আপত্তি করা ছেড়ে দিতে পারে। এই সময়টা এসে গেছে বলে শেষ করতে পণ্ডিত লাগে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105।

*“হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."*

তবে এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা উচিত কারণ এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এবং তারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে যা অনুভব করে তাদের প্রতি এটি একটি কর্তব্য। থেকে নিরাপদ, কারণ এটি উচ্চতর মনোভাব।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্ট যে মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করাকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ, এটি মুসলমানদেরকে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না যাতে আপত্তি করার মতো খারাপ জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু নিষিদ্ধ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

*"ওহে যারা ঈমান এনেছ... গুপ্তচরবৃত্তি করো না..."*

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে হবে, তাদের ইচ্ছার উপর নয়। একজন মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, যখন তারা নয়। এটা প্রমাণিত হয় যখন তারা মন্দের বিরুদ্ধে এমনভাবে আপত্তি করে যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যা ভাল কাজ বলে মনে করা হয় তা পাপ হয়ে যেতে পারে।

একজন মুসলমানকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মৃদু ও ন্যায্যভাবে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতটি কেবলমাত্র মানুষকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে দূরে ঠেলে দেবে এবং তাদের ক্রোধের ফলে আরও পাপ হতে পারে।

# যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)- ১

ইয়ামামার যুদ্ধের পর , যার ফলে অনেক মুসলিম হতাহত হয়েছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেছিলেন, উমর ইবনে খাত্তাব আবু বক্করকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করতে এই ভয়ে যে আয়াতগুলি হারিয়ে যেতে পারে যদি পবিত্র কুরআনের মুখস্থকারীরা মারা যেতে থাকে বা যুদ্ধে শহীদ হতে থাকে। এর আগে পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো কোনো একটি বইয়ে ছিল না, বরং সেগুলো হয় মুখস্থ করা হতো বা বিভিন্ন বস্তুর ওপর লেখা হতো, যেমন পাথর, যা বিভিন্ন মানুষের দখলে ছিল। প্রাথমিকভাবে, আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি এমন কিছু করতে চাননি যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন উমর অটল ছিলেন, তখন আবু বক্কর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য এটিই সর্বোত্তম পদক্ষেপ। আবু বক্কর জায়েদ বিন সাবিতকে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কপিটি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে থেকে যায়, যতক্ষণ না তিনি মারা যান, তারপর তা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবং অবশেষে তাঁর কন্যা এবং মুমিনদের মা হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করা হয়। তার সাথে সন্তুষ্ট সহীহ বুখারীর ৭১৯১ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ভবিষ্যত মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের অধিকার পূরণের মাধ্যমে তাদের মহান উত্তরাধিকারকে সম্মান করতে হবে , কারণ এটিই ছিল তাদের ত্যাগের উদ্দেশ্য।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

*"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"*

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

# মুথান্না ইবনে হারিথা (রহঃ)- ১

উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতকালে এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ইরাকে পৌঁছানোর আগে মহান সেনাপতি মুথান্না ইবনে হারিথা তাঁর পূর্ববর্তী যুদ্ধে প্রাপ্ত ব্যাপক ক্ষত থেকে মারা যান। এমনকি তার মৃত্যুশয্যায়ও তার উদ্বেগ ছিল মুসলিম সৈন্যদের নিরাপত্তার জন্য কারণ তিনি সা'দ, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য কিছু কৌশলগত পরামর্শ রেখে গেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 150-151- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

*"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."*

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ

থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

*"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."*

# আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রহঃ)- ১

উসমান ইবনে আফফানের খিলাফতকালে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসকে নৌবাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি সমুদ্রপথে অন্তত পঞ্চাশটি অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তিনি তার সৈন্যদের সুরক্ষিত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং শত্রু অঞ্চলে স্কাউট হিসাবে একজন সৈনিক পাঠানোর পরিবর্তে তিনি নিজে যেতেন। রোমান অঞ্চলে তার একটি স্কাউটিং মিশনে তাকে আবিষ্কার করা হয়েছিল, আক্রমণ করা হয়েছিল এবং শহীদ করা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী , উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন- নূরাইন , পৃষ্ঠা 277-278- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি যে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তার মধ্যে একটি উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম।

একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

*"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"*

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

## ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

## অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe